শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) একটি জীবন, একটি আদর্শ

এলেন ধরায় দ্বীনের "নেছার"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। বাংলার মুসলমানদের জন্য সে এক কলংকিত অধ্যায়। একদিন যে মুসলিম জাতি সারা পাকভারতে রাজত্ব করেছিল, তারাই সেদিন কুখ্যাত বৃটিশ শাসক আর তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত। তাদের দুর্দশার কথা চিন্তা করলেও গা শিউরে উঠে। সামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই ছিলনা। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। জমিদার বাবুদের কুর্ণিশ দেয়া, তাদের সামনে ভিক্ষুকের মত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা, বড়জোর পিঁড়িতে বসার সুযোগ পেয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করা, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়া সাধারণ মুসলমানদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের হীনমন্যতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, হিন্দু বাবুদের জুতোর লাথি খেয়েও তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করত। গর্ব করে বলতো- "গেছিলাম কাচারিতে, বড় বাবুর কী সুন্দর জুতা, আহা! জানিস, হেই জুতা দিয়া বাবু আমার পিঠে বসাইয়া দিল দুই ঘাই"। মুসলমানদের জাতীয় অনুভূতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ছিল বিলীন প্রায়। অবিভক্ত বাংলার ইসলামী রেঁনেসা সৃষ্টিকারী ফুরফুরা শরীফের হযরত আবু বকর ছিদ্দিকী (রঃ), মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ), হাজী শরীয়ত উল্লাহ (রঃ) প্রমুখ ওলামায়ে হক্কানী এবং কিছু সংখ্যক দ্বীন দরদী কবি সাহিত্যিক আর সাংবাদিকদের আপ্রাণ চেষ্টায় মুসলমানদের মাঝে যদিও কিছু কিছু ধর্মীয় জাগরণ শুরু হয়েছিল, তথাপি মোটামুটিভাবে সারা বাংলা বিশেষ করে এর দক্ষিণাঞ্চল তখনও ছিল অজ্ঞতার তিমির আঁধারে নিমজ্জিত। জ্ঞানের অভাবে আপন তাহজীব-তামাদ্দুন ছেড়ে দিয়ে মুসলমানগণ বরণ করে নিয়েছিল বিধর্মীদের আচার-ব্যবহার, তাদের চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদ। হিন্দুদের অনুকরণে তারা নামের আগে শ্রী ব্যবহার করত, লুঙ্গির বদলে ধুতি পরত, মাথায় টুপি না দিয়ে টিকি রাখত। এমনকি কোন কোন মুসলমান ঘরের মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পর্যন্ত ব্যবহার করত। হিন্দুদের পূজা পার্বণে মুসলমানদের অবাধে অংশগ্রহণ, তিথিলগ্ন ও দিকশূল পালন, দেবদেবীর নামে মানত, ইত্যাদি বহু ইসলাম গর্হিত কাজ ও বিশ্বাস বাংলার ঘরে ঘরে সেদিন সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বীনী এলেমের চর্চা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত সীমিত। মুসলিম জাতীয় জীবনে নেমে এসেছিল ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধের এক চরম বিপর্যয়- সে এক ভয়াবহ সংকট সন্ধিক্ষণ। তার ভাগ্যাকাশে সেদিন দুর্যোগের ঘনঘটা। চারিদিক হতে এক অশুভ রাহুর করাল গ্রাসে ইসলামের নিভু নিভু দীপ শিখাটিও সমাজের বুক থেকে উধাও হওয়ার পথে। চরম ধ্বংসের মুখে বাংলার মুসলিম সমাজ মুক্তি কামনায় সেদিন আর্তনাদ করে উঠেছিল, স্রষ্টার কাছে জানিয়েছিল এক করুণ মিনতিঃ শিরক-বিদয়াত আর অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে কোথা সে মুজাদ্দিদ- যিনি নূরে মুহাম্মদীর দীপ্ত আলোকে সারা বাংলা উদ্ভাসিত করে দিবেন? কোথা সে বংশীবাদক- যার বাঁশীর সুরে বেজে উঠবে ভুলে যাওয়া সেই হেরা পাহাড়ের সত্য-সুর, মুসলিম প্রাণের প্রতিটি বীণার তারে ঝংকৃত হবে "আলাছতুর" মালিকের পবিত্র নাম? কোথা সে সত্য-সঠিক, দ্বীনের মুরশিদ- যার তাওয়াজ্জু'র বরকতে প্রতিটি মুসলমানের অন্তর নতুন করে সঞ্জীবিত হবে, ছন্দের তালে তালে প্রবাহিত হবে তৌহিদের সোনালী ঝর্ণাধারা, মদীনার সৌরভ ছড়িয়ে মরু সাহারার বুকে নতুন করে রচিত হবে ইশকে রাসূলের সুশোভিত এক বেহেশতি-উদ্যান? অভ্রভেদী এই আর্তনাদের সুর ধ্বনিত হল বাংলার জমীনে, পাহাড় পর্বতে, বনরাজিতে। প্রকম্পিত হল এর আকাশ বাতাস। উঠে গেল সে আর্তনাদ ঊর্ধ্বে, বহু ঊর্ধ্বে, স্পর্শ করল আল্লাহর পবিত্র আরশ- স্রষ্টার দয়ার্দ্র অন্তর কেঁদে উঠল, ঊর্ধ্ব জগতে ডেকে উঠল রহমতের বান, প্রসারিত হল আলাহর করুণার হাত, নেমে এলেন ধরায় এক দ্বীনের "নেছার", প্রাণ পেলো বাংলার মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজঃ

"ভুবন হইতে উঠিল এ দোয়া, গ্রহমণ্ডল চিড়ি
ছুঁইল আরশ, হইল কবুল মাধুরী আসিবে ফিরি।

বলিলেন খোদা- সৃষ্টি আমার হবে কেন ছারখার?
পাঠাই এবার ছারছীনা ভূঁয়ে সাধক পীর 'নেছার'।"

স্রষ্টার অনন্ত আশীর্বাদ আর অফুরন্ত কল্যাণ লয়ে বাংলায় আবির্ভূত হলেন এক পুণ্যবান তাপস, ভালে তাঁর "হেরার" নূর, গায়ে তাঁর মদীনার খুশ্‌বু। সৃষ্টির মাঝে অকস্মাৎ কিসের বুঝি পুলক শিহরণ খেলে গেলো। বাতাসে-বাতাসে শুরু হলো কানাকানি। ছন্দে ছন্দে বাংলা, আসাম তথা পাকভারতের সকল অঙ্গন হল মুখরিত। মুক্তি আর শান্তির বার্তা লয়ে মদীনার বাতাস ছুটে চলল বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। হঠাৎ করে বন্ধ হ'ল গীর্জার জপ-তপ, কাঁসার ঘণ্টা আর পূজোর শঙ্খধ্বনি। মন্দির আর গীর্জা ডিঙ্গিয়ে মাথা উঁচু করে উঠে এলো অগণিত মসজিদ। মিনার থেকে চারিদিক প্রকম্পিত করে বাতাসে ভেসে এলো শত বেলালের সেই সুমধুর কণ্ঠ- তৌহীদের অগ্নিবাণী "আল্লাহু আকবার"। কপালে করাঘাত করে পালিয়ে গেল ভীত-সন্ত্রস্ত, অভিশপ্ত শয়তান। কোন্ অজ্ঞাত ভাটার টানে এক নিমিষে বুঝি অধর্ম-অনাচারের সয়লাব হল উধাও। বাংলার মাটিতে মহাসমারোহে ফুটে উঠল তৌহীদের স্নিগ্ধ শ্যামল হাসি। সবার মনে প্রশ্নঃ কে এলেন? কোথা সে মহামানব? বিপুল আগ্রহে সবাই দেখল বাংলার নিভৃত পল্লী ছারছীনার পবিত্র মাটিতে মুন্সি ছদরুদ্দীনের ঘর আলো করে হাসছে এক শিশু- সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাংলায়, পাকভারতে, বিশ্বের আনাচে কানাচে। শিশুর নাম নেছারুদ্দীন। সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ল এ নাম। আনন্দে উচ্ছ¡সিত চিত্তে সবাই তাকে জানাল 'খোশ আমদেদ'। জন্ম নিলেন যুগস্রষ্টা, দ্বীনের হাদী ' নেছারুদ্দীন'। সূচিত হ'ল ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায়।

"বারশ ঊনাশি অগ্রহায়
লিখে রাখ সবে বিশ্ব নর,
এমাসে আসিল দীনের নূর
ছদরুদ্দীনের পূর্ণ ঘর"।

==o==

কোন আলোকে

"হে আলোক বাহী দীপ্ত সূর্য নেছার কামেল পীর,
জীবন তোমার মহা-ইতিহাস"

"নেছারুদ্দীন" একটি নাম, একটি ইতিহাস। এই ইতিহাসকে আজ জানতে হবে, এর মূল্যায়ন করতে হবে। কিন্তু কোন্ আলোকে? ডক হবে এই মূল্যায়নের কেন্দ্র বিন্দু? কোন্ দৃষ্টিকোণ হতে এই ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে হবে, যাতে আজকের এই ধর্মবিমুখ অশান্ত সমাজে দিশেহারা মানুষ এখান থেকে খুঁজে পায় জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা?

আম্বিয়া (আঃ)- দের মোজেজা এবং আওলিয়াদের কারামত সত্য। এগুলো তাঁদের উচ্চ কামালাতের স্বাক্ষর বহন করে বটে কিন্তু কখনও তাঁরা এসবের মাধ্যমে নিজেদেরকে জনসমাজে চিত্রিত করতে চাননা। বরং তাঁদের অজান্তে অলৌকিক কোন কিছু ঘটে গেলে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা এর থেকে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখতে চান। এটি তাঁদের বিনয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্য প্রচারের সুমহান আদর্শ লয়ে যে বৃহত্তর পরিসরে তাঁরা বিচরণ করেন, সেখানে মোজেজা-কারামতের ভূমিকা সত্যই নিতান্ত নগণ্য। আম্বিয়া (আঃ)গণ মোজেজা প্রদর্শন করেছেন এবং আওলিয়াদের দ্বারা কারামত প্রকাশিত হয়, এটি সত্যি; তবে সেগুলো বিশেষ কারণে, বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে। মানুষের জন্য এগুলো কখনও অনুকরণের বিষয় হতে পারেনা। যারা মহাপুরুষদের মূল্যবান কথা ও কাজের চাইতে তাঁদের জীবনের অলৌকিক ঘটনার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে তারা মূলতঃ মূর্খ, তাদের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ, স্থূল।

তাদের এই ভুল দৃষ্টিকোণের কারণেই অনেক সময় ঐসব মহান ব্যক্তিবর্গের জীবন থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে তারা ব্যর্থ হয়।

রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর মোজেজা চিরসত্য। কিন্তু মোজেজা প্রদর্শন করে মানুষকে বশে আনার চেষ্টা তিনি কোনদিন করেননি। কুরআনের মাধ্যমে যে মহাসত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, বিশ্ববাসীর সামনে সেটিকে তুলে ধরাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। মোজেজা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'এ কাজের জন্য আমি আসি নাই। আমি যাদুকর নই। যাদু দেখাইয়া তোমাদেরকে স্বমতে আনিতে আমি ঘৃণাবোধ করি। সত্যের জ্বলন্ত স্পর্শে তোমাদের প্রাণ যদি সাড়া না দেয়, তবে তোমরা আমার কথা শুনিওনা।' বস্তুতঃ কাফের এবং নাফরমান ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর কাছে কেউ কোনদিন মোজেজা দেখতে চায়নি।

হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর জীবন শত অলৌকিক ঘটনা, কাশ্‌ফ-কারামতে ভরপুর। তবে তাঁর জীবনের সকল শ্রম-সাধনা, হেদায়েত-তাবলীগ ও জ্ঞান বিস্তারের ইতিহাস যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রামে ভরা তাঁর সারাটি কর্মজীবন ঐসব অলৌকিক ঘটনার চাইতেও বহু বহুগুণ অলৌকিক। সকল প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে বিশ্বনবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ত্যাগের যে বিরল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অজ্ঞতা ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যে আপোষহীন সংগ্রাম তিনি পরিচালনা করেছেন, যার ফলশ্র"তিতে বাংলার গোশায় গোশায় ইসলামের আলোকচ্ছ¡টা ছড়িয়ে পড়ল- মুসলমানগণ আপন তাহ্‌জীব-তামাদ্দুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হল- ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরল, টিকির পরিবর্তে মাথায় টুপি পরিধান করল; হাজার হাজার মাদরাসা, মক্তব, খানকাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত হল, অগণিত আলেম, জাকেরীন তৈরী হল; কাশার ঘণ্টার আওয়াজ ম্রিয়মান করে চারিদিকে কুরআনের সমধুর সুর ধ্বনিত হল; শত শত সুদখোর, ঘুষখোর, চোর-বদমায়েশ বিপথগামী তাঁর সাথে হাত মিলিয়ে চরিত্রবান হল- সেগুলোই তাঁর জীবনের সবচাইতে অলৌকিক বিষয় নয় কি? হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। আজ যদি তাঁর গঠনমূলক কাজগুলোকে 'কারামত' সমূহ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় তবে নিঃসন্দেহে জাতির সামনে একটি গৌরবময় ইতিহাসকে সংকুচিত করা হবে, একটি আদর্শকে খণ্ডিত করা হবে এবং একটি মহান ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করা হবে। তাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তাঁর জীবনের মূল্যায়নে কাশ্‌ফ-কারামত নয়, 'রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর মধ্যেই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে'- কুরআনের এই বাণীর আলোকে শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ ডকরূপ সার্থক ভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেটিই হবে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তবেই ইতিহাসের সঠিক চিত্রটি তুলে ধরা হবে। দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) ছিলেন একজন সত্যিকারের নায়েবে নবী, নেছার চরিত্র নবী চরিত্রেরই একটি সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি; তাঁর জীবন নবী-জীবনেরই একটি আদর্শ রূপায়ণঃ

"নবী-আদর্শ, সীরাত-ছূরত সবি,
তব মাঝে পাই, তুমি যে আছিলে নবীরই প্রতিচ্ছবি"।

==o==

বংশ পরিচিতি

বাংলাদেশের সাবেক বাখেরগঞ্জ জিলার পিরোজপুর মহকুমা- বর্তমানে পিরোজপুর জিলার নেছারাবাদ উপজিলায় ছোট্ট নিভৃত একটি গ্রাম- নাম 'ছারছীনা'। 'সন্ধ্যা' নদীর তীরে বাংলার অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুশোভিত ছায়া সুনিবিড় কুটিরঘেরা এই গ্রাম। এর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য নারিকেল, সুপারী গাছ। কোথাও দেখা যায় শ্যামল সবুজ শস্যভরা বিশাল চত্বর, আবার কোথাও বা চোখে পড়ে এখানে সেখানে বেড়ে উঠা বিভিন্ন ফলের ছোট

বড় গাছের বিচিত্র সমারোহ। স্থানে স্থানে ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম এবং তারই মাঝ দিয়ে সর্পিলগতিতে এগিয়ে চলেছে গাঁয়ের অপ্রশস্থ কাঁচা-পাকা পায়ে চলার পথ। একটু যেতে না যেতেই পার হতে হয় বাঁশের তৈরী সাঁকো। নদী থেকে পাশ কেটে বেড়িয়ে আসা আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ খালগুলো গ্রামটিকে যেন অতি আপন করে জড়িয়ে রেখেছে। জোয়ারের সময় ফুলে উঠে, উদ্বেল আর চঞ্চল হয়ে পড়ে - আবার ভাটার টানে বসে যায়, একেবারে শান্ত, নিশ্চুপ হয়ে। ছবির মত গ্রামখানি কোকিল, শ্যামা আর নাম না জানা কত শত পাখীর কূজনে মুখরিত থাকে সারাক্ষণ। সামনের নদীতে সাদা সাদা পাল তুলে ভেসে চলেছে ছোট বড় নৌকা, ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে দূরগামী জাহাজ থেকে হর্নের বেসুরো আওয়াজ। ভোরের শান্ত আলোতে, সূর্যাস্তে, চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে অপরূপ শোভায় গ্রামখানি মায়াময় হয়ে উঠে। শহরের সেই চঞ্চলতা নেই, কোন কোলাহল নেই, কোন 'কাঠিন্য' নেই, সকল মাটি জুড়ে মিশে রয়েছে কেবল গ্রাম-বাংলার সরলতা আর মায়া মমতা।

ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ছারছীনা সারা উপমহাদেশে আজ বহুল প্রচারিত একটি নাম। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এটি ছিল সাধারণ অজ্ঞাত একটি গ্রাম। দেশের মুষ্টিমেয় লোকই এই নামটির সাথে পরিচিত ছিল। এখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় ছিল কম। শিক্ষা দীক্ষা, ধন- দৌলত, প্রতিপত্তি সব কিছুতেই হিন্দুদের ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য। কবির ভাষায়ঃ

"ছারছীনা ছিল নিঝুম পল্লী বাগ বাগিচায় ভরা,
পথ-ঘাট বেশি ছিল নাকো হেথা, ছিলনা তেমনি সাড়া।
লেখাপড়া বেকি ছিলনা এখানে মুসলিম পরিবারে,
হিন্দুরা ছিল ধনী ও মনিব ঢাক-ঢোল সহকারে।"

ছারছীনার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার- আকন্দ পরিবার। এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন মুন্সী জহীরুদ্দীন আকন্দ। সমাজে সরল এবং অমায়িক বলে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের খ্যাতি সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। জানা যায় প্রতি নামাজের পরই তিনি বহুবার করে সূরা এখলাস পাঠ করতেন। হিসাব রাখার জন্য একবার সূরা পাঠ করে পাশের মাটিতে একটি করে দাগ কাটতেন। ফলে জায়নামাজের চতুর্পার্শ্বের মাটিতে একটি বিরাট রেখাজাল অঙ্কিত হত। এই মরহুম জহীরুদ্দীন আকন্দই ছিলেন হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর দাদা।

বাংলা ১২২৭ সনে (১৮২১ ইং) ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা ফরিদপুর জিলার বাহাদুরপুরের মরহুম হাজী শরীয়তুল্লাহ যখন এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে আসেন, তখন মরহুম জহীরুদ্দীন আকন্দ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন দেশের অজ্ঞ লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচার করেছেন। তাদেরকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে শরীয়তের বিভিন্ন অনুশাসন শিক্ষা দিতেন। বাখেরগঞ্জ জিলার মঠবাড়িয়া এলাকায় তাঁর অনেক ভক্ত ছিল। তাদেরকে লয়ে মাঝে মাঝে তিনি ধর্মীয় সভার আয়োজন করতেন। সেখানে নামাজ, রোজা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ব্যাখ্যা করা ছাড়াও সমাজে ইসলামী জাগরণ কিভাবে জোরদার করা যায় সে বিষয়ে প্রায়ই তিনি গঠনমূলক বক্তব্য রাখতেন। তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ধীরে ধীরে স্বল্প পরিসরে হলেও সমাজে মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি দানা বেঁধে উঠতে থাকে এবং নিজেদেরকে একটি আলাদা সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করে। পরবর্তীতে হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) তাঁর হেদায়েতী জীবনের প্রথম দিকে মঠবাড়িয়া অঞ্চল থেকে যে সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রেরণা পেয়েছিলেন, যা নানাবিধ প্রতিক,ল অবস্থার মাঝেও তাঁর উদ্দাম ও কর্মস্পৃহাকে সতেজ করে রেখেছিল, তার পেছনে তাঁর দাদা মরহুমের যে বিরাট অবদান ছিল তা অস্বীকার করার কোন জো নেই। হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) তখন অনেক ছোট। কোন কিছু বুঝার বয়স তাঁর হয়নি। সেই বয়সেই মরহুম জহীরুদ্দীন আকন্দ তাঁর আদরের নাতীকে সাথে করে বিভিন্ন এলাকায় ছফর করতেন। দাদার সাথে অবস্থানকালে হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) এলাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন, কখনও বা কোন

পুকুরের পানিতে গোসল করতেন। শিশু বয়সের তাঁর ছোট ছোট কথা, তাঁর সরলতা সকলকেই মুগ্ধ করত। মঠবাড়িয়া এলাকায় আজও সেই সব স্মৃতির স্বাক্ষর রয়েছে। কোন কোন স্থানে লোকেরা আজও বলাবলি করে, "এই পুকুরে মরহুম হুজুর গোছল করেছিলেন।"

মরহুম জহীরুদ্দীন আকন্দ তাঁর ছোট্ট নাতিকে সাথে নিয়ে যেতেন হেদায়েতের কাজে। এতে আল্লাহর কী অভি প্রায় ছিল বলা কঠিন। জহীরুদ্দীন আকন্দ কি জানতেন এই শিশুটির সত্যিকার পরিচয়? জানতেন কি তিনি কী এক বিরাট সম্ভাবনার উজ্জ্বল দীপ্তি লুক্কায়িত রয়েছে তাঁর এই নাতিটির মাঝে? কে জানে, জহীরুদ্দীন আকন্দ হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন এ শিশু সাধারণ নয়, অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর আসল রূপ। সেজন্যই হয়ত বাইরের ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে শিশুটিকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সাথে সাথে রাখতেন আর অন্তরের শত শুভেচ্ছা, শত মাধুর্য মিশিয়ে আপন হাতে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নয়নের মণি এই শিশু নাতিটিকে। ছোট হলেও দাদার অভিপ্রায় হয়ত এই শিশুর মনেও আঁচড় কেটেছিল। তিনিও সারাক্ষণ দাদার আশে পাশেই ঘুরে বেড়াতেন। হয়ত অনাগত ভবিষ্যৎ তাঁকে হাতছানি দিত, মনের গহনে কে বুঝি কথা কয়ে উঠতঃ 'হে অবোধ শিশু– চেয়ে দেখো, তোমার যাত্রাপথ কত দীর্ঘ, কত ঝঞ্ঝাময়! এটি তোমায় পার হতে হবে। তোমার এই অভিজ্ঞ বৃদ্ধ দাদুর কাছে চেয়ে নাও তোমার যাত্রার সকল সাজ-সরঞ্জাম। তিনি তোমায় উজাড় করে দিবেন। সকল নৈপুণ্য আর শুভেচ্ছা দিয়ে তোমায় সাজিয়ে দিবেন পরিপূর্ণ করে।' পরিণত বয়সে অনেক সময়ই তিনি বলেছেন, "আমার এখানে যা কিছু দেখছ সবই আমার দাদা মরহুমের কারামতি"।

হযরত নেছারুদ্দীন (রঃ)-এর পিতা ছিলেন মরহুম হাজী ছদরুদ্দীন। তিনিও পিতার ন্যায় একজন সচ্চরিত্র, অমায়িক এবং খোদাভীরু লোক ছিলেন। সমাজে তাঁরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফার্সী ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাহাদুরপুরের মরহুম হাজী ছইজুদ্দীন মিয়ার কাছে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইসলাম প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মরহুম হাজী ছদরুদ্দীন গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম মরহুমা যোহরা বেগম। বাংলা ১২৯৩ সালে পবিত্র হজ্জ্ব উপলক্ষে তিনি মক্কা-মদীনা শরীফ গমন করেন এবং সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। জান্নাতুল মুয়াল্লায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। উলেখ করা যেতে পারে তখনও মরহুম জহীরুদ্দীন আকন্দ জীবিত ছিলেন। ছারছীনার আকন্দ পরিবারের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের বিশেষ আর কারও পরিচয় তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে মরহুম হাফিজুদ্দীন পুরোহিত বলে এ বংশে এক মহান ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজ ছিল হিন্দুপ্রধান। তাই মুসলমানের নামের সাথেও পুরোহিত শব্দ ব্যবহার করা হতো। মরহুম হাফিজুদ্দীন পুরোহিত ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এবং সমাজে একজন বিশিষ্ট হাদী হিসেবে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।

আকন্দ পরিবারের ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ধার্মিক হিসেবে এ বংশের সুনাম সবসময়ই অক্ষুণ্ন ছিল। শুধু তাই নয়, সমাজে ইসলাম প্রচার করে মানুষকে হেদায়েত করার একটি ধারা বহুদিন আগে থেকেই এই বংশের পূর্বপুরুষগণ সযত্নে রক্ষা করে এসেছিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানগণ এসে ধর্মীয় ও শরীয়তের বিভিন্ন অনুশাসন যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে বাড়িতে একটি মুসাফিরখানা তৈরী করা হয়েছিল। জানা যায় এই মুসাফিরখানা হযরত নেছারুদ্দীন (রঃ)-এর পিতা মরহুম হাজী ছদরুদ্দীনের আমল থেকে চালু ছিল। এখানে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগেঃ যেখানে আশেপাশে সর্বত্র অনৈসলামিক ভাবধারা বিরাজমান, সেখানে সকল প্রতিকূল পরিবেশ সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে ডকভাবে এই আকন্দ পরিবার এতদিন তার আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বেড়ে উঠেছিল? নিশ্চয়ই এর পেছনে ছিল মহান আলাহর এক বিশেষ অভিলাষ। আল্লাহর কাছে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সব সমান। তিনি জানতেন ধর্মের অনুশাসন উপেক্ষা করে বাংলার মুসলিম সমাজ একদিন নিজের জন্য ডেকে আনবে চরম দুর্দিন, সীমাহীন দুর্গতি। সেদিন তাকে উদ্ধার করার জন্য একজন বীর মুজাহিদ ওলীয়ে কামেলের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হয়ে

পড়বে। তাই যথা সময়ে তার আগমন নিশ্চিত করার জন্য সবার অলক্ষ্যে আলাহ্ বাহন হিসেবে বেছে নিলেন একটি বংশ- আকন্দ বংশ- জারী করে দিলেন হেদায়েতের একটি স্বচ্ছ ধারা। সময় গড়িয়ে গেলো- এলো সেই চরম মুহূর্ত। হেদায়েতের সেই প্রবাহমান ধারাটিও পেলো গতি, পেলো পরিপূর্ণ রূপ। সবকিছু ছাপিয়ে দুর্বার গতিতে শতদিকে শতধারা প্রবাহিত হল- আল্লাহর মহান অভিলাষ পূর্ণ করে বাংলা-১২৭৯ (১৮৭৩ ইং) মুসলিম সমাজের এক যুগসন্ধিক্ষণে আলোকবর্তিকা হাতে লয়ে যোহরা- ছদরুদ্দীনের পুর্ণকুটিরে মহা সমারোহে যিনি আবির্ভূত হলেন তিনিই সেই ভাগ্যবান মহাপুরুষ, বাংলার গৌরব, আওলিয়াকুল শিরোমণি, মুজাদ্দিদে যমান হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)।

একটি সুন্দর জীবন- প্রভাত

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে শতাধিক বছর আগের গ্রাম বাংলার চিত্র কল্পনা করা কিছুটা কঠিন বৈকি। আপন তাহজীব-তামাদ্দুন বর্জিত মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দুদের চাইতে পশ্চাৎপদ, বিজাতীয় ভাবধারার আবর্তে পতিত মুসলিম পরিবারগুলো চরম হীনমন্যতার মাঝে নিজেদের অস্তিত্ব কোন রকমে টিকিয়ে রাখছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ থাকায় ধর্মীয় ভাবাপন্ন অভিভাবকদের অনেকেই তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুদিন পাঠশালায় গমনাগমন করে যৎসামান্য বিদ্যার্জনে সন্তুষ্ট থেকে বিদ্যাশিক্ষার উপর ইতি টানাই ছিল গ্রাম বাংলার মুসলিম সন্তানদের সাধারণ রীতি। ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাই সমাজে মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তখনকার সময়ে মুসলমানদের জন্য তেমন সহজ ছিলনা।

বাংলার মুসলিম সমাজের এমনি এক ভয়াবহ সংকট-মুহূর্তে একটি অজ্ঞাত সাধারণ গ্রামে শিশু নেছারের জীবনধারা কোন্ স্রোতে প্রবাহিত হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু সৃষ্টি-জগতে অনেক সময়ই স্বাভাবিক ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটে। এই শিশুটির বেলায়ও তেমনি একটি ব্যতিক্রম কীভাবে এক অসাধারণ ইতিহাসের সূচনা করেছিল তা সত্যিই বিচিত্র ও চমকপ্রদ।

ছোট বেলা থেকেই শিশুটি শান্ত, সুবোধ ও একান্ত ধর্মভীরু বলে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। পড়াশুনায় ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। অন্য সাধারণ বালকদের মত নিছক আনন্দ-উল্লাসে সময় ব্যয় করা তাঁর স্বভাবের বিপরীত ছিল। সমবয়সের ছেলেরা যখন বিভিন্ন খেলাধুলা আর কৌতুকে মেতে থাকত, তখন গম্ভীর প্রকৃতির এই ছেলেটি একাকী বসে অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর আনন্দের উপাদান ছিল ভিন্ন। শিশু বয়সেই তিনি যেন অতিমাত্রায় চিন্তাশীল ও গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। নদীর জোয়ারভাটা, 'প্রভাতের অরুণরাঙা আকাশ', পাখির ক,জন, রাতের আকাশের লক্ষ তারার সমারোহ- প্রকৃতির বুকে এইসব লীলাখেলা তাঁর ছোট্ট মনটিকে সবসময়ই আচ্ছন্ন করে রাখত। মনের কোণে উঁকি দিত এক বিরাট প্রশ্ন- এসবের ভেদ কোথায়? তাঁর গম্ভীর ভাব ও মৌনতা দেখে অনেক সময়ই মনে হত বৃহত্তর এক পরিসরে বাইরের কোন জগতের সাথে তাঁর গোপন সংযোগ, পরিবেশের সকল আবিল্য থেকে মুক্ত হয়ে শিশু মনটি সুদূরের কোন ভাবলোকে যেন বিচরণ করছে, এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত রয়েছে। প্রকৃতি তাঁর কাছে এক চরম বিস্ময়। সকলের অলক্ষ্যে এই প্রকৃতিই যেন তাঁর আসল শিক্ষাগুরু। বারবার তাঁর শিশুমনের অনেক গভীরে সৃষ্টিতত্ত্বের পরশ বুলিয়ে প্রকৃতি সেটিকে সচকিত, সজাগ করে তুলল। বস্তুতঃ সৃষ্টিতত্ত্বের যে জ্ঞান সেটিইত পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানইত সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার সন্ধান দেয়, মানুষকে পূর্ণতা লাভ করার সুযোগ করে দেয়। মনে হয় ভবিষ্যতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহান আল্লাহর ইচ্ছা করেই শিশু নেছারের অন্তরে সেই স্বর্গীয় জ্ঞান ঢেলে দিয়েছিলেন। এই মহাপুরুষের শিশুকালটি ১৪০০ বছর আগে আরবের মরুপ্রান্তরে মেষ চরাতে গিয়ে নির্জনে বসে স্রষ্টার চিন্তায় মগ্ন আমেনা-

দুলালের সেই সুন্দর শিশু-জীবনের কথাই আমাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ ''খোদা যেন কোন এক গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মুহাম্মদকে বারে বারে ঘর হতে টেনে বাহিরে আনলেন। ... ... তারপর প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তাঁর সম্মুখে খুলে ধরে, একে একে তাঁকে প্রাথমিক পাঠ দিতে আরম্ভ করলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে একজন নিয়ন্তা আছেন, তিনি যে আড়ালে থেকে নানা বণের্, নানা গন্ধে, নানা গানে, নানা ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করতেছেন, এ সত্য তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলেন।''

যুগের ব্যবধান সত্তে¡ও দু'টি শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি ও উপাদানে কী অপূর্ব মিল! এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। মানুষের শিক্ষার মূল হল স্রষ্টাকে জানা- সৃষ্টিতত্তে¡র জ্ঞান আহরণ। তাই, যদি কাউকে স্রষ্টার সত্যিকার বান্দা- তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তবে জীবনের ঊষালগ্নেই তাঁর নির্মল আত্মার গভীর চত্বরে সেই মূল শিক্ষার বীজ বপন করে দিতে হবে। কারণ শিশুমনে যে শিক্ষা, যে উপলব্ধি, যে আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো যায়, সাধারণতঃ পরিণত বয়সে তাকে অবলম্বন করেই মানুষের প্রকৃত বিকাশ ঘটে, তার ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ভবিষ্যতে যে শিশুকে মহান স্রষ্টা দ্বীনের নেছার, নবী-আদর্শে উজ্জীবিত একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যার প্রভাবে অজ্ঞতার কালিমায় আচ্ছন্ন লাখো মুর্দা-দিল জ্ঞানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, অন্যায়-অবিচারে জর্জরিত আড়ষ্ট সমাজ ইনসাফের গান গেয়ে উঠবে, সেই নায়েবে নবীর জীবন-প্রভাত স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সকল যুগের শ্রেষ্ঠতম শিশু মহানবী (দঃ)-এর গুণাগুণের দীপ্তি লয়ে বিকশিত হবে, সেটিইত স্বাভাবিক, সেটিইত কাম্য।

ইঙ্গিতবাহী ঘটনা

হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) তখন পাঠশালায় পড়েন। যে পথ দিয়ে তিনি পাঠশালায় যেতেন, তার পাশেই ছিল হিন্দুদের এক মন্দির। সেখানে ছিল ছোট-বড় অনেকগুলো মূর্তি। তাঁর সহপাঠীরা সকলেই সেই সব মূর্তি দেখে হাসাহাসি করত এবং সারা পথ কৌতুকে মেতে থাকত। তাঁকেও তাদের সে কৌতুকে যোগ দেয়ার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু তিনি কোন দিনই তাদের সে ডাকে সাড়া দেননি। বরং খুব সাবধানে মূর্তি-বিগ্রহ থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে তাড়াতাড়ি সে পথটুকু পার হয়ে যেতেন। মনে হতো তিনি যেন মনে মনে অত্যন্ত ভীত-শংকিত। সহপাঠীরা স্বাভাবিকভাবেই এতে আরও মজা অনুভব করত এবং জোর করে মূর্তির দিকে তাকানোর জন্য তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলত। গুরু মহাশয় শান্ত সুবোধ এই বিনয়ী ছেলেটিকে আগে থেকেই খুব ভালবাসতেন। তাই এই নিরীহ ছাত্রটিকে অযথা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সকলকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

তাঁর শৈশবকালের এটি একটি সাধারণ ছোট্ট ঘটনা। তবে এটিকে যদি তাঁর পরবর্তী জীবনের বিশাল কর্মকাণ্ডের আলোকে বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে এটি একটি বিরাট ইঙ্গিতবাহী ঘটনা। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে মূর্তি- বিগ্রহ তাঁর শিশু মনটিকে এত ভীত, এত চঞ্চল করে তুলেছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটি সূ² বিষয়ের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত- সৃষ্টির সেরা। স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা তখনই সম্ভব, যখন সে গভীরভাবে নিজেকে চিনতে পারে এবং তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেটির যথার্থ স্ফুরণ ঘটাতে পারে। এজন্য যেটি প্রয়োজন সেটি হল সেই অসীম অনন্ত শক্তির স্পর্শানুভূতি। স্রষ্টাকে আপন জীবনের মধ্যে বরণ করে তাঁর সাথে গড়ে তুলতে হবে আত্মার এক নিবিড় সংযোগ। সে তখন স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত হবে, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে, জড় জগতের সকল দাসত্ব- শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে- পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে। তখনই সে উপলব্ধি করতে পারবে এই সৃষ্টিজগতে সে-ই সকলের ঊর্ধ্বে- আশরাফুল মাখলুকাত, মহান আল্লাহর প্রতিনিধি।

একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় আত্মবিকাশের এই সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত হতে সবচাইতে বড় বাধা হল পৌত্তলিকতা। পৌত্তলিক আত্মবিস্মৃত এবং ভীরু। সে নিজেকে চিনেনা। নিজের অসীম শক্তি এবং ব্যাপকতার খোঁজ সে রাখেনা। চন্দ্র-সূর্য সহ সকল সৃষ্টিকে যেখানে মানুষের অধীন করে সৃষ্টি করা হল, সেখানে পৌত্তলিক নিজেই সকলের অধীন থেকে তাদেরকে নমস্য মনে করে শান্তি পেতে চায়। অসীমের সাথে মিলনের যে অনন্ত সম্ভাবনা তার মাঝে লুকিয়ে ছিল সেটিকে উপেক্ষা করে সৃষ্টি আর হাতে গড়া পুতুলের কাছে বিক্রি হয়ে অসীম রাজ্যে পৌঁছার পথটিকে সে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়। নিজের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে দাসত্বের বেড়ী গলায় ঝুলিয়ে পথহারা নাবিকের মত সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। ফলে 'চিত্তমুকুরে আর অনন্তের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়না' এবং সকল সম্ভাবনাময় একটি সুন্দর স্বাভাবিক মনের অপমৃত্যু ঘটে, জীবনের চরম ব্যর্থতা নেমে আসে।
সাধারণ অর্থে পৌত্তলিকতা বলতে মূর্তি পূজাকে বুঝালেও ব্যাপক অর্থে মানুষের মাঝে বিরাজমান কুপ্রবৃত্তিসমূহের দাসত্ব করা হ'ল পৌত্তলিকতা। তাই যাদের মাঝে কাম, ক্রোধ,লোভ,মোহমদ,মাৎসর্য বা পরশ্রীকাতরতা, গর্ব, হীনমন্যতা প্রভৃতি স্থূলপ্রবৃত্তিগুলো অধিকতর প্রবল, তারা পরোক্ষভাবে পৌত্তলিকতাকেই লালন করে ।

পৌত্তলিকতার সাথে ইসলামের রয়েছে একটি মৌলিক বিরোধ। রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর আহ্বানের মূল লক্ষ্যই ছিল পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর আগমনের একটি উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের অন্তরকে পবিত্র করা। অর্থাৎ পৌত্তলিকতা তথা কুপ্রবৃত্তির নিগড়ে বন্দী মৃতপ্রায় অন্তরকে শৃঙ্খলমুক্ত করে তথায় তাওহীদের ঝর্ণাধারা বইয়ে দেয়া, তাকে সঞ্জীবিত করে তোলা, তার মাঝে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে দেয়া। যুগে যুগে যেসব নবী, রাসূল আর মহাপুরুষগণ দুনিয়ার বুকে এসেছেন তাঁরা সবাই মানুষের অন্তরকে পৌত্তলিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে আলাহর জমিনে কীভাবে ইসনাফপূর্ণ একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা যায় আজীবন তারই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনে পৌত্তলিকতার পাপে নিমজ্জিত কত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। মানুষকে তৌহীদের মূলমন্ত্র শিক্ষা দিয়ে কিভাবে তার কুপ্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এনে নির্মল আত্মার অধিকারী করা যায়, তার আত্মবিকাশের পথ সুগম করা যায় সেটিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই সমাজকে পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল যাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত, স্রষ্টা তাঁর মন-মানসিকতা পৌত্তলিকতার সকল প্রভাব থেকে মুক্ত করে এর প্রতি চরম ঘৃণা আর আক্রোশ দিয়ে গড়ে তুলবেন, সেটিই স্বাভাবিক নয় কি? তাই দেখা যায়, যে মূর্তির সাথে মূর্তি পূজা জড়িত, পৌত্তলিকতা জড়িত, তা থেকে ছোটবেলা থেকেই তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সব সময়ই সচেষ্ট থাকতেন। সেটি নিয়ে সহপাঠীদের সাথে কৌতুকে যোগ দেয়া ত দূরের কথা, তাঁর বালকসুলভ স্বাভাবিক চপলতাও তাঁকে সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ করতে পারেনি। বরং একথা ভেবেই তাঁর ছোট মনটি হয়ত ভয়ে সংকুচিত হয়ে যেতো, বুঝি বা মূর্তির দিকে তাকালেও রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার সেই আহবানকেই উপেক্ষা করা হবে, ইসলামের মূল বিষয়টিকেই অস্বীকার করা হবে। ভাবতে বিস্ময় লাগে পৌত্তলিকতা মহাপাপ, জীবনে সার্থকতা বইয়ে আনতে হলে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষকে পৌত্তলিকতার সকল উপাদান (ঊষবসবহঃ) সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে- এই সত্যোপলব্ধি তাঁর মনে কত শৈশবকালেই না জন্ম নিয়েছিল। মহাপুরুষদের জীবনের ঊষালগ্নটি বুঝি ভবিষ্যতের এক বিরাট ইঙ্গিত দিয়ে এমনিভাবেই পরিস্ফুট হয়।

মাদরাসায় এলেন এতিম নেছার

নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর বয়স যখন খুব অল্প তখন তাঁর পিতা মরহুম হাজী ছদরুদ্দীন ছাহেব পবিত্র হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। বালক নেছারুদ্দীন এতিম হলেন। তাঁর দাদা মরহুম জহীরুদ্দীন আকন্দ তখনও জীবিত ছিলেন। তাই পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। যাই হোক, দাদা মরহুম এই পিতৃহীন

নাতিটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাঁকে সব সময়ই তিনি চোখে চোখে রাখতেন। কিন্তু তাঁর এ সুখটুকুও স্থায়ী হলনা। কিছুদিন পর মরহুম জহীরুদ্দীন আকন্দও তাঁর নাতিটিকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে পরলোকে চলে গেলেন। সংসারে একমাত্র বিধবা মা ছাড়া এই অসহায় বালকটির তেমন কোন অভিভাবক আর রইলনা। একদিকে অভিভাবকহীন, অপরদিকে সংসারে অসচ্ছল অবস্থা। দুই মিলে ফুটে উঠল হৃদয়বিদারক এক করুণ দৃশ্য। কিন্তু এজন্য বালক নেছারুদ্দীন অথবা তাঁর মহীয়সী জননী কেউ কোনদিন কোন অভিযোগ করেননি। আল্লাহর ইচ্ছাকে তারা সহজভাবে গ্রহণ করলেন।

সংসারের সকল অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্যে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে নেছারুদ্দীন আহমদ বড় হতে লাগলেন। মনে হয় তাঁর এই দুঃখময় জীবনের পিছনে ছিল পূর্ব নির্ধারিত আল্লাহর এক গোপন অভিপ্রায়। কালে যে বালকটিকে তিনি দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁকে ইচ্ছা করেই তিনি সহায়-সম্বলহীন করে দিলেন। ভবিষ্যতে তাঁর পথ হবে বন্ধুর, বিপদসংকুল, ঝড়-ঝঞ্ঝায় ভরা। ধৈর্যের সাথে এগুলো মোকাবেলা করতে হবে। তাই মনে হয় মহান আলাহ যেন তাঁকে একান্ত আপনার কাছে টেনে নিয়ে সতর্ক অভিভাবকের মত ছোট বয়স হতেই ভবিষ্যত প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছিলেন।

বহু বছর আগের বাংলার এক নিভৃত পল্লী। সাধারণ মুসলিম পরিবারের এক অসহায় বিধবা মহিলা জোহরা বেগম। তাঁর মনে অনেক আশা, আবার অনেক শঙ্কা। জীবনের সকল ব্যথা বুকে চেপে রেখে তিনি কেবলই ভাবেন, কোথায়, কীভাবে মানুষ করে তুলবেন তাঁর আদরের দুলালটিকে। আশে পাশে কোন মক্তব নেই, মাদরাসা নেই। বিদেশে পাঠালে পিতৃহীন ছেলেটিকে দেখবে কে? তিনিই বা কী করে থাকবেন তাকে ছেড়ে? তিনি ভাবেন আর ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কোন ক‚ল-কিনারা দেখতে পাননা। হঠাৎ যেন কোথা থেকে সকল প্রশ্নের নিরসন হলো। তাঁর মনের কোণে কে যেন বলে গেল, জোহরা, আল্লাহ যাঁর সহায়, তাঁর জন্য ভাবছ কেন? যে কুঁড়িটি একদিন প্রস্ফুটিত হয়ে সারা বিশ্বে সৌরভ ছড়াবে, তাকে তুমি আগলে রাখছ কেন? জোহরা বেগমের তন্দ্রার ঘোর যেন ভেঙ্গে গেল । তিনি প্রেরণা পেলেন, শক্তি পেলেন। চোখের অশ্র" গোপন করে শত উৎসাহ, শত আশিস দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন দূরের মাদরাসায়। বুক ভরা আশা, ছেলে তাঁর আলেম হবে, বিশ্ব-বরেণ্যদের একজন হবে। দুঃখিনী মায়ের সে আশিস বৃথা যায়নি। সেদিনের তাঁর সেই দোয়া, প্রেরণার ফলেই পরবর্তীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন মহান সাধক অলীয়ে কামেল হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)।

এই ঘটনাটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর অতীতের বাগদাদবাসিনী এক মহীয়সী মহিলার কথা। তিনিও এমনিভাবে তাঁর পিতৃহীন ছোট্ট ছেলেকে শত উৎসাহ, শত উপদেশ দিয়ে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন বিদ্যা শিক্ষার জন্য। আর সেই উৎসাহেরই ফসল হলেন অলীকুল শিরোমণি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), যিনি "গাওসুল আজম" নামে সারা বিশ্বে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। ধন্য "গাওসুল আজম" জননী, ধন্য জোহরা বেগম। জগতের দুই মহাপুরুষের বিরাট কৃতিত্বের সাথে তোমাদের এক একজনের সেই প্রেরণা, সেই অবদান চিরভাস্বর হয়ে থাকবে, তোমাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আদর্শ শিক্ষার্থী

বিধবা মায়ের শত দোয়া মাথায় লয়ে কিশোর নেছারুদ্দীন বাড়ি থেকে বের হলেন জ্ঞানের অন্বেষণে, এলেন মাদারীপুরের এক মাদরাসায়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই একজন বিনয়ী, ভদ্র, মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিদ্যার্জনে শিক্ষার্থীদের মাঝে যে সব প্রয়োজনীয় গুণ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, নিঃসন্দেহে তার একটি হল ওস্তাদের প্রতি আদব ও ভক্তি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন "যিনি আমাকে একটি হরফও শিক্ষা দিলেন, আমি তার গোলাম। ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে বিক্রি করে দিতে পারেন, অথবা আজাদ করে দিতে পারেন। আর যদি চান আজীবন তিনি আমাকে গোলাম

বানিয়েও রেখে দিতে পারেন"। হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর চরিত্রে ছোটকাল হতেই ওস্তাদের প্রতি আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছিল। সেজন্য সহজেই তিনি সকল শিক্ষকের মনে একটি স্থান দখল করে নিলেন। পাঠ্য বহির্ভূত বিষয়েও তিনি শিক্ষকগণের যে কোন নির্দেশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে সচেষ্ট থাকতেন। মাদারীপুরের মরহুম মাওলানা জনাব আলী ছাহেব তাঁর বাল্য-ওস্তাদ ছিলেন। জনাব ইসকান্দার আলী ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র। পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) তাঁর সেই ওস্তাদ-ভাইটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পাঠ্যাবস্থায়ও তিনি তাকে অনেক সময়ই কোলে-পিঠে নিয়ে, তার সাথে নির্মল আনন্দ-কৌতুক করে সময় কাটাতেন। এগুলোকে তিনি তাঁর কর্তব্য কাজ বলে ধরে নিতেন।

শুধু শিক্ষকের প্রতিই নয়, শিক্ষাস্থানের প্রতিও তাঁর ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের টান। পরিণত বয়সে লোকদের হেদায়েত করার উদ্দেশ্যে যখন তিনি মাদারীপুর যেতেন, তখন কিশোর বয়েসের নানা স্মৃতি তাঁর মন-প্রাণকে আচ্ছন্ন করে রাখত, তাঁর চোখ অশ্র"-সজল হয়ে উঠত। লোকদের সাথে তাঁর মধুর ব্যবহার দেখে মনে হতো তারা যেন কত নিকট-আত্মীয়। তখন তাঁর কৃতিত্ব ও কামালিয়াত দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। তবুও সাধারণ মানুষের সাথে তিনি হেসে হেসে কথা বলতেন, তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। পালকিতে না চড়ে পায়ে হেঁটেই ওস্তাদের দেশে চলাফেরা করতে তিনি অধিক আনন্দ পেতেন। সাধারণ হলেও তাঁর চরিত্রের এ দিকটি কতই না মধুর !

হাদীসে রয়েছে ঃ "বিদ্যাশিক্ষা করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ, যে জ্ঞানার্জনের জন্য পথ চলে সে আল্লাহর পথে চলে"- ইত্যাদি। নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) হাদীসের এই কথাগুলো মনের মাঝে গেঁথে নিয়েছিলেন। মাদরাসায় অধ্যয়নকালে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। মাদরাসা থেকে ফিরে এসে ক্লাসের পাঠ তৈরী করা এবং ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করাতেই তিনি অধিক সময় ব্যয় করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। আরবী ব্যাকরণের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো তিনি অনায়াসেই মুখস্ত করে ফেলতেন। মাদরাসায় যাওয়ার সময় সকলের সাথে না গিয়ে একা একা অন্য পথে যেতেন। পথের মধ্যে গল্প-গুজবে অযথা সময় নষ্ট না করে ক্লাসের পড়াগুলো স্মরণ করে করে তিনি যেতেন। নিয়মিত ক্লাশেস উপস্থিত থাকার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। বিশেষ কোন কারণ না থাকলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও মাদরাসায় অনুপস্থিত থাকা তাঁর স্বভাবের বিপরীত ছিল। পরবর্তীকালে পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) নিজেই এ সম্পর্কে তাঁর একটি ঘটনার উলেখ করেছেনঃ

সময়টি ছিল বর্ষাকাল। প্রবল বর্ষণে সব পথ-ঘাট পানিতে ডুবে গেছে। তবুও তিনি রওনা দিলেন মাদরাসায়। কিন্তু পথের উপর পানি এত বেশি জমে গিয়েছিল যে, কিছুদূর যাওয়ার পর পথচলা আর সম্ভব ছিলনা। কী করা যায়? এক মুহূর্ত ভাবলেন। মাদরাসায় ত তাঁকে যেতেই হবে। তাই কোন উপায় না দেখে গায়ের জামা আর কিতাবাদি মাথায় নিয়ে বুক-সমান পানির ভিতর দিয়ে তিনি পথ চলতে লাগলেন। কী মহান দৃশ্য! বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্বের উপর রাসূল (দঃ)-এর পবিত্র হাদীসের প্রতি কী গভীর অনুরাগ আর শ্রদ্ধাবোধ! একটি জ্ঞানপিপাসু কিশোর মনের কী বিরল দৃষ্টান্ত! জনৈক ব্যক্তি তাঁকে সেভাবে চলতে দেখে নৌকাযোগে মাদরাসায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মাদরাসায় অধ্যয়নকালে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করে দিন কাটিয়েছেন, নিম্নের লেখা থেকে তা আরও বেশি করে আঁচ করা সম্ভব হবেঃ ফরিদপুরে কোন এক মাদরাসায় হুজুর যখন পড়াশুনা করেন তখন একজন গরীব পরহেজগার লোকের বাড়িতে তিনি জায়গীর থাকতেন। লোকটি এতই গরীব ছিল যে, তার বাড়িতে দিনে একবার মাত্র রান্না হ'ত। একথা জেনেও হুজুর সেই বাড়িতে জায়গীর থাকতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নাই। একদিন সকালে বাড়িতে ভাত পাক করা হ'ল- ভাতের ফেনের সাথে সিদ্ধ পাটশাক দিয়ে নাস্তা করে হুজুর মাদরাসায় রওনা হলেন। তখনকার দিনে পথ-ঘাট বলতে কিছুই ছিলনা- তদুপরি তখন ছিল ভাদ্র মাস- বৃষ্টি শুরু হল। হুজুর একটি বড় গামছা পরে পরনের জামা-কাপড়, কিতাবাদি একত্রে বেঁধে মাথায় করে মাদরাসায় রওনা হলেন-

কোথাও হাঁটু পানি, কোথায়ও কোমর পানি, আবার কোথায়ও বুক পরিমাণ পানি। হঠাৎ দেখলেন অদূরে একটি কুমীর তার দিকে তাকিয়ে আছে। কুমীরকে লক্ষ্য করে হুজুর বললেন- আমাকে খেতে চাস? আয়- আমি মাদরাসায় যাচ্ছি। হঠাৎ কুমীরটি পানির নিচে তলিয়ে গেল। যা-ই হোক, সেই অবস্থায় পথ অতিক্রম করে মাদরাসায় হাজির হলেন এবং কাপড়-চোপড় বদলিয়ে মাদরাসায় ক্লাস করলেন। ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার পথে একইভাবে তাকে সারাপথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বাড়ি এসে কী খেলেন? সেই যে সকাল বেলা ভাত রান্না করা হয়েছিল সেই ভাত এবং সেই পাটশাক সিদ্ধ। সারা বর্ষাকাল এভাবেই তাঁকে কষ্ট করে ক্লাস করতে হয়েছিল।

ভাবতে অবাক লাগে সেই অশিক্ষার যুগেও বিদ্যার্জনের এই প্রবল বাসনা তাঁর মাঝে কোত্থেকে জন্ম নিয়েছিল। আজকের স্কুল-মাদরাসার কোন কিশোর বালকের কাছে ঘটনাটি হয়ত তাৎপর্যহীন মনে হতে পারে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভিতরে এমন অদম্য স্পৃহা ও চেতনা না জাগলে কেউ কি কখনও প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে?

পাঠ্যাবস্থা থেকেই হুজুর কেবলা কেমন তাকওয়াধারী ছিলেন মাদরাসায় থাকাকালীন নিম্নের আর একটি ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়ঃ
মরহুম হুজুর যখন মাদারীপুর পড়াশোনা করেন, তখন তিনি প্রথম বিয়ে করেন মাগুরা গ্রামের মরহুম মোঃ দলীল উদ্দিন শিকদারের প্রথমা কন্যাকে। একবার বাড়ি থেকে মাদরাসায় যাওয়ার পথে উজিরপুর থানায় তাঁর নানাশ্বশুর বাড়ি বেড়ানোর ইচ্ছা করে তাঁর ছোট শ্যালক মরহুম আবদুল গণি শিকদারকে সঙ্গে নিলেন। আছর নামাজের পর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হুজুর কেবলা বাইরে একটি বেঞ্চের উপর বসে রইলেন আর শিকদার সাহেব ভিতরে গিয়ে বললেন- নানী, মুন্সি এসেছে (তখন হুজুরকে সবাই মুন্সী বলে ডাকতো)। নানী শ্বাশুড়ী খুশী হয়ে পাকের ব্যবস্থা করতে ভিতরে চলে গেলেন। এদিকে নানা-শ্বশুরের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পেলেন- তিনি শহরে কোন এক মামলার সাক্ষী দিতে গেছেন। একথা শোনামাত্র হুজুর কেবলা তার জিনিসপত্র নিয়ে রয়ানা হলেন এবং সিকদার সাহেবকে বললেন, তুমি এখানে বেড়াও, আমি মাদরাসার পথে একটু এগিয়ে যাই। সিকদার সাহেব ভাল করে না বুঝে হুজুরের পিছনে পিছনে রয়ানা দিলেন। হুজুরকে বার বার না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা সত্তে¡ও তিনি সামনে চলতে লাগলেন। কাছেই ছিল একটি জীর্ণশীর্ণ মসজিদ- কোন আলো নেই, মশায় ভর্তি। সেখানেই আজান দিয়ে দু'জনে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সিকদার সাহেব বাইরে এসে হুজুরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। হুজুরের দেরী দেখে তিনি ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলেন হুজুর মাথা নিচু করে ওজীফা আদায় করছেন। সিকদার সাহেবকে দেখেই তিনি বললেন - তুমি যাও নাই? তাড়াতাড়ি যাও, নানী নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন। হুজুরকে যাওয়ার কথা বললে উত্তর দিলেন- আমি আজ এখানেই থাকব, এখানেই খাব। আমার কাছে চিড়া আছে। এই বলে গামছায় বাঁধা চিড়া নিয়ে কাছের পুকুরে ভিজিয়ে নিয়ে এলেন এবং শুধুমাত্র সেই চিড়া দিয়েই রাতের আহার করলেন। অগত্যা সিকদার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন- আপনার এরূপ করার কারণ কি? হুজুর উত্তর করলেন- শোন মিয়া, নানাজী মোকদ্দমার সাক্ষী দিতে গেছেন, সেখানে কিছু মিথ্যা কথাও ত বলা হতে পারে, যে কারণে সেই বাড়িতে খাওয়া আমার ঠিক হবেনা। সুবহানাল্লাহ !

মাদরাসা ছুটি থাকলে তিনি বাড়ি আসতেন। ছুটির অবসরে তাঁর মরহুম পিতার অনেক মুরীদান- ভক্তদের একান্তআগ্রহে মাঝে মাঝে মঠবাড়িয়ার অঞ্চলে বেড়াতে যেতেন। তাঁরা পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। টাকা পয়সা দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে তাঁকে সাহায্য করতেন। নিজের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে বাকী টাকা তিনি মাকে দিয়ে দিতেন। মা'র প্রতি তিনি কোনদিন কিছুমাত্র অবহেলা করেননি। মহীয়সী জননীও ছেলের বিদ্যাশিক্ষার জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। টাকা পয়সার জন্য ছেলেকে তিনি

কোনদিন চাপ দেননি। তাঁর একটি মাত্র অভিলাষ- ছেলে বড় হবে, দেশের পথহারা অশিক্ষিত মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে।

মাদারীপুরের শিক্ষা সমাপ্ত করে পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে কিছুদিন অধ্যয়নের পর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় চলে যান। কলিকাতায় থাকাকালে প্রায়ই দেশের লোকজন তাঁর কাছে যাতায়াত করত। তারা তাঁকে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করত বটে কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে তাঁর পড়াশুনার কিছুটা ব্যাঘাত হত। এতে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অগত্যা সেই মাদরাসা পরিত্যাগ করে হুগলী মোহসেনিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে বৃত্তি সহকারে তিনি জমাতে উলা পাশ করেন।

উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এই মাদরাসায় পড়তে আসত। খোদাভীরুতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পড়াশুনা, যুক্তি-তর্ক সব কিছুতেই ক্লাসের সকলের চাইতে পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) অগ্রগণ্য ছিলেন। এতে সহপাঠীদের অনেকেই তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। কোন কথায় বা তর্কে তাঁর সাথে হেরে গেলে অনেক সময়ই তারা তাঁকে "বরিশালের ডাকু" বলে অপবাদ দিত। এতে পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। সে জন্য সামনা সামনি কাউকে তিনি কোনদিন কিছু বলেননি সত্য, কিন্তু তখনই তিনি সংকল্প করেছিলেন- যে করেই হোক, বরিশালের এই দুর্নাম তাঁকে ঘুচাতে হবে। কিশোর শিক্ষার্থীর সেদিনকার সেই সংকল্প মহান আলাহর দরবারে কতটুকু কবুল হয়েছিল বরিশালবাসীদের জন্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুধু বরিশালেই নয়, তাঁর সংকল্পের উত্তাল তরঙ্গ পরবর্তীতে বরিশালের সীমানা ছাড়িয়ে গোটা বাংলায় এমনকি বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিশোর বয়স থেকেই পীর ছাহেব (রঃ) এর চরিত্রে আরও একটি দুর্লভ গুণের সংযোজন দেখা যায়। সেটি হল বই কেনা আর সংগ্রহের অভ্যাস। মানুষের জন্য এ গুণ স্রষ্টার এক বিশেষ নিয়ামত। পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর আর্থিক অসচ্ছলতা সত্তে¡ও নিজের খরচের যৎসামান্য পয়সা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে বিভিন্ন কিতাব এবং উপদেশমূলক বই-পুস্তক ক্রয় করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। টাকা-পয়সা অথবা অন্য কিছুর পরিবর্তে যদি কেউ তাঁকে কোন বই প্রদান করত তাহলে তিনি সবচাইতে বেশি খুশী হতেন। তিনি অতি যতœসহকারে সেই সব কিতাবাদি রেখে দিতেন। আজ ছারছীনার মাটিতে অসংখ্য দুর্লভ কিতাবাদি সম্বলিত বৃহৎ কুতুবখানাটি তাঁর সেই অনন্য অভ্যাসেই পবিত্র সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে এ অভ্যাসটি বিদায়প্রায়। তাদের মাঝে জানার আগ্রহ নেই, বিদ্যার্জনের সত্যিকার স্পৃহা নেই। নিজের পয়সা খরচ করে বই কিনে পড়ার কথা চিন্তা করা ত দূরের কথা, হাতের কাছে বই পেলেও অথবা লাইব্রেরী, একাডেমীর সুযোগ থাকা সত্তে¡ও ইচ্ছা করে বই পড়ার মানসিকতা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নেই। হায়! যাদের উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে, তারা যদি বিদ্যানুরাগী না হয়, পড়াশুনার প্রতি তাদের আত্মার সেই টান যদি না থাকে, কীভাবে তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে? কিভাবে তারা জাতির হাল ধরবে?

শিক্ষা ও জানার কোন শেষ নেই, এজন্য সারা জীবন সাধনা করতে হয়, এ সত্যটি পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) তাঁর জীবনগঠনে এত নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিলেন ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। তাঁর শিশু বয়সের যে জ্ঞান স্পৃহা ছিল, তা বৃদ্ধ বয়সেও তেমনি অটুট ছিল। তিনি যখন বাড়িতে থাকতেন তখন মাঝে মাঝে লাঠিতে ভর দিয়ে মাদরাসার দোতলায় উঠতেন এবং টাইটেল ক্লাসের ছাত্রদের সাথে বসে মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের ভাষণ শুনতেন। একদিন তিনি উপস্থিত সবাইকে ডেকে বললেন, " তোমরা কি জান, কেন আমি এত কষ্ট করে এই ক্লাসে এসে বসি? রাসূলে পাক (দঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ইলম তলব করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার এবং নবীগণের মাঝে মাত্র একটি দরজা বাকী থাকবে। বাবারা, তালেবে ইলমের দফতরে নাম লিখার জন্যই আমি জামায়াতে গিয়ে বসি।" সুবহানালাহ্, শিক্ষার প্রতি কী গভীর অনুরাগ!

সত্যাশ্রয়ী যুবক

ছোট বেলা হতেই পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর আচার-ব্যবহার, কাজ-কর্ম ইত্যাদি দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হত-শত বাধা, শত প্রলোভনের মাঝেও সত্যাশ্রয়ী থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব, সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মিথ্যের সাথে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কোন দিন আপোস করেননি। যারা মনে করে মিথ্যা কথা না বললে কার্যসিদ্ধি হয়না, তাদের মন-মানসিকতার উপর তাঁর ছিল শত ধিক্কার, শত ঘৃণা। ছোট্ট একটি ঘটনা এখানে উলেখ করা হলো। জনৈক হিন্দু ব্যক্তি শত্রুতা করে জমি নিয়ে পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে। উক্ত ব্যক্তির দাবী ছিল- জমিটি তার, ভুলক্রমে পীর ছাহেবের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর উকিল তাঁকে পরামর্শ দিলেন- তাঁকে শুধু আদালতে বলতে হবে জমিটি তাঁর সামনে রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু রেকর্ড করার সময় যেহেতু তিনি উপস্থিত ছিলেন না, সেজন্য তিনি উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী মিথ্যার আশ্রয় নিতে মোটেই রাজী হলেন না, যদিও সত্য বললে তাঁর বিরাট সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কি করে হয়? "সত্য মানুষকে রক্ষা করে এবং মিথ্যা তাকে ধ্বংস করে।"

যাঁর মনে হুজুর (দঃ)-এর এই উক্তি মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে চিরজাগ্রত, তাঁর পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কি করে সম্ভব? তাই হাকিম সাহেব যখন পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) কে প্রশ্ন করলেন, "এ জমি কি আপনার সামনে রেকর্ড করা হয়েছিল?" তিনি স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন- "এ জমি আমার, একথা সত্য। তবে আমার সামনে এ জমি রেকর্ড করা হয় নাই। আমি তখন বিদেশে মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছিলাম। চাচাদের উপস্থিতিতে রেকর্ড হয়েছে"। উত্তর শুনে স্বপক্ষের উকিলসহ সকলেই খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন। বিপক্ষের আনন্দ ধরে না। কিন্তু হাকিম সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে যে রায় ব্যক্ত করলেন তাতে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন- "জমি আমার সামনে রেকর্ড করা হয়েছে" এতটুকু মিথ্যা বললেই যেখানে জমি পাওয়া যায়, একথা জানা সত্তে¡ও যিনি মিথ্যার আশ্রয় নেননি, তাঁর মুখে "এ জমি আমার" সে কথাটিও কিছুতেই মিথ্যা হতে পারে না। এমন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির উক্তি অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর পক্ষেই মামলার রায় হলো। বিপক্ষদল এ নিয়ে আপীল করেছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। ঘটনাটি ছ্ট্রো হতে পারে, তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের তুলনায় এটি সাধারণ হতে পারে, কিন্তু সত্যের প্রতি এমন বিরল শ্রদ্ধাবোধ কত মাধুর্যপূর্ণ। আল্লাহর ওলীদের জীবন এমনি সত্য-কেন্দ্রিক হয়েই গড়ে উঠে।

সময়ের যথেষ্ট ব্যবধান সত্তে¡ও এ ঘটনাটি আমাদেরকে গাওছে পাক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ডাকাতদলের কাছে স্বেচ্ছায় জামার পকেটে সেলাই করা মোহর থাকার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের যে বিরল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন, তা আজও বিশ্ববাসীর কাছে আদর্শ হয়ে রয়েছে। গাওছে পাকের অকপটে সত্য বলার শক্তি ডাকাতদলের মাঝে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সত্যের বিষ-বাণ তারা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেনি। অনুতপ্ত হয়ে সকলেই তাঁর কাছে তওবা করলেন এবং পরে কৃচ্ছ্র সাধনা ও রিয়াযতের বলে বিশেষ বুযুর্গী লাভ করেছিলেন।

পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর ব্যতিক্রমধর্মী এরকম বিভিন্ন ঘটনা তখনকার অনাচার আর অসত্যে জর্জরিত সমাজে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। এই সত্যাশ্রয়ী কিশোর ছেলেটির উপর সকলের দৃষ্টি পতিত হল। বুকভরা আশা নিয়ে গোটা সমাজ তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। প্রতিটি মানুষ বার-বার তাদের সামনে অনাগত কালের একটি সত্যের ঝিলিক দেখতে পেতো। মিথ্যা বিদূরিত হবে, সত্য আসবে- এই আকাক্সক্ষা বার-বার তাদের অন্তরে দোল খেয়ে যেতো। তাদের সে হৃদয়ের কামনা বিফলে যায়নি। সত্যিই একদিন সেই সত্যান্বেষী কিশোর ছেলেটি সমাজ থেকে অসত্য-অনাচার দূর করে সত্যের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। আজকের এই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল সমাজেও প্রতিটি শান্তিকামী মানুষ এমনি সত্যাশ্রয়ী কিশোর-যুবকদেরই আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

ঐযে- মিয়াযী সাহেবের ছেলে এসেছেন

পরিণত বয়েসে কিশোর নেছারুদ্দীন আহমদ একজন হাদী হবেন, সমাজ সংস্কারক হবেন, তাঁর ছোট বেলা হতেই এর আভাস পাওয়া যেতো। ছাত্রাবস্থায়-ই হেদায়েত ও তাবলীগের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। মাদরাসা বন্ধের সময় তিনি পিতা মরহুমের ভক্তবৃন্দের মাঝে যেতেন এবং তাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে শরীয়তের বিধি-নিষেধ শিক্ষা দিতেন। ছোটবেলা হতেই তাঁর প্রখর বুদ্ধি ছিল। অনেক সময় যে সব জটিল মীমাংসা করা বড় বড় সমাজ নেতাদের দ্বারা সম্ভব হতনা, তিনি অতি সহজেই সে সবের মীমাংসা করে দিতেন। তাঁর কিশোর বয়সের ছোট্ট একটি ঘটনা।

মঠবাড়িয়া এলাকায় ধর্মীয় কোন এক জটিল সমস্যা নিয়ে দুপক্ষের মাঝে ঝগড়ার সূত্রপাত হল। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এতদঞ্চলের এক বিখ্যাত আলেমের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সঠিক কোন সমাধান দিতে তিনি ব্যর্থ হলেন। মাদরাসা বন্ধ থাকার দরুণ পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) তখন বাড়িতে ছিলেন। চাচার সাথে মঠবাড়িয়া এলাকায় পিতার মুরীদানদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তাঁর প্রতি তখনকার সকলের ছিল অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। তাঁকে দেখেই সকলে বলে উঠল, "ঐ যে, মিয়াযী সাহেবের ছেলে এসেছেন। তিনি যে মীমাংসা দেন আমরা তাই মেনে নেব"। সুবহানালাহ্! কী গভীর শ্রদ্ধা, কী গাঢ় আস্থা! যদিও তাঁর বয়স তখন খুবই কম, তথাপি তাঁর কাছেই সকলে সমস্যা সমাধানের ভার তুলে দিল। অনেকে নিরুৎসাহ বোধ করলেও পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) আলাহর উপর ভরসা করে সেই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সারাদিন, সারারাত কিতাব দেখায় মগ্ন রইলেন। অবশেষে আল্লাহর রহমতে কিতাবের মাঝে সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন। কিতাব দেখে বহু প্রমাণাদিসহ পরদিন সকলের সামনে বিচারের রায় প্রকাশ করলেন। যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় সকলেই তাঁর সেই রায় আনন্দের সাথে মেনে নিল। সমস্যার সমাধান হলো।

পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর জীবনে এমনি হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে। কিন্তু এই ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন কিশোর ছাত্র। এদিক দিয়ে এ ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনায় তাঁর তীক্ষèবুদ্ধি আর অসাধারণ বিচারশক্তি দেখে মানুষ অবাক হয়ে গেলো। তাঁর প্রতি তাদের আস্থা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। তখন থেকেই তাঁকে ঘিরে তারা একটি সুন্দর ভবিষ্যত সমাজের কল্পনা করত। সবার মনেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল- বুদ্ধিদীপ্ত, খোদাভীরু, আস্থাবান এই কিশোর বালকটি একদিন হাদী হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করবে। লাখো লাখো দিশেহারা মানুষ তাঁর কাছে হেদায়েত পেয়ে জীবনের সঠিক অর্থ খুঁজে পাবে। বস্তুতঃ হয়েছিলও তাই। পরবর্তীতে পরিণত বয়সে তাঁর ব্যাপক হেদায়েতী কর্মকাণ্ড সমাজে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল- মনে হয় এ লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা কিশোর বয়স থেকেই এরূপ ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে তাঁকে একজন আস্থাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

দুই প্রবাহের মিলন

পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) এর সংগ্রামী জীবনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল তাঁর জন্মের পর থেকেই। ভবিষ্যতে এক মহান গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হবে, সেটি যাতে নিষ্ঠা আর দক্ষতার সাথে তিনি পালন করতে পারেন, সেজন্য তাঁর জীবনের শুরু থেকেই স্রষ্টা যেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলছিলেন। হুগলী মোহছেনিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নকাল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলতঃ তখন থেকেই তিনি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন নিজের জাতি এবং স্বদেশবাসীর কথা। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় নিমজ্জিত বাংলার পথহারা মুসলিম জাতির জীবনে কিভাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে তাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে দাঁড় করানো যায়, সেটিই ছিল তাঁর ভাবনা। "নূরে মুহাম্মদী"র স্পর্শে অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে কিভাবে বাংলার মাটিকে পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত করা যায়, মদীনার খুশ্‌বু দিয়ে এর আকাশ-বাতাস মুখরিত করা যায়- তাঁর অন্তরকোণে বার বার উৎসারিত হত এই একটিমাত্র কামনা।

কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন পথ অতি দুর্গম, অতি ভয়াবহ । মনে কিছুটা সংশয় হয়। কিন্তু হেরা পর্বতে বিকশিত সেই সত্যের ঔজ্জ্বল্যে, "সিরাজুম মুনীরা"র স্নিগ্ধ আলোতে যাঁর অন্তর চির উদ্ভাসিত, তিনি ত দমবার পাত্র নন। তাঁর অন্তর আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তায় ভরা। যুবক নেছার ভাবেন আর ভাবেন। জীবন-পথে পা ফেলার পূর্বমুহূর্তে একবার বুঝি পরখ করতে চান নিজের শক্তি, তাঁর চলার পাথেয়। তিনি থমকে দাঁড়ান, অন্তরের গভীরতম স্থানে কোথায় যেন কিসের এক অভাব তিনি অনুভব করেন। তাঁর কানে কানে কে যেন বলছে- হে সত্যান্বেষী, শান্তিকামী যুবক, এপথ প্রেমের পথ, খুব সূ²। সাবধানে পা ফেলো, খুব সাবধান। এ পথ ছলনায় ভরা, দুধারে ওঁৎ পেতে বসে আছে হিংস্র শ্বাপদের দল। এই অচেনা পথে একা চলতে নেই; কত অগণিত দাম্ভিক পথচারীর দর্র্প চূর্ণের করুণ ইতিহাস বুকে লয়ে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছে এই পায়ে চলার পথ। যে-ই একাকী এ পথ পাড়ি দিতে চেয়েছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে। তাই নির্বিঘ্নে এ পথে চলতে হলে, পথের সন্ধান জানেন এমন এক তত্ত¡জ্ঞানী রাহবরের হাতে তোমাকে হাত দিতে হবে। নিজেকে তাঁর কাছে সপে দাও, তোমার সকল ব্যক্তিত্ব, সকল প্রজ্ঞা নিয়ে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ো। দেখবে ওয়াহদানিয়াত আর এশ্কে রাসূলের পরশ বুলিয়ে তোমার মাটির ঢেলাকে তিনি সোনায় পরিণত করে দিবেন। তোমার সুপ্ত প্রতিভা আর কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলে বাতেলের সামনে একজন নির্ভীক বীর-মুজাহিদরূপে তোমায় দাঁড় করিয়ে দিবেন।

যুবক নেছারের মনে জীবন সম্পর্কে এক নতুন তথ্য উদ্ভাসিত হলো। তাঁর সামনে ভেসে উঠল রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সংগ্রামী জীবন। সারা বিশ্ব যখন অবিচার আর অনাচারের তমসায় ছেয়ে গিয়েছিল, তখন আবির্ভূত হলেন বিশ্ববাসীর মুক্তিদাতা আল্লাহর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের অন্তর থেকে মানবরচিত সকল মতবাদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেখানে ওয়াহ্দানিয়াতের বীজ যদি বপন করা না যায়, তবে সমাজের বুক থেকে অশান্তির আগুন নির্বাপিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর মনে উপলব্ধি ছিল, কিন্তু পথের সন্ধান তাঁর জানা ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলই উৎকণ্ঠা- কে তাঁকে হাত ধরে ঈপ্সিত পথের সন্ধান দিবে? বছরের পর বছর তিনি ধ্যানমগ্ন রইলেন। অবশেষে সত্য ও জ্ঞানের চির উৎস মহান আলাহ তাঁর বার্তাবাহক ফেরেশতা জিব্রাঈল আমীনকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আলাহ্র আদেশে জিব্রাঈল আমীন তাঁকে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানালেন, "মুহাম্মাদ (দঃ), পাঠ কর" এবং সকল জ্ঞানের উৎসমুখ তাঁর অন্তরে উম্মুক্ত করে এক নিমেষে মহাসত্যের সাথে তাঁর সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন। রাসূলুলাহ (দঃ)-এর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হলো, সৃষ্টি-রহস্যের সকল তথ্য অবগত হয়ে জ্ঞানের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে তিনি উন্নীত হলেন। ধীরে ধীরে তাঁর যাত্রা হলো শুরু। মহাসত্যের পরশ বুলিয়ে বিশ্ববাসীকে তিনি সচকিত করে তুললেন। সসীম জ্ঞানের সাথে অসীমের যোগ স্থাপন করে তাদেরকে নিয়ে গেলেন অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিলেন যুক্তিবিদ্যা বা প্রজ্ঞার (Reasoning) গণ্ডী পেরিয়ে কিভাবে সজ্ঞার (Finer instinct) পবিত্র চারণভূমিতে বিচরণ করা যায়, যেখানে মানুষের অন্তরচক্ষু খুলে যায়, আল্লাহর নূর দ্বারা সে দর্শন করে, পরম সত্তার জ্ঞানলাভ তারপক্ষে সম্ভব হয়।

যুগে যুগে যত মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন! তাঁরা সবাই এই সজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এই জ্ঞানের সাথে যাদের সংযোগ ঘটেনি, স্থূল জ্ঞানই যাদের একমাত্র সম্বল, পরম সত্তার জ্ঞানলাভ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা অনেক সময়ই বিভ্রান্তির মাঝে বিচরণ করে এবং তাদের যুক্তিতর্কের বেড়াজালে আটকে পড়ে অপরাপর সাধারণ মানুষও বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হয়।

সজ্ঞাবান লোকের সংস্পর্শে আসলে নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা উপলব্ধি করা যায়। তাইত সজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী হযরত শামছুদ্দীন তাবরীজী (রঃ) এর কাছে আসার পরক্ষণেই জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ, পুঁথিগত বিদ্যার তুলনায় তাবরীজী (রঃ) এর জ্ঞানের উপাত্ত অনেক ঊর্ধ্বে। এই উপলব্ধির পরই জ্ঞানের সকল অহমিকা পরিত্যাগ করে তিনি তাবরীজী (রঃ) এর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর গোলামের খাতায় নাম

লিখায়ে নিজের জীবন সার্থক করে তুলেছিলেন। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ
" খোদ বখোদ কামেল নাশুদ মাওলানায়ে রূম
তা গোলামে শামছে তাবরীজী নাশুদ"
অর্থাৎ, (সজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী) শামছুদ্দীন তাবরীজীর গোলামী না করা পর্যন্ত (প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী) মাওলানা রূমী কখনও কামেল হতে পারেননি।
যুবক নেছারের মনে চিন্তার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেলো। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন- তাঁর কেবলই ভাবনা- কোথায় গেলে সন্ধান মিলবে সেই কাঙ্খিত রাহবারের? অশান্ত মন নিয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। এমনি সময়ে আলাহ্র অসীম রহমতে হঠাৎ করে এক জলছায় তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে বাংলার ইসলামী রেঁনেসার কর্ণধার ওলীয়ে কামেল মুজাদ্দিদে যমান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরাভী (রঃ)-এর সাথে। এ সাক্ষাৎ কোন সাধারণ ঘটনা নয়, এর জের সুদূরপ্রসারী। বস্তুতঃ সেদিনই মুসলিম বাংলার জাতীয় জীবনে আবার নতুন করে সূচিত হয়েছিল ইসলামী বিপ্লবের এক মহা ইতিহাস। প্রথম দর্শনেই যুবক অভিত,ত হলেন। কী কান্তিময় চেহারা! বেহেশতের কোন দূত বুঝি নেমে এসেছে তাঁর সম্মুখে। অপলক-নেত্রে তিনি তাকিয়ে থাকেন। মনের কোণে আপনা থেকেই কে যেন বলে উঠল- হে যুবক, দিনের পর দিন যাঁর প্রতীক্ষায় তুমি ছিলে, সারাক্ষণ যার ধ্যান করেছিলে, ইনি সেই। ইনিই তোমার সেই কাঙ্খিত শিক্ষাগুরু, তোমার দীক্ষাগুরু। তোমার প্রত্যাশার দিন আজ ফুরিয়েছে, এবার শুধু ধরা দেয়ার পালা। মনে রেখো, মদীনার সেই হায়াতে নবীর প্রেমের পরশ যদি পেতে চাও, মহাসত্যের সাথে যদি সংযোগ ঘটাতে চাও, তবে এই তাপস প্রবরের পায়ের ধূলো তোমায় গায়ে মাখতে হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর মনে তখন কোন্ ভাবের উদয় হয়েছিল বলা মুশকিল। নদী যেমন দুক,ল ছাপিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে সাগরের পানে মিলনের অভিলাষ নিয়ে, সাগরও তেমনি তার বিশাল ব্যাপ্তি লয়ে উন্মুখ হয়ে থাকে নদীর আগমন-প্রতীক্ষায়। সাগরের বুকে নদীর উচ্ছলতার পরিসমাপ্তি বস্তুতঃ সাগরের বিশালতারই আভাস দেয়। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার প্রকাশ। জিব্রাঈলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে যে জ্ঞান দান করা হয়েছিল, সেখানে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর আকুলতা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটি উপলক্ষ মাত্র। সৃষ্টির মাঝে নিজের অসীমত্ব প্রকাশ করার স্রষ্টার যে অভিলাষ সেটিই ত সেখানে অধিক মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাবরীজী (রঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ফলে মাওলানা রূমী কামেল হয়েছিলেন একথা যেমন সত্য, রূমীর মাধ্যমেই তাবরীজী (রঃ) মনের ব্যাকুলতা প্রশমিত করে প্রশান্তির সাগরে অবগাহন করার সুযোগ পেয়েছিলেন, সে কথাও তেমনি সত্য। হযরত শামছুদ্দীন তাবরীজী (রঃ) এর প্রার্থনার মাঝেই এ কথার সত্যতা মিলেঃ
"হে খোদা! আমি যদি তোমার প্রেমের উপযুক্ত খাঁটি বান্দা পেতাম, তবে তোমার প্রেমের মুক্তারাশি দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ করে নিতাম। অতএব আমার মধ্যস্থিত খোদা- প্রেমের অগ্নিবাণ সহ্য করতে পারে এমন ব্যক্তি আমায় মিলিয়ে দাও।"
যুবক নেছারুদ্দীনকে দেখে মুজাদ্দিদে যমান আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর চোখে-মুখে ফুটে উঠল প্রশান্তির হাসি। যুবকের ললাটে তিনি দেখতে পেলেন ইশকে রাসূলের ছাপ, জেহাদী চেতনার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বিরাট কিছু প্রাপ্তির আনন্দে তাঁরও অন্তর বুঝি নেচে উঠল। অন্তরে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হলো- আবু বকর! এই সেই যুবক, অন্তরের চির আকাক্সিক্ষত ধন, আপন মনের সকল মাধুরী মিশায়ে যাকে তুমি রচনা করবে বলে প্রতিনিয়ত আলাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানিয়েছ, সেই মুজাহিদ যুবক তোমার সামনে। আলাহ্-রাসূলের যে প্রেমের বীজ হাতে নিয়ে তুমি সারাক্ষণ ছুটে চলেছ, তার উপযুক্ত ক্ষেত্র এই। নির্বিঘœ সে বীজ ছড়িয়ে দাও, দেখবে পত্রপুষ্প সুশোভিত করে মহাসমারোহে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠবে হেদায়েতের এক বিশাল বৃক্ষ। অগণিত পথচারী আত্মশুদ্ধির ফল আহরণ করে পরম আনন্দে আপন গৃহে ফিরে যাবে। চিরন্তন স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটায়ে শত আগ্রহ আর আবেগ নিয়ে যমানার মুজাদ্দিদ মধুমিশ্রিত কণ্ঠে তরুণ যুবককে বললেন, "মুরীদ হবে, বাবা?" কী মধুর সম্ভাষণ! কী উদার এক আহবান! যুবকের অন্তর আনন্দে গলে গেলো। এই মহান তাপসের কাছে মন-প্রাণ সঁপে দেয়ার জন্য আগে থেকেই ত তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হলো, সুদূরের কোন ধ্যানলোক হতে মহাসত্যের সাথে হাত মিলানোর জন্য এ আহবান। যুবক সম্বিৎ হারিয়ে

ফেললেন। প্রবল এক উত্তেজনার মাঝে আপনা থেকেই বুঝি মুখ থেকে নিঃসৃত হলো- "হুজুরের মেহেরবানী"। আল্লাহর মহান এক ওলীর প্রসারিত পবিত্র হাতের সাথে হাত মিলালেন তিনি।

বুঝি বিস্ফোরণ হল তাঁর অন্তরে। মাটির পৃথিবী থেকে মুর্শিদ তাঁকে নিয়ে গেলেন অনেক ঊর্ধ্বে, অচেনা এক ভাবলোকে। নিমেষের মাঝে সংযোগ ঘটায়ে দিলেন আরশে মোয়াল◌ার সাথে। মনের মত মানুষ পেয়ে মহান সাধক ইশকে মাওলার জ্যোতির ছটায় মাতোয়ারা করে দিলেন স্বীয় মুরীদকে। সত্যের এক অভিনব পরশে, 'নফি-ইছবাত' এর অলৌকিক যাদুমন্ত্রে মুরীদ তন্ময় হয়ে গেলেন, প্রেমের সাগরে হলেন নিমজ্জিত। এ এক নতুন উপলব্ধি, নতুন অভিজ্ঞতা। এ শুধু অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

তরুণ মুরীদ নেছারুদ্দীনের অন্তরে কামেল মুর্শিদের ফায়েজের প্রভাব এত গভীরভাবে পতিত হয়েছিল যে, বাহির-জগতের সাথে তাঁর কোন সংযোগ ছিলনা। এশার নামাজের আজান হ'ল, নামাজের জন্য সবাই প্রস্তুত হল, কিন্তু তিনি কিছুই টের পেলেন না। তদীয় মুর্শিদ সব কিছু লক্ষ্য করলেন। তিনি ডেকে বললেন, "উঠুন বাবা, নামাজের সময় হয়েছে।" তাঁর কথাতেই তাঁর চেতনা ফিরল। অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সাথে নামাজ আদায় করলেন। সেদিন বিদায়ের মুহূর্তে মুর্শিদ-প্রবর তাঁর নতুন শিক্ষার্থীকে শুধু একটি কথা বলে গেলেন, "বাবা, আমার সাথে আবার সাক্ষাত করো।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর সাথে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর জীবনে এনে দিল এক আমূল পরিবর্তন। জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত তাঁর কাছে খুলে গেলো। মুর্শিদের কাছ থেকে এ জ্ঞানের পূর্ণ পরশ পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অন্তর চায় মুর্শিদের সান্নিধ্য। তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য হুগলী থেকে তিনি ফুরফুরা শরীফ রওয়ানা হলেন। ঘটনাটি বড় রহস্যময়। হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) পরিণত বয়সে তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে বহুবার এই ভ্রমণের কথা উলেখ করেছেন। তিনি বলতেন, "হুগলী হতে পীর ছাহেব কেবলার সাক্ষাতে ফুরফুরায় গিয়েছিলাম কিন্তু আজ দীর্ঘ পয়তালিশ বৎসর পর্যন্ত এই কথা স্মরণ করিতে পারি নাই যে, কিভাবে আমি ফুরফুরায় গিয়েছিলাম।" হুগলী হতে ফুরফুরা শরীফ ২৫/৩০ মাইল। এই দীর্ঘ পথটুকু গাড়িতে, জাহাজে, নৌকায় বা পদব্রজে- কিভাবে তিনি গিয়েছিলেন সেটি বলতে না পারা আশ্চর্যের বৈ কি। জানি, অনেকেই বলবেন ঘটনাটি মোটেই জ্ঞানসম্মত নয়। তাদের কাছে এটি যুক্তিহীন এবং ভিত্তিহীন মনে হবে। এ সবের আলোচনা এখানে করব না। তবে নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়েই সকল ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব বলে যারা মনে করেন তাদেরকে বলি- সবসময় সবকিছু নিজের জ্ঞানের অধীন এবং অনুক‚ল হবে- এরূপ কল্পনা করা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিশ্বের সকল জ্ঞানী-গুণী মনীষী অবনত মস্তকে একথা মেনে নিয়েছেন। যা হোক, এই ঘটনাটি হয়ত স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল, চিরাচরিত পথেই হয়ত তিনি ফুরফুরা গিয়ে থাকবেন। কিন্তু স্বীয় মুরশিদের ফায়েজের প্রভাব তাঁর উপর এত গভীরভাবে পতিত হয়েছিল যে, তাঁর সাথে মুলাকাতের খেয়াল ছাড়া ঐ মুহূর্তে হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর অন্তরে অন্যকিছু বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। কাজেই সেই ছফরটি তাঁর জীবনে একটি উলেখযোগ্য ঘটনা হলেও ছফরের লক্ষ্য, অর্থাৎ প্রিয় মুর্শিদের সাথে মোলাকাতই শুধু তাঁর স্মৃতিরাজ্যে স্থান পেয়েছিল, ছফরের মাধ্যম বা অন্যকিছু তিনি সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন।

নেছারুদ্দীন সনদ পেলেন

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর হাতে বয়াত হবার পর থেকেই যুবক নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর জীবনের গতিধারা এক নতুন পরিসরে প্রবাহিত হতে লাগল। সারাক্ষণ মুর্শিদের সাহচর্যে থাকার জন্য তাঁর মন-প্রাণ সদা চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল। তাঁর সঙ্গলাভ এবং তাঁর কাছ হতে তরীকা শিক্ষাকে তিনি নিজের জীবনের সবচাইতে বড় নেয়ামত, কামনার বস্তু বলে ধরে নিলেন। তাই সংসারের শত অভাব, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে একমাত্র মুর্শিদের কাছ

থেকে জীবনের সকল পাথেয় সংগ্রহ করতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝেই মুর্শিদের খেদমতে হাজির হতেন এবং সময় সময় মাসাধিক কাল তাঁর সাহচর্যে সময় কাটাতেন। সেখানে তিনি অতি সাধারণ ছোট ছোট কাজ করার সুযোগ পেলেও নিজেকে অতিশয় ধন্য মনে করতেন। অনেক সময়ই নিজ-কাঁধে মুর্শিদের পালকি বহন করতেও তাঁকে দেখা যেতো। এতে তাঁর আনন্দ উৎসাহের শেষ ছিলনা। সংসারের সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র মুর্শিদের দিকে তিনি মুতাওয়াজ্জুহ হলেন- তাঁর কাছে মন-প্রাণ সঁপে দিলেন। তাঁর ইঙ্গিত-ইশারা, আদেশ-উপদেশ পুরোপুরিভাবে আপন জীবনে প্রতিফলিত করাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। সে সময় তাঁর জীবন ছিল কঠিন রিয়াজত ও মোজাহাদায় পরিপূর্ণ। প্রায় সারা রাত জেগে তিনি ইবাদত ও মোরাকাবায় মশগুল থাকতেন।

'ছালেক' নেছারুদ্দীন (রঃ)-এর আন্তরিকতা, আদব, আমল, রিয়াজত অতি অল্পদিনের মধ্যেই কামেল মুর্শিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শিষ্যের মাঝে অনাগত ভবিষ্যতের এক বিরাট সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। আর সেটির বিকাশ ঘটানোর জন্য তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। অতি যতœ সহকারে সর্ববিষয়ে তিনি তাঁকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। আপন মনের সকল মাধুরী ঢেলে দিয়ে নিখুঁতভাবে তৈরী করতে লাগলেন তাঁর কামনার বস্তু। সুনিপুণ শিল্পীর তুলির স্পর্শে চিত্রিত হতে লাগল একটি হৃদয়রাজ্য- আল্লাহ-রাসূলের প্রেমসিক্ত একটি কুঞ্জ-কানন। দিন যায় মুর্শিদের তাওয়াজ্জু'র বরকতে শিষ্যের ভিতরে বাহিরে শুরু হলো এক আমূল পরিবর্তন। নিজের কাছেই নিজেকে নতুন মনে হলো- বার বার বুঝি ভুল হলো- 'আমি কি সেই আমি?' তিনি যেন নিজেকে পরখ করে দেখতে চান, বুঝতে চান নিজেকে। বার বার মনে হলো ছারছীনার সেই 'নেছারুদ্দীন' কোথায় কিভাবে হারিয়ে গেলো? ফুরফুরার সোনার কাঠির স্পর্শে যে যুবকের আবির্ভাব এ ত সে নয়, দু'এর মাঝে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শত আবেগ, শত বিস্ময় তার মনে। বার বার কেবলই প্রশ্ন জাগে- নতুন করে চোখের এই দৃষ্টি, কানের এই শ্রবণ, অন্তরের এই উপলব্ধি কোথায় তিনি পেলেন? এগুলোর মাঝে এই যে প্রখরতা, এই যে বিশাল ব্যাপ্তি, নতুন করে কে ঢেলে দিয়েছে? পৃথিবী তাঁর কাছে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল। ঐযে দিগন্ত-বি তৃত মাঠ, উন্মুক্ত আকাশ, 'বনানীর পত্রমর্মর, গিরি-নির্ঝরের কুল্‌কুল্ ধ্বনি, কুসুমের øিগ্ধ হাসি, বিহঙ্গের কলগীতি, চন্দ্র-সূর্যের পদচারণা, আলো-বাতাসের লুকোচুরি'- সবকিছুর মাঝেই তিনি যেন প্রত্যক্ষ করেন অসীমের স্পর্শ। কানের অতি সন্নিকটে ফিসফিসিয়ে কে যেন বার বার বলে যায়- "তুমি যেদিকে তাকাও, তাঁর নিদর্শন দেখতে পাবে" (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)।

'ছালেক' নেছারুদ্দীন (রঃ) ভাবেন আর তন্ময় হয়ে পড়েন। যতই ধ্যান করেন ততই যেন তাঁর জ্ঞান বাড়ে। সকল সৃষ্টির মাঝে যে বিরাট এক ঐক্য রয়েছে, বহুর মাঝে এক এর যে প্রতিফলন ঘটেছে, এটি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন। যে বিশ্ব প্রকৃতিকে এতদিন মূক, বধির বলে মনে হতো, আজ তিনি অনুভব করেন সেখানেও একটি জগৎ রয়েছে, সেখানেও অনুভূতি আছে, কথা আছে। সেই জগতের সাথে তাঁর যেন একাত্মতা ঘটে। সেখানে সকলের গোপন কথা তিনি শুনতে পান। তিনি কান পেতে শুনেন আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি উপলব্ধি করেন পাহাড়ে-পর্বতে, বনরাজিতে, প্রকৃতির যে কোন স্থানে যে কোন কথা উচ্চারিত হচ্ছে- সবকটির লক্ষ্য, পরিণতি একই দিকে; বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ছন্দে প্রকৃতির বুকে প্রতিনিয়তই যে অসংখ্য শব্দ উত্থিত হচ্ছে- সবার গন্তব্য স্থান সেই একই ঊর্ধ্বলোকে; সকল শব্দই সৃষ্টির জয়গান, সেই মহান স্রষ্টার তরে। তাঁর মনের কোণে কেবলই উচ্চারিত হতে লাগল, অনুভূতির রাজ্যে কেবলই দোল খেতে লাগল-

"আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আলাহর জিকির করছে"

(সূরা হাদীদ ঃ ১)।

"নদ-নদী পর্বতাদি বৃক্ষলতা যত,
সকলে আলাহর নাম জপে অবিরত,
স্বাভাবিক শব্দ যত পাই শুনিবার,
আর কিছু নহে উহা জিকির আলা'র।
ঝিঝি পোকা সর্বদা ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
ঝর ঝর নড়ে বৃক্ষ অতি মৃদুস্বরে।
ঝিম ঝিম করে গিরি শুনিতে মধুর,
আর কিছু নহে উহা জিকিরে গফুর।"

কামেল মুর্শিদ শত আশীর্বাদ আর শত শুভেচ্ছা দিয়ে প্রিয় ভক্তকে পথে নামিয়ে মনে মনে হাসেন আর তৃপ্তি লাভ করেন। 'ছালেক' চলেছে মহাসন্ধানের পথে মহাপ্রাপ্তির পথে, এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলে। ধীরে ধীরে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হতে লাগল, জীবনের লক্ষ্য পরিষ্কার হয়ে এলো। উপলব্ধির এমনি এক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে মনের শত আবেগ আর ভক্তি নিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন- "হে আমার প্রভু! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনাই"।

এইভাবে কামেল মুর্শিদ নেছারুদ্দীন (রঃ) কে নিয়ে চললেন জ্ঞানের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে- 'ইলমুল একীন' থেকে 'আইনুল একীন', হক্কুল একীন- এর পথে। অতি সংগোপনে আপন শিষ্যকে পৌঁছে দিলেন তরীকার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে- 'ফানা ফিশ্শায়েখ' থেকে 'ফানা ফিররাসূল', সেখান থেকে 'ফানাফিল্লাহর সেই সর্বোচ্চ মাকামে। মুর্শিদ আশ্বস্ত হলেন, শিষ্যের যোগ্যতা আর কামালিয়াতের উপর এলো তাঁর পূর্ণ আস্থা। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন হেদায়েতের যে শিশু বৃক্ষটি একদিন তিনি রোপন করেছিলেন তাঁরই যত্নে সকল ঝড়-ঝাপটা, আপদ-বিপদ উপেক্ষা করে সেটি আজ মহা সমারোহে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, পূর্ণতায় পৌঁছেছে, পত্র-পুষ্পে সে আজ সুশোভিত, ফলের গন্ধে আর ফুলের সুবাসে চারিদিক মুখরিত। অন্তরচক্ষু দিয়ে তিনি দেখলেন- মানুষ দুহাত ভরে পরম আগ্রহে আহরণ করছে গাছের সেই সুমিষ্ট ফল। হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) ডাকলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে, ব্যক্ত করলেন মনের অভিলাষঃ 'তোমাকে সনদ দেয়া হলো। মানুষকে হেদায়েত করবে।' মুর্শিদের মুখে এ কথা শুনে শিষ্য অভিভূত হয়ে গেলেন। আনন্দ আর শংকায় তাঁর মন ভরে গেল। প্রাপ্তির আনন্দের পাশাপাশি অর্পিত গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হবে কিনা এ সংশয় তাঁর মনকে অধিকতর চঞ্চল করে তুলল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সমাজের অবস্থা, কী করুণ! কী ভয়াবহ! দেখলেন- গোটা সমাজ অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর নানাবিধ অনৈসলামিক আচারে পরিপূর্ণ। এহেন ঘুনে ধরা সমাজকে সংগঠিত করে পথ দেখানো তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব? অথচ মুর্শিদের হুকুম। বাকরুদ্ধ অবস্থায় মাথা নিচু করে মুর্শিদের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। দূরদর্শী মুরশীদে কামেল শিষ্যের মনের অবস্থা সহজেই অনুধাবন করলেন। প্রিয় শিষ্যকে কাছে টেনে সহাস্য বদনে বললেনঃ "আমি বলে দিলাম এটিই যথেষ্ট"। কথা নয়, যেন যাদুর পরশ। এক নিমেষে তাঁর মন থেকে সকল সংশয় আর দুর্বলতা কোথায় যেন দূরীভূত হলো। অন্তর ভরে গেলো গভীর বিশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয়ে। বার বার মনে হতে লাগল- তাঁর ত ভয়ের কিছু নেই। তিনি ত উপলক্ষ মাত্র, হুকুম পালনকারী। পিছনে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পীর মুজাদ্দিদে যমান। বিরাট এক শক্তি, এক অদম্য কর্মপ্রেরণা তিনি অনুভব করলেন অন্তরের মণিকোঠায়। কল্পনায় তিনি দেখতে পেলেন অনাগত কালের একটি আলো ঝলমল সমাজ। মুর্শিদের দেয়া পতাকা উঁচু করে তিনি চলেছেন অগ্রভাগে, পিছনে এক বিরাট কাফেলা। শতকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছেঃ "সত্য এসেছে, বাতেল বিদূরিত হবে" (বনি ইসরাঈল ঃ ৮১)। এক অনাবিল শান্তি আর তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে উঠে। মহান আলাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পরম শ্রদ্ধার সাথে প্রিয় শিষ্য নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলেন

মুজাদ্দিদে যমান, মুরশীদে কামেল হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর করুণার দান- তাঁর খিলাফতের পবিত্র সনদ।

হেদায়েতের ঊষা-আলো - দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল

স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে পীর ছাহেব কেবলা মক্কা শরীফ থেকে দেশে ফিরে এলেন। এর কিছুদিন পর তিনি পুনরায় বিয়ে করেন ফরিদপুর জিলার কুশলা গ্রামে। ঐ এলাকার চৌধুরী পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। ঐ বংশের চৌধুরী আবদুল ওয়াফী ছাহেবের কনিষ্ঠা কন্যার সাথে তাঁর শুভ পরিণয় ঘটে। পীর ছাহেব কেবলার মত একজন ভদ্র আলেম ও অলী আলাহ জামাতা হিসেবে পেয়ে চৌধুরী ছাহেব অতিশয় আনন্দিত হলেন।

এই সময় পীর ছাহেব কেবলার আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিলনা। তাই মনে মনে স্থির করলেন তাকে একটা চাকুরী নিতে হবে, যাতে করে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চালানো যায়। তাই আপন মুর্শিদের কাছে তিনি একবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রার (কাজী) হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু মুজাদ্দিদে যমান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর মনে তখন বিরাজ করছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ভক্তের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে এক বিরাট সম্ভাবনা- হেদায়েতের একটি জ্যোতির্ময় নূর, যার আলোকচ্ছটা চারদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে আঁধারে পতিত একটি ঘুমন্ত জাতিকে প্রাণের স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে তুলবে। স্থবিরতা দূর করে তাকে গতিশীল করবে, আলাহ-রাসূলের ভুলে যাওয়া পথ নতুন করে দেখিয়ে দিবে। জাতির জন্য আগামী দিনের এক দুর্লভ দিশারী হিসেবে যাকে তিনি চিহ্নিত করে রেখেছেন, তাঁর বিরল প্রতিভা খণ্ডিতভাবে বিকশিত হোক, তাঁর দ্বারা জাতির ঈপ্সিত খেদমত বিন্দুমাত্র ব্যাহত হোক এটি ত কিছুতেই হতে পারেনা। তাই ভক্তের আবেদন তাঁর কাছে গৃহীত হ'লনা। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হল, "চাকুরীর চাইতে হেদায়েত উত্তম কাজ"। মুর্শিদের কথার তাৎপর্য অনুধাবন করতে ভক্তের কিছুমাত্র বিলম্ব হ'লনা। নিমেষের মধ্যে সকল দ্বিধা-দ্ব›েদ্বর অবসান হল। বুঝে নিলেন মুর্শিদের অভিপ্রায়, স্থির হয়ে গেলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তিনি সকল কিছু পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর জীবনে এমন অনেক সময় তাঁকে কাটাতে হয়েছে যখন ঘরে কোন খাবার ছিলনা, চরম অভাব অনটনের মাঝে তাঁর দিন যেত। কিন্তু সেদিকে তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশমত মানুষকে হেদায়েত করার কাজে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

পীর ছাহেব কেবলা প্রথমে নিকটবর্তী অঞ্চলে তাঁর তাবলীগী ছফর সীমাবদ্ধ রাখেন। তখনকার সময়ে এতদঞ্চলে কদাচিৎ দু'চারজন আলেম বিদেশ থেকে এসে মানুষের মাঝে ওয়াজ-নসীহত করে যেতেন। জৌনপুর এবং বাহাদুরপুরের পীর ছাহেবগণই মূলতঃ বছরে একবার করে এসে বিভিন্ন জায়গায় সভা করে মানুষের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে রাখার প্রয়াস পেতেন। কিন্তু এতে স্থায়ীভাবে কোন ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠেনি। এমন ঘটনা মোটেই বিরল ছিলনা, যখন দূর পাড়াগাঁয়ে কোন লোক মারা যেত তখন তার জানাযা পড়ার জন্য মৌলভী মুন্সীর অভাব হত। সমাজের এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন তরুণ হাদী হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)।

পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর হেদায়াতী ছফর কেবলমাত্র ওয়াজ-নছীহতের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছফরে গিয়ে সমাজের সমস্যাদির সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হতেন এবং সেগুলোর বাস্তব সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতেন। বেনামাজীদের নামাজ পড়ার শুধু উপদেশই দেননি, কীভাবে নামাজ পড়তে হয় তার প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা তিনি করতেন। এতে বহু লোক শরীক হত। যৌতুক থেকে শুধু তওবা পড়ায়েই ক্ষান্ত হতেন না, বিষয়টি নিষ্পত্তি করে তিনি বাড়ি ফিরতেন। সুদখোরদের সুদ না লওয়ার ওয়াদা নিয়েই তিনি তাদেরকে রেহাই দেননি, সুদ গ্রহীতাকে সুদী-দলীল ফেরত দিতে বাধ্য করতেন। ধূমপানে নিরুৎসাহ করেই তিনি ওয়াজ

শেষ করেন নি, হুক্কা ভেঙে ফেলার বহু দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন। এমনিভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সব গলৎ প্রবেশ করে ইসলামের বুনিয়াদ পর্যন্ত ধ্বংস করার উপক্রম করেছিল সেগুলো একটি একটি করে নিজ হাতে শোধরানোর প্রচেষ্টা চালালেন। অতি অল্পদিনের মাঝেই সমাজের উপর তাঁর প্রভাব এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল, ভাবতেই অবাক লাগে। দিকে দিকে কিসের যেন এক সাড়া পড়ে গেলো। যে কেউ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করত, সমাজের লোকেরা সমবেত হয়ে তার বিরুদ্ধে পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করত। তিনি সবকিছু শুনে অপরাধ অনুযায়ী বিচার করতেন, সকলেই এক বাক্যে তাঁর রায় মেনে নিত। বেনামাজী, সুদখোর, বাদক, গায়ক, গান শ্রবণকারী, মেলায় যোগদানকারী, নৌকা-বাইচ ও ঘোড়দৌড় আয়োজনকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে প্রায়ই শরীয়তের মামলা আসত। পীর ছাহেব কেবলা কাউকে তওবা পড়াতেন, কাউকে জুতাপেটা করতেন, কাউকে বা সমাজচ্যুত করতেন। মোট কথা, তাঁর সামনে যেন এক বিরাট আদালত বসে যেতো। তিনি দরখস্ত গ্রহণ করতেন, সমন জারী করতেন এবং সূ[২] ও নিরপেক্ষ রায় প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতেন।
এমনিভাবে দিন দিন সমাজে পীর ছাহেব কেবলার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি পেল যে, তিনি কোন এলাকায় উপস্থিত হয়েছেন একথা জানলেই বেনামাজী, গান বাজনাকারী প্রভৃতি শরীয়ত-অমান্যকারী দূরে পালিয়ে যেতো। তাদের ভয় হত পীর ছাহেব কেবলার সামনে তাদেরকে হাজির করলে হয়ত জন-সমক্ষে জুতা পেটা খেতে হবে অথবা সমাজচ্যুত হতে হবে। গোপনে গোপনে তারা পীর ছাহেব কেবলার কাছে হাজির হত, তওবা করত এবং ভবিষ্যতে ভালোভাবে চলার ওয়াদা করে বিদায় নিত। পীর ছাহেব কেবলার অমায়িক ব্যবহারে তারা মুগ্ধ হয়ে যেতো।

ধীরে ধীরে পীর ছাহেব কেবলার গুণাবলী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গোটা সমাজ অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল- কী হল? এতদিন এই 'পাগল' মানুষগুলো ছিল কোথায়? কিসের আকর্ষণে তারা ছুটে আসছে? কোন্ ফুলের সুবাস পেয়ে অগণিত মৌমাছির দল চারদিকে এই গুঞ্জরন শুরু করে দিল? মনে হয় একটি প্রবাহ বুঝি এতদিন কোন বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, আজ মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার আনন্দে দুর্বার গতিতে বইতে শুরু করেছে। তরুণ বয়স, অথচ যেখানেই যান সেখানেই মানুষের ঢল। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেম-ওলামা পর্যন্ত তাঁর কাছে আসতেন। তাঁর সামান্য খেদমত করাকেই তারা সৌভাগ্য মনে করত। এত লোকের সমাগম, মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন হত। কেউ বা আসত শুধু একপলক দেখার জন্য, কেউ দোয়া নিতে, কেউ মুরীদ হতে, কেউবা তওবা পড়তে, কেউবা কোন বিচার-প্রার্থনা জানাতে। সে এক অবাক কাণ্ড। সমাজে পীর ছাহেব কেবলার সেই উন্নত ভাবমূর্তি অগণিত মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছেলছেলার ঊর্ধ্বতন কৃীত-সন্তান শহীদে বালাকোট হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরলবী (রঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ডঃ ডব্লিও হান্টার তার "Indian Musalmans" গ্রন্থে হযরত বেরলবী (রঃ)-এর কার্যকলাপ আলোচনা করেছেন। যদিও তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করাই হান্টার সাহেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তিনিও সকল সত্য চাপা দিতে পারেননি। সমাজে বেরলবী (রঃ)-এর প্রভাব সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ সাইয়্যেদ ছাহেবের মুরীদগণ তাঁর আধ্যাত্মিক কামালিয়াত সম্পর্কে পূর্ণভাবে জ্ঞাত থাকায় তাঁর সামান্যতম খেদমত করাকেও তারা সৌভাগ্য মনে করতেন। সম্ভ্রান্ত আলেমগণ পর্যন্ত তাঁর পেছনে খালি পায়ে চলাকে গৌরব মনে করতেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হলে লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, হাতে হাতে 'বয়াত' করাই দুরূহ হয়ে পড়েছিল। তিনি অবশেষে নিজের পাগড়ী খুলে দিয়ে ঘোষণা করলেন, যে কেউ পাগড়ীতে হাত লাগাবে সেই তাঁর মুরীদ বলে গণ্য হবে।

পীর ছাহেব কেবলার বিচারের রায়ে সমাজে কিরূপ প্রভাব পড়ত সেটি বুঝানোর জন্য নিম্নে দু'একটি ঘটনার উলেখ করা হলোঃ

একবার বরিশালের মঠবাড়িয়ার এলাকার একজন ধনী মাতবরের বাড়িতে পীর ছাহেব কেবলা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। হুজুর কেবলা ছোটবেলা থেকেই সুদখোর, ঘুষখোর, বেনামাজী ইত্যাদির বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করেননি। উক্ত মাতবরের বাড়িতে হাজির হলে একজন লোক এসে তাকে বলল "হুজুর, এই মাতবর ছাহেব আমার নিকট সুদে টাকা লগ্নি করেছে"। একথা শুনামাত্র পীর ছাহেব কেবলা মাতবর ছাহেবকে ডেকে বললেন, "আপনি সুদ নেওয়া হতে বিরত না হলে আপনার এখানে আমাদের খাওয়া সম্ভব নয়"। মাতবর মৌখিকভাবে সুদ পরিত্যাগ করার ওয়াদা করল। পীর ছাহেব কেবলা বললেন, "হিসাব করে সমুদয় টাকা আমার নিকট আমানত না রাখলে আমি নিজেও খেতে পারি না, অন্যকেও খেতে আদেশ দিতে পারিনা"। মাতবর ছাহেব তাড়াতাড়ি দুইশত টাকা এনে জমা দিল। যথারীতি খাওয়া শুরু হল। খাওয়ানোর মাঝখানে হঠাৎ মাতবর ছাহেবের মত ঘুরে গেল। সে পীর ছাহেব কেবলার কাছে এসে টাকা ফেরৎ চাইল। পীর ছাহেব কেবলা বললেন, কেন এ সবই ত খাতকের টাকা, তাদেরকে ডেকে ফেরত দিতে হবে। মাতবর ছাহেব এতে আপত্তি জানাল। পীর ছাহেব কেবলা বললেন- "আপনি শরীয়ত মানেন কিনা?" সে উত্তরে বলল, "না, আমি মানিনা"। পীর ছাহেব কেবলা একখন্ড কাগজ দিয়ে বললেন- "আপনি শরীয়ত মানেন না- এই মর্মে দস্তখত দিন"। মূর্খ দাম্ভিক মাতবর অমনি দস্তখত করে দিল। পীর ছাহেব কেবলা তখন সজোরে টাকাগুলো মাটিতে ফেলে দিলেন এবং দাঁড়িয়ে মাতবরকে এমনিভাবে লাথি মারলেন যে, সে মাটিতে পড়ে গেলো। তিনি মাতবরকে "মরদুদ, বেঈমান" ইত্যাদি ভর্ৎসনামূলক শব্দ উচ্চারণ করতে করতে সেখান থেকে চলে গেলেন। সাথে সাথে সকলেই উঠে গেল। মাতবর ছাহেবের সকল আয়োজন পণ্ড হলো।

পীর ছাহেব কেবলা ফতওয়া দিলেন- "শরীয়ত না মানার দরুন মাতবর ছাহেব শরীয়তদ্রোহী হিসাবে গণ্য। তাই তার বিয়ে বাতিল হয়ে গেছে। তার সাথে সকল প্রকার আদান প্রদান, খাওয়া দাওয়া, উঠা-বসা, এমনকি সালাম দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করতে হবে।" এই ফতওয়া দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। মাতবর ছাহেব মহা বিপদে পড়ল। সমাজের সকল স্তরের মানুষ উক্ত ফতওয়া অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলল। এমনকি মাতবর ছাহেব চুল কাটার জন্য একদিন এক হিন্দু নাপিতকে ডাকলে সেও উত্তর দিল, "বড়মিয়া, আমার পক্ষে আপনার কোন কাজ করা সম্ভব নয়। আমাকে মাফ করুন। আপনার চুল কাটলে সমাজের লোকে আমাকেও সমাজচ্যুত করবে।"
এদিকে মাতবর ছাহেব পীর ছাহেব কেবলার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করল। কিন্তু কোন ফল হল না। সে তখন চারজন নামকরা মাওলানা আনাল। মাতবর ছাহেব তাদেরকে টাকা দিয়ে এই মর্মে আর একটি ফতওয়া করাল যে, "মাতবর ছাহেব যা বলেছেন- তাতে তাকে শরীয়তদ্রোহী বলা চলে না। তার বিয়েও নষ্ট হয়নি এবং তাকে সমাজচ্যুত করা মোটেই সমীচীন নয়"। পীর ছাহেব কেবলার নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি লোক পাঠিয়ে মাওলানা সাহেবদেরকে সেখানে আটকে রাখলেন এবং নিজে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে 'বাহাছ' করলেন। এতে মাওলানা ছাহেবগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন এবং পীর ছাহেব কেবলা যে ফতওয়া দিয়েছিলেন তাতে তারাও দস্তখত করে দিলেন। এই ফতওয়া পুনরায় প্রচারিত হল। মাতবর ছাহেবের অবস্থা পূর্বের চাইতে আরও অধিক সংকটময় হয়ে পড়ল।

সুদখোর মহাজন শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে গেলো। সে তরুণ বয়সী পীরের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখে জব্দ হয়ে তাঁর কাছে এসে অত্যন্ত নম্রভাবে নিবেদন করল- "হুজুর, আপনি সার্থক পীর, আপনি বয়সে আমার নাতী সমতুল্য; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার হাতে হাত রেখে তওবা করছি।" পীর ছাহেব কেবলা তখন সুদী টাকা ফেরত দিয়ে তাকে তওবা করালেন, বিয়ে দোহরায়ে দিলেন এবং তার উপর সমাজচ্যুত হওয়ার আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। মহাজন আবার আগের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করার সুযোগ পেলো।

পরবর্তীতে গরীব জনসাধারণকে সুদী-ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য শেরে বাংলা এ,

কে ফজলুল হক ঋণ-সালিশী বোর্ড গঠন করেছিলেন। অথচ তাঁর বহু পূর্বেই এই শোষণ-নির্যাতন বন্ধের জন্য পীর ছাহেব কেবলা সমাজে কী বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলশ্র"তিতে শতশত ঋণগ্রস্ত খাতক শুধু সুদের অর্থ প্রদান হতেই মুক্ত হয় নাই, বরং অনেক ক্ষেত্রে আসল ঋণের টাকা ফেরত দেয়া থেকেও মার্জনা লাভ করেছে এবং মর্টগেজ দেয়া জমি খাতকরা টাকা না দিয়েই ফেরত পেয়েছে। এইভাবে হুজুর কেবলা ঋণভারে বিপর্যস্ত গরীব জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেন সেগুলো ১৪০০ বছর আগে সমাজে অর্থগৃধ্নু শোষকের বিরুদ্ধে হুজুর (দঃ)-এর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়।

বিচারের আর একটি ছোট্ট ঘটনাঃ

এক ব্যক্তি তার মাকে প্রহার করেছিল। পীর ছাহেব কেবলার কাছে এ বিষয়ে নালিশ আসলে তিনি সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করলেন। অতঃপর আসামীকে তাঁর সামনে আনা হলে তিনি সঙ্গীয় পেয়াদাকে প্রহার করার হুকুম দিলেন। প্রহারে উক্ত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পরে আবার যখন সুস্থ হল পীর ছাহেব কেবলা তাকে পুনরায় প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "এমন লোককে মারতে তোমাদের বাঁধে কেন? জোরে প্রহার কর"। অতঃপর প্রহারের পর প্রহার চলল। তিনি প্রতিবারই "জোরে, জোরে, আরও জোরে" বলে প্রহারকারীকে উত্তেজিত করছিলেন। এ অবস্থা দেখে মায়ের মন স্বভাবতঃই নরম হয়ে গেল। সে তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পীর ছাহেব কেবলাকে অনুরোধ জানাল। পীর ছাহেব কেবলা বললেন, "মা ক্ষমা না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না"। অতঃপর তার মা তাকে ক্ষমা করলে পীর ছাহেব কেবলা তাকে অব্যাহতি দিলেন।

পীর ছাহেব কেবলার সূ² ও নিরপেক্ষ বিচার মীমাংসার কথা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি স্থানীয় মহকুমা-হাকিমের কর্ণগোচর হল। পিরোজপুরের এস, ডি, ও সাহেব পীর ছাহেব কেবলার কতগুলো রায় ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। সেই সব বিচার মীমাংসায় পীর ছাহেব কেবলার বিচক্ষণতা দেখে এস, ডি, ও সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এসব বিষয়ে পীর ছাহেব কেবলার উপর তার পূর্ণ আস্থা জন্মালো। এরপর থেকে এস.ডি.ও.ছাহেব অনেক সময়ই সমাজের বহু বিচার মীমাংসার রায় প্রদানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে পীর ছাহেব কেবলাকে অনুরোধ করতেন। তিনি সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।
ভাবতে বিস্ময় লাগে, বৃটিশ আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষা সরকারকর্তৃক উপেক্ষিত, মাওলানা, মুন্সী ছাহেবগণ সমাজে অনাদৃত এবং অবহেলিত, সে সময় সরকারের কাছে দাখিলকৃত মামলা-মোকাদ্দমা মীমাংসার জন্য স্বয়ং এস, ডি, ও ছাহেব বিনা দ্বিধায় পীর ছাহেব কেবলার মত একজন অল্প বয়স্ক ধর্মীয় আলেমের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এটি নিঃসন্দেহে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে পীর ছাহেব কেবলার বিচক্ষণতা, তাঁর প্রতি সরকারের অগাধ শ্রদ্ধা ও পূর্ণ আস্থা এবং সমাজের উপর তাঁর বিশাল প্রভাবেরই এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

পরবর্তীকালে পীর ছাহেব কেবলা সমাজের খেদমতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। তখন স্বাভাবিকভাবেই বিচার মীমাংসার কাজে তত বেশি সময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা । তাই এক সময় এস, ডি, ও কর্তৃক পাঠানো অনেকগুলো বিচারের কাজ তিনি ওজরবশতঃ ফেরত দিয়েছিলেন। এতে এস, ডি, ও সাহেব নিজেই পীর ছাহেব কেবলার দরবারে হাজির হন। পীর ছাহেব কেবলা তখন তাকে অত্যন্ত মধুর ব্যবহার দেখিয়ে সব কিছু ব্যক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এ ব্যাপারে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিলে তাঁর দ্বারা সমাজের অন্যান্য অধিকতর প্রয়োজনীয় খেদমত ব্যাহত হবে।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটি কথা অবশ্যই বলা চলে। এই তরুণ বয়সেই পীর ছাহেব কেবলার বিচার-আচার, তাবলীগের ব্যতিক্রমধর্মী ধারা সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং মানুষের অন্তরে তাঁকে যেভাবে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেটিই পরবর্তীতে তাঁর বহুমুখী আন্দোলনের পথকে অধিকতর সুগম করে দিয়েছিল।

মাদরাসা
সুন্নতে নববীর আদর্শ মারকাজ

বাঙালী মুসলমানদের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে ইসলামী পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা জীবনভর যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তারই এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর হল ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা। এটি তাঁর জীবন-সাধনার এক বিরাট কুতুব-মিনার, এক জ্বলন্ত কারামত। এই মাদরাসাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে শরীয়ত-মারেফাতে পরিপক্ক আদর্শবান একদল হাদী-আলেম তৈরী হবে; তারা এই সমাজকে সত্যিকার ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলবে; আলাহর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে আজীবন অকুতোভয় সংগ্রাম করে যাবে- এই ছিল তাঁর সাধনা। মহামানবের এ স্বপ্ন বিফলে যায়নি। অনেকদিন হ'ল দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু 'দারুচ্ছুন্নাত' নামের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় এই প্রতিষ্ঠান 'ইখলাস'-এর ভিত্তিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে সমাজের বুকে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট- ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা সাধারণ কোন প্রতিষ্ঠান নয়, নবী-আদর্শের মহিমায় আপন ঐশ্বর্যে বলীয়ান সমাজের বুকে এটি এক আদর্শ 'মারকাজ'।

আজ সমাজে মূল্যবোধের যে চরম অবক্ষয় শুরু হয়েছে তা থেকে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোও মুক্ত নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড় হিসেবে কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়- প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র সংগঠন রয়েছে। তাদের মাধ্যমে আদর্শবর্জিত রুচিহীন রাজনীতির কুফল কিভাবে গোটা শিক্ষা পরিবেশকে কলুষিত করছে, ছাত্র-ছাত্রীদের অমূল্য শিক্ষাজীবনকে বিপিন্ন করছে, তা সকলেরই জানা। কেউ যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে ছারছীনা মাদরাসা অবলোকন করে, তবে সে সহজেই অনুধাবন করবে দেশের এই ভয়াবহতার মাঝেও নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরাট ব্যতিক্রম। সকল বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে এই প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে এতদিন ধরে তার আদর্শকে অটুট, অক্ষুণœ রেখেছে ভাবতে বিস্ময় লাগে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সীরাত-সূরত, চাল-চলন, মন-মানসিকতা, তাদের মাঝে বিরাজমান সম্পর্ক- সব কিছু মিলে সেখানে ব্যতিক্রমধর্মী যে নির্মল পরিবেশ বিরাজমান তা যে কোন লোককে মুগ্ধ না করে পারে না।

মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সজাগ, ছাত্ররা যেন আদর্শবিচ্যুত না হয়। তারা যেন সমাজসচেতন, সৃজনশীল, স্বাবলম্বী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে- এজন্য পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি পাঠ্যবহির্ভূত বিভিন্ন কর্মসূচীতে তাদের অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানেও ছাত্র সংগঠন রয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। ধর্মের আঙ্গিকে কিভাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে এবং আধুনিক বিশ্বে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে ও টিকিয়ে রাখতে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কিভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে সেটির প্রশিক্ষণ দানই এই সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মাদরাসা থেকে পাশ করে একদিকে কিছু সংখ্যক ছাত্র যেমন মাদরাসায় শিক্ষকতা, ওয়াজ-নসীহত, মসজিদের ইমামতি ইত্যাদি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে প্রত্যক্ষ দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত থাকেন, অপরদিকে তেমনি অনেকে সরকারী- বেসরকারী সংস্থায় প্রশাসনিক দায়িত্ব, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

ছারছীনা মাদরাসার এই বৈশিষ্ট্য হঠাৎ করে গড়ে উঠেনি। এর পেছনে রয়েছে বহু নিবেদিতপ্রাণের বহু বছরের ত্যাগ, শ্রম ও সাধনা। সেই ইতিহাস কতই না রোমাঞ্চকর! যে স্থানটি একদিন পূজা-পার্বণে মুখরিত থাকতো, যেখানে আলাহ-রাসূলের কথা বলার লোক

ছিলনা, সেখানেই আজ গড়ে উঠেছে এক বিশাল প্রতিষ্ঠান, কুরআন-হাদীস গবেষণা-চর্চার এক সুবৃহৎ 'সেন্টার'- যেখান থেকে ইসলামের এক অনির্বাণ শিখা চারদিক আলো বিচ্ছুরিত করে সমাজে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখার পথ সুগম করে দিয়েছে। আলাহর কী অপার মহিমা!

এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত তহবীল প্রতিষ্ঠা

সকলের প্রচেষ্টায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজ বাড়িতে গড়ে তুললেন তাঁর সাধনার কুতুবমিনার- ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা। প্রতি বছর এখান হতে তৈরী হতে লাগল সত্যিকার ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান কিছু সংখ্যক হাদী। তাঁরা ছড়িয়ে পড়তে লাগল অশিক্ষা-কুশিক্ষায় ভরা অন্ধকারময় সমাজের আনাচে কানাচে। বাগে নেছারের সুবাসে ধীরে ধীরে চারিদিক আপ্লুত হতে লাগল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মনে আশার সঞ্চার হলো। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী হাদী। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন, দেশে যদি সত্যিকার ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, দ্বীনী ইনকিলাবের মাধ্যমে সত্যের আলো দিয়ে সমাজকে উদ্ভাসিত করে দিতে হয়, তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অধিক মাদরাসা মক্তব গড়ে তুলতে হবে। তিনি তাঁর এই উপলব্ধি ব্যক্ত করলেন তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে। যেখানেই ওয়াজ নসীহত করতেন সেখানেই তিনি তাঁর উপলব্ধি বাস্তবায়নের জন্য আকুল আহবান জানাতেন। তাঁর সেই আহবান বিফলে যায়নি। অল্পদিনের মধ্যেই সমাজের বুকে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে স্বতঃস্ফ,র্তভাবে মানুষ এগিয়ে এলো, ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো শত শত মক্তব-মাদরাসা।

দেশময় দ্বীনী শিক্ষার এক গুঞ্জরণ শুরু হলো। সময় গড়িয়ে গেলো। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাবলীগী ছফরে বের হন, ওয়াজ-নসীহত করেন আর বিভিন্ন মাদরাসাসমূহে পাঠদানের গুণগত মান পরীক্ষা করেন। তিনি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করলেন আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন গ্রাম্য মাদরাসাসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছেনা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে এই সব প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। দরিদ্র অসহায় মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের এই বিরাট অন্তরায় তাঁর মনকে সারাক্ষণ পীড়া দিতে লাগল। তিনি ভাবেন আর ভাবেন। কখনও গভীর আক্ষেপের সাথে তিনি বলতেন- "আল্লাহ আমাকে যদি এমন তৌফিক দিতেন যাতে সব মাদরাসাগুলো নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারতাম।" অনেক চিন্তা ভাবনার পর মরহুম পীর ছাহেব কেবলা স্থির করলেন- এ কাজের জন্য অবশ্যই একটি শক্তিশালী তহবিল গঠন করতে হবে। যেই চিন্তা, সেই কাজ। কোন এক ছফরে তার সঙ্গীয় লোকদের ডেকে বললেন, "ধরো, এই নাও, এই থলিয়ায় এক হাজার বিশ টাকা আছে। এ দ্বারা একটি তহবিলের বুনিয়াদ করো। মাদরাসাসমূহকে সুন্নাত তরীকার আদর্শে গঠন করার জন্য টাকা দিলাম। সেই উদ্দেশ্যে এই টাকা কিভাবে কাজে লাগানো যায় চিন্তা করো।" সেইদিনই একটি তহবিল গঠন করা হলো- নাম হলো "এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত তহবিল"। সঙ্গীদের অনেকের মনেই সেদিন স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন উঠেছিল এই তহবিলের অর্থ সংগ্রহ হবে কিভাবে? তবে এই বিরাট সমস্যা সমাধানে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজেই ত্যাগের এক চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে জনসাধারণ যে সকল গরু, বকরী এবং ছদকা, হাদিয়া প্রদান করত তার অধিকাংশই নিজের জন্য ভোগ না করে তিনি এই তহবিলে জমা দিতেন। সুবহানালাহ! ত্যাগের মহিমায় যার অন্তরকে আলাহ সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই এমনি উদারতা প্রদর্শন সম্ভব। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয়েছিল।

শিয়ালকাঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান মৌলভী আবুল হোসেন সাহেব মরহুম পীর ছাহেব কেবলার একজন নাতি। শোনা যায় তিনি যখন ছোট তখন একদিন মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে জনসাধারণ কর্তৃক হাদিয়া হিসেবে দেয়া চারটি ছাগল তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য নিতে চাইলে হুজুর কেবলা তাকে নিষেধ করেন। কিন্তু আবুল হোসেন সাহেব নানার কাছ থেকে

ছাগল চারটি নেয়ার ব্যাপারে জেদ ধরলেন। শেষ পর্যন্ত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নাতির সেই আবদার উপেক্ষা করতে পারেননি। অনিচ্ছা সত্তে¡ও ছাগলগুলো তিনি আবুল হোসেন সাহেবকে দিয়েছিলেন বটে, তবে সেগুলোর দাম ধরে সমুদয় টাকা তিনি নিজ পকেট থেকে 'এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত' তহবিলে দান করে দিয়েছিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই তহবিলের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলো। এমনকি এটি পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করতে হলো। ছারছীনা মাদরাসার প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য কতিপয় শিক্ষক ও দরবারের বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত বোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হয়। তহবিলের হিসাব-নিকাশ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মরহুম মাওঃ শরীফ আবদুল কাদির ছাহেবকে দেয়া হলো। স্থির হলো, যে সব মাদরাসা সুন্নাত মোতাবেক পরিচালিত হবে, ছাত্র-শিক্ষকগণ তাকওয়া পরহেজগারীর নীতি অনুসরণ করে চলবে এবং পড়াশুনায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করবে, কেবলমাত্র সেই সব মাদরাসাতেই এই তহবিলের টাকা মাসিক বা এককালীন সাহায্য হিসেবে প্রদান করা হবে। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবদ্দশায় প্রায় পঞ্চাশটি মাদরাসা উক্ত তহবিলের সাহায্য লাভ করেছিল।

'এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত তহবিল' গঠনের মধ্য দিয়ে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার চরিত্রের বিশেষ একটি দিক আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সুন্নাতে নববীর পুনরুজ্জীবনে নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। দেশে সত্যিকার শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে এক দ্বীনী ইনকিলার সৃষ্টির জন্য তাঁর যে নিরলস প্রচেষ্টা তার তুলনা নেই। তখনকার দিনে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মত একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব এদেশের মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন দিকে কতদূর এগিয়ে নিয়েছিল তা মূল্যায়নের দাবী রাখে বৈকি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় - ছারছীনা মাদরাসা এবং তার অনুকরণে শত শত মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা, 'এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত তহবিল' গঠন- ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল। বাস্তবিকই মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ছিলেন একজন সত্যিকারের মুহিয়্যে সুন্নাত।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বিশ্বাস করতেন ইলম ও আমলে পারদর্শী, চরিত্রবান, রাসূলে পাক (দঃ)-এর রঙ্গে রঙ্গীন তাঁর একদল খাঁটি উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করাই মাদরাসার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই মাদরাসার ছাত্রদেরকে সেভাবে তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদান করার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। আজ দেশে গোটা মাদরাসা শিক্ষা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে দোল খাচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষার নামে দেশে আজ প্রহসন চলছে। মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের নামে সরকার কর্তৃক যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে সত্যিকার আলেম তৈরী হওয়ার সুযোগ কতটুকু সেটি নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সঠিক পাঠদান, ছাত্রদের আকীদা, চরিত্র গঠন ইত্যাদির ব্যাপারে অনেক সময়ই উদাসীন থাকেন। যার ফলে আজ মাদরাসার অনেক ছাত্রকে দেখে ভ্রম হয়- এরা কি রাসূলের (দঃ)-আদর্শে আদর্শবান, না পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিচালিত। অন্যদিকে মাদরাসা পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহে কুরআন হাদীস সম্বলিত দ্বীনী কিতাবসমূহের যেভাবে অবমাননা হচ্ছে তা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে। ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো দেখাতে না পারলে মাদরাসার মঞ্জুরী থাকেনা, তাই ছাত্রদের পাশ করাবার জন্য শিক্ষকগণই ব্যাপকভাবে নকল সরবরাহ করছেন বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ পাওয়া যায়। হায়! যে প্রতিষ্ঠানে খাঁটি নায়েবে নবী তৈরী হওয়ার কথা ছিল, বিভিন্ন দুর্নীতির বেড়াজালে পড়ে সেটি আজ তার আপন পরিচিতি হারাতে বসেছে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ইন্তেকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পীরে মরহুম শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) এই সমস্যা এককভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, জনসভায় বহুবার তুলে ধরেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আলেম সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে সমস্যাটির যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করার তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সমস্যাটি এভাবে ছেড়ে দিলে এটি শুধু তীব্রতরই হবে- মোকাবেলা করা তখন আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সংশ্লিষ্ট সকলেরই বিষয়টি

নিয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। বহুদিন পূর্বে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং সরকার যদি তার সেই আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে আসেন কেবলমাত্র তখনই উদ্‌ভুত সমস্যার সমাধান সম্ভব, অন্যথায় নয়। আলাহ পাক সকলকে সুমতি দিন, মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আদর্শ গ্রহণ করে তারা দেশের মাদরাসাগুলোকে সত্যিকার রাসূলপ্রেমিক আলেম বানানোর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলুক-এই কামনা করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

নির্ভুল শিক্ষানীতিঃ কী সুগভীর প্রজ্ঞা!

মহাপুরুষগণ তাঁদের কীর্তির মাঝে দুনিয়ার বুকে অমর হয়ে থাকেন। এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও তাঁদের প্রভাব সমাজে বিদ্যমান থাকে, মানুষ চিরকাল তাঁদের স্মরণে রাখে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বহুদিন আগে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু সমাজ কল্যাণে বিভিন্নমুখী তাঁর যে সুদূরপ্রসারী অবদান রয়েছে সেগুলোই তাঁকে চিরদিনের জন্য মানুষের অন্তরে স্মরণীয় করে রাখবে। আজও তাঁর স্মৃতি এতটুকু æান হয়নি। সময় যতই গড়িয়ে চলেছে, মানুষ ততই গভীরভাবে উপলব্ধি করছে 'নেছার' নামের তাৎপর্য। তাঁর স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বল আর দীপ্তিমান হয়ে ফুটে উঠছে তাদের অন্তরের মণিকোঠায়।

সমাজে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার অবদানের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে অশিক্ষায় নিমজ্জিত বিধ্বস্ত একটি মুসলিম সমাজ। আপন আদর্শ, ঐতিহ্যবিস্মৃত, বিজাতীয় ভাবধারায় হাবুডুবু দিশেহারা হীনবল একটি জাতি। এদেশে আজ মুসলমানগণ আপন প্রাধান্য বজায় রেখে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। কিন্তু বেশিদিনের কথা নয়, যখন তাদের এ অবস্থা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। সবদিক দিয়ে তারা ছিল পশ্চাদপদ, অবহেলিত। তাদের সেই ভয়াবহ অবস্থা হঠাৎ করে একদিনে বিদূরিত হয়নি। যে সব মহান ব্যক্তি এবং কৃতি সন্তানদের আত্মত্যাগ, অক্লান্ত প্রচেষ্টা আর কঠোর সংগ্রাম সেই ডুবুডুবু মুসলিম সমাজকে চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে তার মাঝে প্রাণের সঞ্চার, গতির উন্মেষ ঘটিয়েছিল ছারছীনার পীর মরহুম হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব (রঃ) তাঁদের অন্যতম। যারা ইতিহাস জানেন তাদের কাছে এ কথাটি নতুন কিছুই নয়। সাধারণভাবে সমাজের মানুষ পীর ছাহেব বলতে যা বুঝে থাকে, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ছিলেন তার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। পূর্বেই উলেখ করেছি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রঃ) উক্তি করেছিলেনঃ আমি নিছক পীর-মুরীদীর জন্য আসি নাই। আমার 'মিশন' এর চাইতে অনেক ঊর্ধ্বে। আলহামদুলিলাহ! তাঁর উক্তির যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছিল পীর ছাহেব কেবলার জীবনে। বৃহত্তর জন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সাধারণতঃ পীর ছাহেবগণ সারাক্ষণ খানকায় অবস্থান করেন এবং শুধুমাত্র অজীফা, দোয়া-কালাম, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কেউ যদি মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে এমনি একজন পীর কল্পনা করে, তবে তার মূল্যায়ন সঠিক হবেনা। আদর্শ সমাজ-সেবক হিসেবে সকল স্তরের মানুষের মাঝে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। বস্তুতঃ এজন্যই তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিদ্যমান রোগ নির্ণয় করে সেটি দূর করার সঠিক পন্থা অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

লেখা-পড়া শেষ করে, আপন মুর্শিদের নির্দেশে যখন তিনি হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন সূ² দৃষ্টি নিয়ে তিনি সমাজের দিকে তাকালেন এবং অনুধাবন করতে চাইলেন মুসলমানদের অবনতির সঠিক কারণ। কিছুদিন গেলেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল-আগাগোড়া ঘুণে ধরা এই সমাজটির সকল পশ্চাদপদতার মূলে রয়েছে একটি মাত্র প্রতিবন্ধকতা এবং সেটি হলো অজ্ঞতা। তিনি বুঝতে পেলেন, অজ্ঞতার কারণেই এই সমাজ হারিয়েছে তার মহান কৃষ্টি, হারিয়েছে তার তাহজীব-তামাদ্দুন এবং এই একই কারণে বৈষয়িক বিষয়েও হীনবল হয়ে এ জাতি আজ মাথা নিচু করে পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি

ভাবেন আর ভাবেন। যার আপাদমস্তক অজ্ঞানতার মাঝে এমনিভাবে নিমজ্জিত, তার মুক্তি কোন পথে? কোন প্রক্রিয়ায়, কিভাবে এই হতভাগ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে তাকে আবার গতিশীল করে তোলা যায়? যতই ভাবেন ততই তিনি বিচলিত হয়ে উঠেন, এক কঠিন সমস্যা তাঁর সামনে। হঠাৎ যেন তার অন্তরচক্ষু খুলে গেল- সমাধান পেলেন তিনি। অনুধাবন করলেন, আল্লাহর দেয়া যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করে ১৪০০ বছর আগে রাসূল (দঃ) একদিন একটি অধঃপতিত, বিভ্রান্ত জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন সেটিইত শিক্ষাদানের একমাত্র নির্ভুল নির্ভেজাল নীতি - মানুষকে সত্যিকার মানুষ করার নীতি। তাঁর কানে ধ্বনিত হল কুরআনের সেই মর্মবাণী ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক, আর তাদের থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করুন- যিনি তাদের সমক্ষে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করিবেন"- (সূরা বাকারা ঃ আয়াত -১২৯)।

উপরের আয়াতে পৃথিবীতে মহানবী (দঃ) এর আগমন এবং তাঁর রেসালতের চারটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে ঃ এক, কুরআন তেলওয়াতের ব্যবস্থা করা; দুই, মহাগ্রন্থ কুরআন শিক্ষা দেয়া; তিন, হিকমত বা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সুন্নাতের শিক্ষাদান; চার, মানুষের চরিত্র সংশোধন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা অনুধাবন করলেন- আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের মাধ্যমে স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা-নীতি এই আয়াতের মধ্যে প্রকাশ করে দিয়েছেন। যে শিক্ষা-নীতির বলে মানুষ জাগতিক আর পারলৌকিক উভয় জ্ঞানের অধিকারী হয়, আল্লাহকে চিনতে পারে, তাঁর বিধানসমূহ অবগত হতে পারে এবং নিজের অন্তরকে পবিত্র করে আলাহর হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে পালন করার সামর্থ অর্জন করে সেটিইত হবে শিক্ষাদানের একমাত্র নীতি। তাই তিনি সমাজকে অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এই শিক্ষা-নীতিই বেছে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ নবীদের ওয়ারিশ হিসেবে হক্কানী ওলামায়ে কেরামদের দায়িত্বই হল হুজুর (দঃ)- এর অনুসৃত শিক্ষানীতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজ বাড়িতে এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের মাধ্যমে দেশের আনাচে কানাচে কেরাত শিখানোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন- হাজার হাজার হাফেজী মাদরাসা গড়েছিলেন। তাঁর এই ব্যবস্থাপনার কারণেই প্রতি বছর বহুসংখ্যক কুরআনে হাফেজ সমাজে বেরিয়ে আসছে।

পবিত্র কুরআনের তা'লীমের জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন চার হাজার মাদরাসা- আলাহর বিধি-নিষেধ, ঈমান-আকীদা, হালাল-হারাম ইত্যাদির সঠিক জ্ঞান শিক্ষাদানই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই সব মাদরাসা থেকে পাশ করা হাজার হাজার আলেম ওলামা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন এবং স্বস্ব পেশায় থেকে নানাভাবে ইসলামের খেদমত করে চলেছেন। বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে রাসূলুলাহ (দঃ) এর সুন্নাত কিভাবে সমাজের বুকে জারী করা যায় সেজন্য তিনি আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ জন্যই দেখা যায় একদিকে তিনি যেমন ইবাদত-বন্দেগী, অজীফা, দোয়া-কালাম রিয়াজত ইত্যাদিতে ছিলেন সকলের ঊর্ধ্বে, তেমনি অপরদিকে ইছলাহে কওম আর ইছলাহে হুকুমতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রাসূলুলাহর নীতি অনুকরণে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। বিভিন্ন কিতাবাদি প্রণয়ন, সংগঠন কায়েম. তাবলীগী সফর এবং ছলফে ছালেহীনদের অনুকরণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মপন্থার মাধ্যমে 'আমর বিল মা'রূফ' এবং 'নেহী আনিল মুনকার'- অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধ এই নীতি, অনুশীলন করে সমাজের সকল স্তরে কিভাবে সুন্নতে নববী প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এটিই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্য ইলমে তাসাওফ তথা আত্মশুদ্ধির তা'লীম প্রচার প্রসারণে তিনি দেশের প্রতিটি অঞ্চলে খানকা স্থাপন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাসাওফের শিক্ষা অনুশীলন করে মানুষের মাঝে তাকওয়া বা আলাহভীতি

জাগ্রত হয়। ফলে শরীয়তের হুকুম আহকাম পুরোপুরিভাবে পালন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়।
স্বচ্ছ এবং উদার মন নিয়ে যে কেহ তাঁর মহান জীবনের দিকে দৃষ্টি দিবে তার পক্ষে অতি সহজেই যে সত্যটি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে সেটি হলো- কুরআনে উলিখিত শিক্ষা নীতির পরিপূর্ণ রূপটি মরহুম পীর ছাহেব শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর হেদায়েতী কর্মকাণ্ডে যত ব্যাপক এবং গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল সেটি খুব কমই দৃষ্ট হয়। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের নায়েবে নবী- ওয়ারেসাতুল আম্বিয়াদের একজন।
পবিত্র কুরআনে উলিখিত শিক্ষা-নীতির উপর একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় এই আয়াতের মধ্য দিয়ে মহান আলাহ তায়ালা মূলতঃ শিক্ষার দুটো শাখা- শরীয়ত ও মা'রেফাত সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। শরীয়ত পুঁথিগত বা বাহ্যিক জ্ঞান, আর মা'রেফাত আধ্যাত্মিক বা চরিত্র সংশোধনের জ্ঞান। এই উভয় শাখার জ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষ কখনও কামেল হতে পারেনা। শিক্ষার উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেও মানুষ দুর্নীতি করে কেন? ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মানুষ মিথ্যা বলে কেন? প্রতারণা করে কেন? এর কারণ হল শুধুমাত্র পুঁথিগত বা কিতাবী জ্ঞান মানুষকে সত্যিকার শিক্ষিত করতে পারেনা। এই শিক্ষার সাথে সাথে মানুষের অন্তরে শুদ্ধি আনয়ন তথা চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষা পায়না বলেই কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ মন্দ কাজের দিকে অতি সহজেই ধাবিত হয়ে পড়ে।

আজ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা বেদনার শেষ নেই। এগুলো শুধুমাত্র বাস্তব জগতের অজ্ঞানতার জন্য সংঘটিত হয়না, বরং বহুলাংশে উহা ঘটে আমাদের ভিতরকার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে। এই মহা সত্যটি পাশ্চাত্যেরও বহু মনীষী আজ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বিজ্ঞানের আপতঃ মধুর মোহে পড়ে মানুষ ক্রমাগতভাবে শুধু বস্তু জগতেরই উন্নতি সাধন করে চলেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগত থেকে সে অনেক দূরে সরে পড়েছে। অথচ মানুষের সেদিকে খেয়াল নেই। সে বিজ্ঞানের জয়-জয়কারে মাতোয়ারা। তাই পৃথিবীর সভ্যতা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে- মানবতার স্থান সেখানে নেই। বিজ্ঞান বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছে সত্য কিন্তু মানবকল্যাণে সে জ্ঞান সর্বোত্তমরূপে ব্যবহার করতে হলে যে নৈতিকতাবোধের প্রয়োজন, সেটির অভাব তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত প্রকট। মানবীয় গুণের উপর গুরুত্ব কম দেয়ার দরুনই আজকের এই সভ্যতা আত্মঘাতী সভ্যতায় পরিণতি হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে, আজ সারা দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু রয়েছে- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মাদরাসায় যেভাবে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাতে শিক্ষার্থীগণ অনেক সময়ই সত্যিকার চরিত্র গঠনের বিশেষ কোন সুযোগ পায়না। যারা শিক্ষাবিদ, শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের কাজে জড়িত তারা প্রায়ই এ বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যান, এমনকি এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন না। তাই যুগ যুগ ধরে একটি অপূর্ণ শিক্ষা-নীতি চালু থাকার দরুন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে। এ শিক্ষা অন্তরকে সত্যিকারভাবে আলোকিত করে না, মানবীয় গুণের বিকাশ ঘটায়না। এ শিক্ষা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অথবা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তুলেনা, মানুষের সৃষ্টির পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ওয়াকেফাল করেনা। ফলে এই শিক্ষায় পারদর্শী বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী ডিগ্রী লয়ে বেরিয়ে আসছেন সত্য কিন্তু তাদের শতকরা কতজন সত্যিকার অর্থে বিবেক সম্পন্ন, চরিত্রবান হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাদের শিক্ষা মানবকল্যাণে কতটুকু ভ,মিকা পালন করছে সেটি তলিয়ে দেখার সময় এসেছে বৈ কি। প্রতিটি বিবেকবান শিক্ষিত মানুষের এদিকে সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা প্রকৃতই একজন হাদী ছিলেন। তরুণ বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল- দেশে বিরাজমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-নীতি কখনও মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করতে পারেনা- পতনোন্মুখ এ সমাজকে বাঁচাতে হলে একমাত্র আলাহর দেওয়া সেই শিক্ষা-নীতি অনুসরণ করেই তাঁকে এগুতে হবে- মানুষের মাঝে শরীয়ত ও মা'রেফাতের সমন্বয় ঘটাতে হবে। তবেই মানুষ শিক্ষিত হবে, চরিত্রবান হবে, সত্যিকারের

মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কী সূ² উপলব্ধি! কী সুগভীর প্রজ্ঞা! বস্তুতঃ শিক্ষাদানের এই মহান নীতি অবলম্বন করেই তাবলীগের কাজে তিনি সমাজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য স্কুল, মক্তব, মাদরাসা, লিলাহ বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা, খানকা স্থাপন, ইছালে ছওয়াব মাহফিলের আয়োজন, ওয়াজ-নসীহত, সংগঠন কায়েম, কিতাবাদি প্রণয়ন, পত্রিকা প্রকাশন, ইসলাম ও দ্বীনের স্বার্থে রাষ্ট্রনায়কদের সঠিক পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি বহুমুখী তাবলীগী কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল সেই একটি মাত্র কামনা- আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা-নীতি অনুশীলন করে মানুষ একদিকে জাগতিক বিদ্যায় পারদর্শী হোক, অপরদিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করে সে উদার ও নীতিবান হোক- গড়ে উঠুক সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি বৈষয়িক শিক্ষার দিকেও মানুষকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। ফলে তাঁর দরবার শরীফ শুধু আলেম-ওলামাদের দ্বারাই অলংকৃত ছিলনা, সেখানে ইংরেজী শিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষের আগমনও সমভাবে আদৃত ছিল। তাঁর কথা ছিল শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে থাকবে মুসলমানদের পদচারণা। তাদের কিছু সংখ্যক যেমন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে আলাহ-রাসূলের বিধান জারী রাখবে, তেমনি আবার কিছু সংখ্যক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষিত হয়ে সমাজের কল্যাণার্থে বিভিন্ন বিষয় উদ্ভাবন করবে। কিন্তু যে যেখানেই থাকনা কেন তাকে অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার প্রক্রিয়া তথা ইলমে মা'রেফাতের অনুশীলন করে ইছলামী চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন- আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে মাদরাসার শিক্ষাও যেমন অনেক সময়ই মানুষকে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিতে পারে, তেমনি আবার এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার বদৌলতেই ইংরেজী শিক্ষিত অথবা সাধারণ মানুষও আলাহ-রাসূলের অতি প্রিয় হতে পারে।

এই দুর্নীতিপূর্ণ অশান্তিময় সমাজে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মত আদর্শ হাদীরই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যারা ধর্মপ্রচার করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে সত্যিকারভাবে ইসলামী বিপ্লব বয়ে আনতে চান তাদেরকে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার হেদায়াতের নীতিই অনুসরণ করতে হবে। তবেই ধীরে ধীরে সমাজে একটি সুন্দর ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে, হাজার হাজার ওলামায়ে হক্কানী, চরিত্রবান নেতা, রাজনীতিবিদ, প্রকৌশলী, ডাক্তার, বিজ্ঞানী ইত্যাদি। একমাত্র তখনই সকলে মিলে এদেশকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে গড়ে তুলতে পারবে, তার আগে নয়। মনে রাখতে হবে সমাজের বুকে সুন্দর কিছু প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে, তা আইনের বলে যতটুকু সম্ভব, তার চাইতে হাজারো গুণ সম্ভব হবে মানুষের মাঝে নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে।

হুজুর কেবলার তাবলীগী ছফর

ছলফে ছালেহীনদের তরীকা অনুযায়ী মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কেবলমাত্র মানুষকে হেদায়াত করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করে ওয়াজ- নসীহত করতেন। কোন কোন সময় তিনি বলতেন- "আমার ইচ্ছা হয় প্রত্যেক জেলায় জেলায় যাইয়া ইসলামের বাণী শুনাইয়া আসি।" অসুস্থ অবস্থায় রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেউ তাঁকে ওয়াজ- নসীহত করতে বারণ করলে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হতেন। তৃতীয়বার হজ্জযাত্রার পূর্বে তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি ৩/৪ মাস পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন। যখন তিনি হজ্জে রওয়ানা হন তখনও তিনি লোকের সাহায্য ব্যতীত চলাফেরা করতে পারতেন না। হজ্জ করে দেশে ফিরে আসার পর তিনি বলেছিলেন, "আমি আলাহর ঘর ধরিয়া এই দোয়া করিয়া আসিয়াছি, হে খোদা, যদি রীতিমত তোমার দ্বীনের তাবলীগ করিতে না পারি তাহা হইলে আমি আর দুনিয়ায় থাকিতে চাইনা"। বাড়ি আসার পর হযরত পীর ছাহেব কেবলা শারীরিকভাবে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সকলে তাঁকে ছফরে না গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করার জন্য অনুরোধ করলেও তিনি রাজী হননি বরং বার বার ছফরে যাওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে তাগিদ

দিতে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন তাঁর ছফর প্রোগ্রাম বিলম্বিত হচ্ছে, তখন হঠাৎ একদিন দু'হাত তুলে আলাহর কাছে মুনাজাত করলেন, "হে আলাহ, আমি তোমার দ্বীনের তাবলীগ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি, তাই এখন আর আমি দুনিয়ায় থাকিতে চাইনা"। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এই মুনাজাতে সকলে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছফরের আয়োজন করলেন। তাবলীগে দ্বীনের কাজে কেমন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তিনি, এই ছোট্ট ঘটনাটি তারই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে।

ছফরের সময়সূচী ও উদ্দেশ্য ঃ

বিভিন্নমুখী ধর্মীয় কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে সমাজে একজন বিশিষ্ট হাদী হিসেবে হযরত পীর ছাহেব কেবলার সুখ্যাতি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বিভিন্ন স্থান হতে তাঁর কাছে মাহফিলের দাওয়াত আসা শুরু হল। এত ব্যাপক আকারে এটি শুরু হল যে শেষ পর্যন্ত দাওয়াতগুলো পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিল। সময়, সুযোগ এবং পীর ছাহেব কেবলার মনঃপুত হলে দাওয়াত গ্রহণ করে পত্রযোগে সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে মাহফিল সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হত।

এই সব দাওয়াত গ্রহণে তিনি সর্বদাই পর- মুখাপেক্ষিতার ঊর্ধ্বে থাকতেন। কেউ দাওয়াত করে পীর ছাহেব কেবলার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন- এরূপ মনে হলে তিনি কখনও তার দাওয়াত কবুল করেননি। দাওয়াতকারীর মাঝে ইখলাস আছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি বলতেন- "যাহাদের মধ্যে আগ্রহ নাই তাহাদের মধ্যে হেদায়েত পৌঁছেনা।" হযরত পীর ছাহেব কেবলা শুধুমাত্র হেদায়েতের উদ্দেশ্যেই তাবলীগী ছফরে বের হতেন।

তাঁর ছফরের আয়োজন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। নিজ বজরায় পাক করে খাওয়ার সম্পূর্ণ আয়োজন সঙ্গে নিয়ে তিনি ছফরে বের হতেন। অনেক স্থানে তিনি জলছা করেছেন, ওয়াজ-নসীহত করেছেন, বহুলোক তাঁর হাতে বয়াত হয়েছে কিন্তু সেসব স্থানে খাওয়া-দাওয়া ত দূরের কথা, এক গ্লাস পানিও তিনি পান করেননি। দুনিয়াদারীর গরজে টাকার নিয়তে তাবলীগ করতে যাওয়া তিনি হারাম জানতেন। কোন এক মাহফিলে হুজুরের পক্ষ হতে টাকার জন্য ছওয়াল করায় তিনি সে মাহফিল হতে একটি টাকাও গ্রহণ করেননি। সময় সময় বলতেন, "বাবা, টাকার নিয়তে হেদায়াতের কাজে গেলে মানুষ কিছুতেই হেদায়েত পাইবেনা।" এরূপ বহু ঘটনা আছে- কোন কোন মাহফিল হতে পীর ছাহেব কেবলা কিছুই গ্রহণ করেননি। এমনকি যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত নিজে বহন করেছেন। এসব ঘটনা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

যাত্রাপথে ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ব্যক্তিগত জীবনে শান শওকত মোটেই পছন্দ করেননি। কিন্তু দ্বীন ইসলামের কাজে তার মনোভাব ছিল ভিন্ন ধরনের। তাবলীগী ছফরে তার সঙ্গে দুই তিন খানা বোট থাকত। বেশ কিছু সংখ্যক মাওলানা, মুফতি, লেখক, ওয়ায়েজীন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ তাঁর ছফর সঙ্গী হিসেবে থাকতেন। ঐ সকল লোকের খাবার ব্যবস্থা বোটেই হত। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ছফরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল- তিনি সব সময়ই মাসলা-মাসায়েল, ফতোয়া সম্পর্কিত এবং অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবাদি সাথে রাখতেন। প্রয়োজনমত সেগুলো ব্যবহার করা হতো। ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন করলে দলীল সহকারে তিনি উত্তর দিতেন। এতে একদিকে প্রশ্নকারীর মনে যেমন কোন সংশয় থাকত না, অপরদিকে হঠাৎ করে কোন প্রশ্নের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের কোন অবকাশ থাকতো না। আলেম ছাহেবদের এ বিষয়টির উপর বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত।
মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সাথে যারা ছফরসঙ্গী হতেন তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাকতে হত। নদীর বুকে কোন ঝামেলা না থাকায় সবাই নিবিষ্ট মনে লেখাপড়া, আলোচনা, মোরাকাবা-মোশাহাদার সুযোগ পেতেন। পীর ছাহেব কেবলা নিজেও লেখাপড়া,

কিতাব সংকলন, মাসলা মাসায়েল অনুসন্ধান, ফতোয়া প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে মনোযোগ প্রদান করার অধিক সুযোগ পেতেন। সঙ্গীদের কেউ হালকা কথাবার্তা, গল্প- গুজব অথবা আমোদ-কৌতুকে সময় নষ্ট করার সুযোগ পেত না। পীর ছাহেব কেবলার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সবাই এক আদর্শ মোতাবেক চলতে বাধ্য হতেন। এমনকি নৌকার মাঝি মালাগণ, বাবুর্চি, দারোয়ান সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্বে রত থেকে পীর ছাহেব কেবলার আদর্শ অনুযায়ী চলতে হত। সঙ্গীদের সকলের সাথেই তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর। কিন্তু কর্তব্য কাজে অবহেলায় সকলকেই সমভাবে জবাবদিহি করতে হত। পীর ছাহেব কেবলার প্রতিটি কথাবার্তা এবং আচার ব্যবহারে সার্থকভাবে ফুটে উঠত সেই হাদীসের একটি বাস্তব রূপঃ "তোমরা সবাই রক্ষক এবং তোমরা সকলেই নিজ নিজ অনুবর্তীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।" পীর ছাহেব কেবলার সঙ্গী, সামাজিক দৃষ্টিতে সে যত ক্ষুদ্র কাজেই নিযুক্ত হোক না কেন- কাকেও সামান্যতম অবহেলা করা হতনা। তিনি সকলকেই পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। মরহুম নূরুদ্দীন ছাহেব লিখেন, 'রাখালের মত তিনি সঙ্গীগণকে পরহেজগারীর শ্যামল ভূমিতে তাড়াইয়া আনিয়া তাহাদিগকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে পরিচালিত করবার জন্য সকল সময় সচেতন ছিলেন। তাই মাঝিরা ঠিকমত দাঁড় টানিবার সঙ্গে ঠিকমত জামায়াতে শামিল হইতেছে কিনা, মাথায় টুপি পরিধান করিতেছে কিনা, হুক্কা-বিড়ি পান করিতেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিজেই তাদের জিজ্ঞাসা করিতেন এবং ত্র"টি বিচ্যুতি দেখিলে সতর্ক করিয়া দিতেন, কখনও বা ভীষণ গর্জনে সকলকে কাঁপাইয়া তুলিতেন। নৌকায় ছফরে নানা প্রকার অসুবিধার ভিতরেও নামাজের জামায়াতে হাজির না থাকার কোন ওজর আপত্তি পীর ছাহেবের নিকট স্থান পাইত না। সুন্নতি লেবাছ সকলকেই পরিধান করিতে হইত। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই কৈফিয়ৎ দিতে হইত। ইহার ফলে পীর ছাহেবের বজরার মাঝি-মালারাও পরহেজগার হইয়া উঠিত এবং ক্রমে ক্রমে এই নিরক্ষর লোকগুলো এত শরীফ হইয়া গড়িয়া উঠিত যে তাহাদের চরিত্র ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারা যাইত না।'

পীর ছাহেব কেবলা বাড়িতেও যেমন বজরাতেও তেমনি ইসলামী সাম্যের একটি মহান ছবি সব সময় প্রতিভাত হত। কে মাঝি, কে খাদেম, কে মুফতি তা অপরিচিত লোকের পক্ষে বুঝা সম্ভব হতনা। সকলে এক সাথে বসে আহার করতেন, পাশাপাশি শয়ন করতেন। অবশ্য আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্য না থাকলেও গুণগত পার্থক্য অবশ্যই বিরাজ করত। পীর ছাহেব কেবলা নিজেও আলেমগণকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাতেন এবং সঙ্গীয় কাহারো দ্বারা তাঁদের সম্মানহানিকর কিছু যাতে না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন।

অভ্যর্থনা ঃ

বজরায় করে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পীর ছাহেব কেবলা যখন নির্দিষ্ট দাওয়াতকারীর ঘাটে এসে পৌঁছতেন, তখন এক বিশেষ দৃশ্যের অবতারণা হত। গ্রামের যুবক-বৃদ্ধ, সরদার, আলেম, সাধারণ মানুষ- সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা করতে নদীর ঘাটে উপস্থিত হত। সেখানে তিল ধারণের স্থান হতনা। অগণিত জনতার উচ্ছ¡সিত আবেগে এবং ভীড়ে পীর ছাহেব শ্বাসরুদ্ধ প্রায়, তবুও তাঁর চোখে মুখে কখনও কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ পেতনা, বরং মনে হত অনাবিল একটি প্রশান্তির পরশ তাঁর মুখমণ্ডলে কে যেন বুলিয়ে দিয়েছে। তাঁর সহাস্য বদন ও উদারতা সকলের প্রাণ ভরে দিত।

সবাই উদগ্রীব- তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। দেখেই তৃপ্ত। সেই নূরানী চেহারার এক ঝলকেই মনের অনেক গভীরে কিসের যেন দোলা দিয়ে যায়। মুসাফাহ করার সুযোগ পেয়ে মানুষের মনে সে কী আনন্দ! সে বুঝি চিরধন্য। এ ত চেহারা দর্শন নয়, হাতের কোন স্পর্শও নয়- এ যেন এক বিরল অনুভূতি আর উপলব্ধি, যার প্রভাবে সংসারের এই ক্লেদাক্ত বদ্ধ পরিবেশ থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত মনটি ছুটে চলে দূরে, বহুদূরে- যেখানে কোন অস্থিরতা নেই, উদ্বেগ নেই, অতৃপ্তি নেই, আছে শুধু অনাবিল শান্তি। এমনিভাবে জনতার অকপট ভক্তি- শ্রদ্ধায় আপ্লুত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এক পা, দু'পা করে এগিয়ে চলেন

সামনের দিকে।
প্রশ্ন হ'ল- এত সম্মান এত ইজ্জত কেন? কোন লাট-বাহাদুর নয়, কোন জজ- ম্যাজিষ্ট্রেট নয়, প্রভাবশালী কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়- ধর্মীয় শিক্ষিত একজন আলেম মাত্র। কত নামকরা ওয়ায়েজীন এখানে এসেছেন, ধর্মসভা করেছেন, কৈ- তাঁদের সান্নিধ্য, তাঁদের দর্শন, তাঁদের চাহনির প্রতি জনতার আজকের এই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, আবেগ-আগ্রহ কোথায় ছিল? কী বিরাট তফাৎ!

ইজ্জতের মালিক আল্লাহ । তাঁর কাছে ইজ্জতের মাপকাঠি দুনিয়ার কোন পদ বা উচ্চাসন নয়, ধনসম্পদ নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ডিগ্রী নয়- একমাত্র মাপকাঠি হল 'তাকওয়া' বা খোদাভীরুতা। দুনিয়ার সকল কাজে আল্লাহর অনুমোদিত বিধানের কোন ব্যতিক্রম বা খেলাফ হল কিনা- এ বিষয়ে যে যত বেশি ভীত, শঙ্কিত থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে, আলাহ্র কাছে সে ততবেশি সম্মানী। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমাদের মাঝে যে বেশি মুত্তাকী, আল্লাহর কাছে সে-ই বেশি সম্মানী" (সূরা হুজরাত ঃ ১৩)।

মরহুম হুজুরের তাকওয়ার অনুশীলন এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাবলীগী ছফরে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্বচ্ছ। হাদিয়া, টাকা-পয়সা নয়, সমাজে নিজেকে হাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায় নয়- মানুষের মাঝে ওয়াজ-নসীহত করে আলাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর এই নির্মল সংকল্পে পার্থিব স্বার্থের সামান্যতম ছোঁয়াও যেন না লাগে, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ। এজন্যই আলাহর কাছে তাঁর ইজ্জত এবং এই ইজ্জতেরই প্রতিফলন ঘটেছে আবাল-বৃদ্ধ জনতার প্রতিটি অন্তরে।

বাবারা, এরা গরীবঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা জীবনের প্রতিটি কাজে, কথায় হযরত নবী করীম (দঃ) এর আদর্শের অনুসারী ছিলেন। জনতার এত ভীড় এবং অস্বাভাবিক পরিবেশেও একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, ধনী, আত্মগর্বিত ও আত্ম-সচেতন সাক্ষাৎ প্রার্থীকে অগ্রে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি অনেক সময়ই দূরে পশ্চাতে দাঁড়ানো কোন জীর্ণ শীর্ণ দুঃস্থ গরীবকে কাছে ডেকে নিতেন। এতে অবহেলিত, উপেক্ষিত কাতর নেত্রে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সাধারণ দর্শনপ্রার্থীর মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটে উঠত তাতে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যেতো না। হযরত পীর ছাহেব কেবলা অনেক সময় কৈফিয়তের সুরে বলতেন- বাবারা, এরা গরীব। সে হয়ত মনে করবে যে, গরীব বলেই উপেক্ষিত হইতেছে। তাদের সামান্য হাদিয়া পরম আনন্দে তিনি গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে সম্ভব হলে সমবেত জনতার মাঝে তা বণ্টন করে দিতেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এহেন কাজটি অতি সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ইসলামী চরিত্রের যে মহান রূপটি ফুটে উঠত তা প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তির অন্তরই স্পর্শ না করে পারেনা।

যেন একটি উৎসবঃ

পীরছাহেব কেবলার জন্য সাধারণতঃ পালকির ব্যবস্থা থাকত। তিনি সেটিতে আরোহণ করতেন। একখানা মাত্র পালকি কিন্তু গ্রামবাসীরা অনেক। তারা সকলেই পীর ছাহেব কেবলার পালকি বহন করার আগ্রহী। যাই হোক, পালকির সাথে উপস্থিত জনতা মুহুর্মুহু "নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার", "দ্বীন-ইসলাম জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনিতে পথ-ঘাট-মাঠ মুখরিত করে সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতো। এই সমারোহ, উৎসব ও আয়োজনের ভিতর দিয়ে মুসলিম জাগরণের যে রূপটি প্রতিভাত হত সেটি সেই সময়কার সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার না করলে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবেনা। "সমগ্র গ্রামবাসী, যুবক-বৃদ্ধ এবং অন্তঃপুর বাসিনীদের প্রাণে জেগে উঠত একটি ঈদের নতুনত্ব, একটি জীবন্ত

জাগ্রত প্রাণ-চাঞ্চল্য। চোখে মুখে ঝলসে উঠত স্বচ্ছ নূরানী ছায়া, একটি পবিত্র জীবনের আশ্বাস। গজল গাওয়া বালকের মুখে মুখে গুঞ্জন উঠত নব প্রভাতের ভ্রমর গুঞ্জন।"

সভামঞ্চে ঃ

বিপুল উৎসাহ ও সমারোহের মধ্য দিয়ে পীর ছাহেব কেবলা সভামঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই সকলকে সালাম দিতেন। মঞ্চের উপর আসন গ্রহণের পূর্বেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন এবং বলতেন "দেখুন, আপনাদের মধ্যে কে কে আলেম আছেন, আমি সবাইকে চিনি না, আপনারা আসুন। আমার সঙ্গে বসুন।" পরিচিত কোন আলেম তাঁর নজরে পড়লে তাকে ডেকে এনে মঞ্চে বসাতেন। অতঃপর সাধারণ নিয়মানুযায়ী কোথাও হস্তলিখিত, কোথাও মুদ্রিত মানপত্র পীর ছাহেব কেবলার উদ্দেশ্যে পাঠ করা হত। যেহেতু মানপত্রে প্রশংসাসূচক শব্দাদি বেশি থাকত তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। মানপত্রের জবাব দিতে গিয়ে প্রতিবারই তিনি এই হাদীসটি উলেখ করতেনঃ "যে ব্যক্তি নিজ প্রশংসা শুনিয়া খুশী হয়, কেয়ামতের দিন সে বধির হইয়া উঠিবে।" পরে বলতেন, "আপনারা আমার যে তারিফ করিয়াছেন আমি তাহার কদাচ যোগ্য নহি, আমি বড়ই গুনাহগার। তবে আমি আপনাদের মানপত্র এইজন্য শুনিয়াছি যে, আমি মনে করিয়াছি আপনারা আমাকে দোয়া করিয়াছেন।"

ওয়াজ নসীহতঃ

মানপত্রে বিশেষ কোন কথা অথবা প্রশ্ন থাকলে পীর ছাহেব কেবলা নিজে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে অন্য কেহ তার উত্তর দিতেন। এরপর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হত। মাদরাসা-প্রাঙ্গণে সভা হলে ছাত্ররা গজল, নাতিয়া ইত্যাদি পাঠ করতে চাইলে পীর ছাহেব কেবলা তার অনুমতি দিতেন। তবে গজল, হামদ, নাতিয়া ইত্যাদি সুর ও রাগ-রাগিনী সহকারে পাঠ করলে তিনি তা শোধরায়ে দিতেন। এখানে উলেখ্য যে, রাগ-রাগিনী সহকারে গান-গাওয়া, গজল-পাঠ করা ইত্যাদি হারাম। আজকাল সভা সমিতিতে বহু আলেম ওলামাদের উপস্থিতেতেও নাজায়েজভাবে এসব গাওয়া হয়, অথচ কেউ তার প্রতিবাদ করেন না। এতে যারা পাঠ করে এবং যারা শোনে তারা সকলেই এ কাজটিকে উত্তম বলে ধরে নেয়। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এগুলো শুধু নাজায়েজ, এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, সময় সময় সংশ্লিষ্ট হাদীস শোনায়ে সকলকে সতর্ক করে দিতেন।
সভার প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি তাড়াতাড়ি শেষ করে ওয়াজ আরম্ভ করে দিতেন। কোন কোন সময় সভাকর্তৃপক্ষের নিকট আলোচ্য বিষয়ের তালিকা চাইতেন এবং সেই অনুসারে ওয়াজ করাতেন। সাধারণতঃ ঈমান, আকায়েদ, নামাজ, পর্দা, হালাল রুজী, একতা, মানবতা, শিক্ষা, ইসলামী চরিত্র ও আদব ইত্যাদি বিষয়গুলো ওয়াজে অন্তর্ভুক্ত থাকত। পীর ছাহেব কেবলার সঙ্গীদের যারা ওয়াজ করতেন তারা সকলেই অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাদের ওয়াজ জনতাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে রাখত। কুরআন হাদীস, যুক্তি-তর্ক, বিভিন্ন উপমা, ঐতিহাসিক ঘটনা সহকারে তাঁরা তাদের বক্তব্য পেশ করতেন।

সাধারণতঃ পীর ছাহেব কেবলা সকলের শেষে ওয়াজ করতেন। অধিকাংশ সময় আলাহ ও রাসূল (দঃ)-এর প্রতি মহব্বত, জিকির ও মোরাকাবার প্রয়োজনীয়তা তাকওয়া-পরহেজগারী ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে তিনি উপস্থিত জনতাকে উপদেশ দিতেন। একান্ত সহজ সরল, গ্রাম্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ওয়াজ পরিবেশন করতেন। কখনও একাধারে দুই তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর ওয়াজ চলত। কিন্তু এজন্য জনতার মাঝে সামান্যতম অস্থিরতাও পরিলক্ষিত হতনা। বরং অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে এবং উৎফুল চিত্তে পীর ছাহেব কেবলার প্রতিটি কথা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করত। কখনও তাঁর কথায় জনতার মাঝে ক্রন্দনের রোল পড়ে যেতো। কোন লম্বা চওড়া কথা নেই, কোন রাগ-রাগিনীর সুর নেই- অতি সাধারণ কথায় মানুষের মাঝে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা যাদের অভিজ্ঞতা নেই তাদেরকে বুঝানো শক্ত বৈ কি? ছারছীনা দরবারের একজন বিশিষ্ট আলেম বলেন, 'আমি হুজুর কেবলার সাথে ছফর করেছি- তাঁর উপস্থিতিতে ওয়াজও করেছি। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি- উপস্থিত জনতার মাঝে

হুজুর কেবলার অতি অল্প সময়ের ২/১ টি কথার যে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি হত তার তুলনায় আমার দীর্ঘ সময়ের ওয়াজের প্রভাব একেবারেই নগণ্য ও তুলনাহীন ছিল।' এটি ওলী আলাহদের খাছ বৈশিষ্ট্য। তাঁদের অন্তর সদাসর্বদা আলাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং তাকওয়াপূর্ণ অন্তরের অবস্থার প্রতিক্রিয়া তাঁদের কথার মধ্যে প্রকাশ পায়, এজন্যই তাঁদের কথা অপরের উপর অধিকতর প্রভাব ফেলে। বস্তুতঃ তাঁদের চেহারায়ও অন্তরের ছাপ পড়ে, ফলে তাঁদের দর্শনেও মানুষের মাঝে প্রভাব পড়ে, আলাহ্ভীতি জাগ্রত হয়। বিষয়টি সূ[2], এটি নিয়ে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই, শুধুমাত্র এ প্রসঙ্গে গাওছে পাক্ হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর ছোট্ট একটি ঘটনা উলেখ করতে চাই ঃ হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর ছেলে মাদরাসার শিক্ষা শেষ করার পর বাড়িতে এলে এক মজলিসে তিনি তাঁকে ওয়াজ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর ছেলে অনেকক্ষণ ধরে ওয়াজ করার পর হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) মিম্বরে তাশরীফ এনে ওয়াজ শুরু করার আগে তাঁর নিজের একটি সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করলেন ঃ "গত রাতে আমি রোজা রাখার উদ্দেশ্যে সেহরী খাওয়ার জন্য কিছু দুধ রেখেছিলাম। একটি বিড়াল এসে সেই দুধটুকু খেয়ে ফেলেছে।" শুধু এতটুকু বলাতেই হঠাৎ করে মজলিসের অবস্থা বদলে গেল- কেউ কাঁদতে লাগল, কেউবা চিৎকার করতে শুরু করল। হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলার ছেলে এটি লক্ষ্য করে হতবাক হয়ে গেলেন এবং তার এত জ্ঞানগর্ভ কথার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না অথচ তার পিতার এই সামান্য কথার এতবড় প্রতিক্রিয়া কিভাবে হলো জানতে চাইলেন। হযরত গাওছে পাক উত্তর দিলেন, "বাবা, তোমার ইলম এখন পর্যন্ত মুখেই সীমাবদ্ধ আছে। এটিকে অন্তরে পৌঁছাও। দেখবে তোমার সামান্য কথাও মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে।" মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ওয়াজ-নসীহতের সাথে তথাকথিক পেশাধারী ওয়ায়েজীনদের বক্তব্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য ছিল। দু'টি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়ঃ

এক
বহু আলেম এবং পীর ছাহেবগণ জনতার মন আকৃষ্ট করার জন্য মছনবী শরীফ এবং অন্যান্য কিতাবের গল্পগুলোকে রাগ-রাগিনীর সুর করে পড়ে থাকেন। অনেক সভায় সুরের মোহে মত্ত করতে এবং এর দ্বারা নিজেদের প্রচার ও দাওয়াত বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করে থাকেন। এটি নিঃসন্দেহে হারাম। এ ব্যাপারে মুজাদ্দিদে যমান ফুরফুরা শরীফের হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর অছিয়তনামার কিয়দংশ নিæে উদ্ধৃত্ত হলঃ

"... ... হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর হাদীসের দিকে খেয়াল করিলে সুস্পষ্টই জানা যায় যে, এই সমস্ত খেলাফ-শরা পীর, মৌলভী-মাওলানা, লেখক, বক্তা, ওয়ায়েজ এবং নেতাদের জন্যই মুসলিম সমাজ আজ এত দুর্গতির মধ্যে পড়িয়াছে। আজকাল বহু ওয়ায়েজ-বক্তা আলাহ-রাসূলের কালাম ও মাসলা-মাসায়েল এবং শরীয়তানুযায়ী মুসলমানের তারাক্কী সম্বন্ধে ওয়াজ-বক্তৃতা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি বাজে গল্প এবং উর্দু, ফার্সী এবং বাংলা ভাষায় গান গাহিয়া থাকেন। কুরআন-হাদীস, যাহা দ্বারা ইসলামের এশায়াত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই বরং শয়তানের গলার আওয়াজ- যাহা দ্বারা ইসলামের মহা ক্ষতি হয়, তাহার সহিত ইহাদের খুব মিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন রূহের সজীবতার জন্য আমরা গজল গাহিয়া ওয়াজ করিয়া থাকি, কেননা ইহাতে এতমিনানে রূহ আনয়ন করে এবং আল-াহর দিকে দিল রুজু হয়। যাহারা এরূপ বলেন, তাহাদের আকীদা ভুল। কেননা গান, রাগ-রাগিনী, গজল প্রভৃতি দ্বারা রূহের এতমিনান হয়না, বরং উহাতে নফ্স খুশী হয় এবং খোদার দিকে দিল রুজু হওয়া অপেক্ষা শয়তানের দিকে দিল রুজু হওয়ারই সম্ভবনা অধিক থাকে।"মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এবং তাঁর আদর্শ মতে গড়ে উঠা কোন বক্তা ওয়ায়েজ এরূপ শরীয়ত-বিরোধী ওয়াজ কখনও করেননি, বরং তাঁরা এর বিরোধীতা করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিতেন।

দুই
অনেক বক্তা বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে সুন্নাত অল-জামায়াতের বিরোধী বক্তব্য পেশ করে থাকেন- যেমন, মাজহাবের প্রয়োজন নেই, তাসাওফ নাজায়েজ, সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি

নয়, অসীলা ধরা হারাম ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, ধর্মীয় শিক্ষায় অনগ্রসর বহু শিক্ষিত লোক তাদের মুখরোচক কথায় আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে নিজের ঈমান, আকীদা নষ্ট হওয়ার চরম আশংকা থাকে। আজকালকার এরূপ ওয়ায়েজীনদের প্রসার সমাজে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাদীসে আছে- আখেরী যমানায় এমন লোক আবির্ভূত হবে যাদের কথাগুলো হবে নবী রাসূলের মত, কিন্তু তাদের কাজ হবে নেকড়ে বাঘের মত। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁর ওয়াজ-নসীহতে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন দলীল প্রমাণাদি দিয়ে এইসব আকীদা সংহারক বক্তব্যকে ভিত্তিহীন প্রমাণিত করে ঐসব নামধারী আলেমদের ওয়াজ মজলিসে উপস্থিত হতে জনসাধারণকে নিষেধ করে দিতেন। হক্কানী আলেমদের এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকা উচিত।

তিন

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ওয়াজ মাহফিল সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হুজুর কেবলা বাড়িতে অথবা ছফরে যেখানেই থাকতেন না কেন মাগরীব নামাজের পর যথারীতি ওজীফা আদায় করতেন। ছফরে থাকলে সকলকে নিয়ে যথারীতি 'ছওয়াব রেছানী' করে সংক্ষিপ্ত সময় 'নফি এছবাত' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) জিকির এবং তওবার মোরাকাবা করতেন এবং পরে ওয়াজ শুরু করতেন। জিকির আজকার করায় সকলের মনটি স্বাভাবিকভাবেই গায়রুল্লাহ থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়ে আল্লাহ-রাসূলের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। এই অবস্থায় ওয়ায়েজীনদের সামান্য কথাতেও মানুষের মন বিগলিত হত। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় কোনরূপ জিকির আজকার না করে ওয়ায়েজীনগণ ওয়াজ করেন, কেউবা তাফসীর করেন। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এরূপ তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজ শুরু করার দরুণ তাদের কথা এবং উপদেশ যথার্থভাবে গ্রহণের জন্য শ্রোতাদের অন্তকরণে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া একান্ত আবশ্যক, সেই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে বক্তার কথাগুলো তাদের অন্তকরণে সাময়িক প্রভাব ফেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার অনুরোধ করছি। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় ব্যাপারটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কোন দেয়ালে বা আসবাবপত্রে রং লাগাতে হলে সেটিকে প্রথমে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয় তবেই সেই রং দীর্ঘস্থায়ী হয়। একই ভাবে দুনিয়ার কাজ কর্মে লিপ্ত মানুষের অন্তকরণে স্বাভাবিকভাবেই 'গায়রুলাহ'র প্রভাব পরে। তাই ধর্মীয় উপদেশ দিয়ে তাদের অন্তকরণকে আলাহমুখী করার জন্য সেটি জিকির আজকারের মাধ্যমে প্রথমে 'গায়রুলাহ'র প্রভাবমুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। তবেই আলাহ-রাসূলের কথাগুলোর প্রভাব তাদের উপর অধিক দীর্ঘস্থায়ী হবে।

তওবা ও মুনাজাতঃ

মরহুম পীরছাহেব কেবলা তাঁর বক্তব্য শেষে সকলকে তওবা করার জন্য আহবান করতেন। সাথে সাথে তিনি বলে দিতেন- "আপনারা ইহা মনে করিবেন না যে, আমি আপনাদেরকে আমার নিকট মুরীদ হইতে বলিতেছি। আমি একান্তই গোনাহগার। আমার গুনাহরাশির কথা আপনারা যদি সম্পূর্ণ জানিতেন তাঁহা হইলে আমাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেন। মনে রাখিবেন শুধু মুরীদ হওয়ার জন্যই তওবা করিতে হয়না। তওবা চারি প্রকার-তার দু প্রকার হল তওবায়ে এরাদাত অর্থাৎ মুরীদ হইবার জন্য তওবা করা, তওবায়ে তাবাররক অর্থাৎ কোন বুজুর্গ লোকের সাক্ষাৎ পাইলে বরকত লাভের জন্য তওবা করা, ইত্যাদি। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে গোনাহ্র জন্য তওবা করি।" এ কথার সাথে জনতার মাঝে তওবা করার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিত এবং একাগ্রতার সাথে হুজুরের মুখ থেকে তওবার কলেমাসমূহ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে উঠত। মনে হত সকলে যেন এ মুহূর্তটির জন্যই অধীর আগ্রহে আপেক্ষা করছিল। পীর ছাহেব কেবলা তাঁর মস্তকে পরিহিত সাদা পাগড়ীর এক প্রান্ত নিজের হাতে রেখে অপর প্রান্ত জনতার দিকে ছুঁড়ে দিতেন। যারা পাগড়ি ধরতে পেতনা তাদেরকে পরস্পরে ধরাধারি করে বসতে বলা হত। মঞ্চের উপর হতে আরও বহু পাগড়ী জনতার দিকে নিক্ষেপ করা হত এবং উহার একপ্রান্ত পীর ছাহেবের পাগড়ীর সাথে, জামার সাথে ধরে রাখা হত। এই রূপে সমগ্র মজলিসটির একটি গম্ভীর পরিবেশ আসন্ন হয়ে উঠত। অতঃপর পীর

ছাহেব কেবলার সাথে সকলে তওবার কলেমাগুলো পাঠ করত এবং পরে মুনাজাত করা হত। অনেকেই পাগড়ী ধরে তওবা করান এবং মুরীদ করানোকে অজ্ঞতার কারণে নাজায়েজ বলে ধারণা করে থাকে। এটি সুন্নাত অল-জামায়াতের সর্বসম্মত প্রক্রিয়া এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মুনাজাতে সাধারণতঃ যে মর্মস্পর্শী পরিবেশের সৃষ্টি হত সেটি অনেকের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর। মানুষ কেঁদে গড়াগড়ি যেত, কেহ বা চিৎকার করে আলাহর কাছে মাগফেরাত কামনা করত, কেওবা নিঃশব্দে কেঁদে আকুল হয়ে হাত বুক ভাসিয়ে ফেলত- কারও পক্ষে স্বাভাবিক থাকা সম্ভব হতনা। তিনি মুনাজাতের মধ্যে মজলিসে সকল নেক কার্যের ছওয়াব পয়গম্বর, ওলী-আওলিয়া, শহীদ, সিদ্দিক, তরীকার পীর মাশায়েখ, সকলের মা-বাবা এবং পৃথিবীর সকল মৃত মোমেন স্ত্রী-পুরুষের রূহের প্রতি বখশিশ করতেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারণ, দেশের বালা মুছিবত ইত্যাদির জন্যও দোয়া করতেন। মুনাজাতের পর পীর ছাহেব কেবলা এক মুহূর্তও সভায় অবস্থান করতে চাইতেন না। তাই সাথে সাথে তিনি আপন আসন পরিত্যাগ করতেন এবং পালকি তৈয়ার করার হুকুম দিতেন। এর একটি প্রধান কারণ এই ছিল যে, মুনাজাতের পরও অবস্থান করলে লোকে মনে করতে পারে, তিনি হাদিয়া বা খয়রাতের প্রত্যাশা করছেন। অবশ্য জনতা তাকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলত এবং সহসা পালকিতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতনা। কদমবুছি, মোছাফাহা, পানি পড়ানো, ফুঁ গ্রহণ ইত্যাদির জন্য মানুষের আগ্রহের অন্ত ছিলনা। পীর ছাহেব কেবলা এত ঠেলাঠেলি ভীড়ের মধ্যেও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতেন না।

তা'লীম ও সাংগঠনিক আলোচনা ঃ

কোন কোন মজলিসে ওয়াজ-নসীহত শেষ হলে তরীকার ছবক গ্রহণকারীদের তা'লীম দিতেন। আবার কখনও কখনও একই স্থানে পরদিন ভোরবেলা তা'লীমী জলছার আয়োজন করা হত। সেখানে লোকদেরকে খাছভাবে হেদায়েত, নসীহত ও তা'লীম দিতেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সেখানে আলোচিত হত। ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারণ, খানকাহ স্থাপন, মাদরাসা স্থাপন ইত্যাদি বিষয়সমূহও সেই আলোচনায় স্থান পেত। স্থানীয় লোকজন যাতে যথারীতি তরীকার ছবক মশক্ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে নিয়ে খানকাহ স্থাপনের ব্যবস্থা করতেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের উৎসাহে বিভিন্ন স্থানে হুজুর কেবলার উৎসাহে হাজার হাজার খানকাহ স্থাপিত হয়েছে।

স্থানীয় আলেম ওলামা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডেকে এনে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারণের জন্য মাদরাসা মক্তব কিভাবে বাড়ানো যায় সে সব আলোচনা করতেন। এ ব্যাপারে জনসাধারণের মাঝে বিপুল সাড়া পাওয়া যেতো। এসব কাজের জন্য সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়ানোর উপর পীর ছাহেব কেবলা বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। সকলকে সংগঠন কায়েম করে তার মাধ্যমে ধর্মীয় খেদমত করার জন্য তিনি সকলকে উৎসাহ প্রদান করতেন।

অসাধারণ নিষ্ঠা ও তার ফলাফল ঃ

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্থান হতে স্থানান্তরে বিভিন্ন মাহফিলের মারফত তাবলীগের কাজ করে বেড়াতেন। মানুষের মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মানুষ কিভাবে আমল করে আলাহ এবং তাঁর রাসূল (দঃ)-এর প্রিয় হতে পারে সেটির প্রচেষ্টা চালানোই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ পীর ছাহেব কেবলা নিজ বাড়ির বার্ষিক ইছালে ছওয়াব মাহফিল সম্পন্ন করার পর পৌষ মাসের প্রথম ভাগে তাবলীগী ছফরে বের হতেন এবং ক্রমাগত ছয়মাস কাল ছফরে থেকে বাড়ি ফিরতেন। এর মাঝে অবশ্য ফাল্গুণ মাস মাদরাসার বার্ষিক দ্বিতীয় সভা উপলক্ষ্যে তাঁকে বাড়ি আসতে হত। সেই সুযোগে ফুরফুরা শরীফে নিজ পীর কেবলার বাড়ির বার্ষিক ইছালে ছওয়াবে যোগদান করে আসতেন।

এইভাবে মরহুম হুজুরকে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বড় রকমের সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতে লাগলো এবং লোকদের মাঝে ইসলামের চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। যেখানে দিন রাত আযান দেয়ার একটি লোক খুঁজে পাওয়া যেত না, সেখানে এলাকায় এলাকায় মসজিদ হলো, চারিদিক হতে ভেসে এল সুমধুর তৌহিদী আওয়াজ। যেখানে সাধারণ কোন মৌলভী-মুন্সী পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল, সেখানে মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠিত হলো- হাজার হাজার আলেম-ওলামা তৈরী হলো; মহল্লায় মহল্লায় খানকা গড়ে উঠল- লাখো লাখো জাকেরীন তৈরী হলো; এখানে সেখানে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো- পীর বুজুর্গ, ওয়ায়েজীনদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠল অবহেলিত নাম না জানা কত শত গ্রাম- এলাকা। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মহৎ প্রচেষ্টার ফসল নিজ চোখে দেখতে পেয়ে হযরত পীর ছাহেব কেবলা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং আরও অধিক উৎসাহে হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

আজ এদেশে ইসলামের চর্চা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু হযরত পীর ছাহেব কেবলা যখন প্রথম হেদায়েতের কাজ শুরু করেন তখন দেশ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, সমাজে ইসলামী ভাবধারা লুপ্ত প্রায়। তাই তাঁর সভাস্থলে অতি অল্প সংখ্যক শ্রোতাই ওয়াজ শোনার জন্য হাজির হত। ধীরে ধীরে এ অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কিছু কিছু লোক হযরত পীর ছাহেব কেবলার কাছে এসে মুরীদ হত। তিনি তাদেরকে অতি উৎসাহের সাথে কাছে রাখতেন, তাসাওফ এবং বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল শিক্ষা দিতেন। তাদেরকে উৎসাহ দিতেন, সংশোধন করতেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণের গুরুত্ব শিক্ষা দিতেন। এইভাবে পীর ছাহেব কেবলা সমাজের পথহারা মানুষের মাঝে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা আনয়নের জন্য চরম ধৈর্য, অসাধারণ নিষ্ঠা, ঐকান্তিক আগ্রহ ও সীমাহীন তাওয়াক্কুল সহকারে বছরের পর বছর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পীর ছাহেব কেবলার সে প্রচেষ্টায় দিন দিন অগণিত লোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর কথা শোনার জন্য, তাঁর নির্দেশে ধর্মীয় জীবন গঠনের উদ্দীপনা নিয়ে সমাজের মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসেছে ভাবতে বিস্ময় লাগে। বস্তুতঃ প্রকৃত ওলীদের অবস্থা তাই- পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত প্রদীপের দিকে আত্মহারা হয়ে ছুটে আসে, জনতাও প্রকৃত ওলীর আবির্ভাবে তাঁর দিকে সেইভাবে আকৃষ্ট হয়।

তাবলীগী ছফরের এলাকাসমূহ ঃ

ফুরফুরা শরীফের হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বেশির ভাগ সময়ই তদানীন্তন বরিশাল জেলায় তাবলীগী ছফর করতেন। অন্যান্য জেলা হতে দাওয়াত এলে অনেক সময়ই তিনি উহা গ্রহণ করতেন না। স্বীয় পীরের ইন্তেকালের পর তিনি বিভিন্ন জেলায় ছফর আরম্ভ করেন। আপন পীরের প্রতি আদব প্রদর্শনের জন্যই মূলতঃ মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এটি করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই হুজুর কেবলা ছফর করেছেন। প্রায় সব জায়গাতেই তাঁর অসংখ্য মুরীদ ও খলিফা রয়েছে। তবে তদানীন্তন বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিলা ইত্যাদি আশেপাশের জেলাতেই তার তাবলীগী কাজ তুলনামূলকভাবে অধিক ছিল।

পীর ছাহেব কেবলা বাংলাদেশের বাইরে কোথাও তাবলীগী ছফরে যান নাই। আসাম ও বার্মা হতে কয়েকবার আমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু সেসব স্থানে যাওয়ার কোন সুযোগ হয়ে উঠেনি। তবে তাঁর খ্যাতি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আসাম, বার্মা ও অন্যান্য প্রদেশ হতে বহু লোকজন এসে বয়াত গ্রহণ করে তাঁর ছোহবতে অনেকদিন কাটিয়ে দিতেন। মালাবার দ্বীপের একজন বিশিষ্ট লোক মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দরবারে বহুদিন অবস্থান করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন, তাঁর ভাষা ছিল আরবী। হুজুর কেবলার কাছে বয়াত গ্রহণ করে রিয়াজতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। একবার কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চল হতে একজন আলেম পীর ছাহেবের দরবারে এসে তরীকা শিক্ষা করেন। বহুদিন অবস্থান করে তিনি সনদ অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরা জিলার আগরতলা অঞ্চলে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার অনেক

মুরীদ রয়েছে। তাঁর সুখ্যাতি শুনে আগরতলায় কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছারছীনায় আসেন এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে পীর ছাহেব কেবলাকে আগরতলায় নিয়ে যেতে সক্ষম হন। যদিও সেখানে হিন্দুদের প্রভাবে মুসলমানগণ অত্যন্ত অসহায়ভাবে জীবনযাপন করেন, তথাপি পীর ছাহেব কেবলার ফায়েজ ও ছেলছেলা সেখানে জারী রয়েছে। এইভাবে আলাহর অসীম রহমতে হুজুর কেবলার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শুধু বাংলাদেশে নয়, এর বাইরেও তাঁর ফায়েজ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেখানেও তাঁর হেদায়েতের ধারা আপন বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য লয়ে অবিরাম প্রবাহিত হচ্ছে।

হযরত পীর ছাহেব কেবলার হাদিয়া গ্রহণ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মানুষের মাঝে গিয়ে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে আজীবন সাধনা করে গিয়েছেন। একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় তাঁর তাবলীগী ছফর ছিল একান্তই মহানবী (দঃ) তথা সাহাবায়ে কেরাম ও ছলফে ছালেহীনের অনুকরণে। নবী করীম (দঃ) বলেছেন ঃ

"তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং সন্দেহজনক বস্তু হতে দূরে থাকো"। হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) ছিলেন উলেখিত হাদীসের বাস্তব নমুনা। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, পীর ছাহেব কেবলা কোন নতুন স্থানে দাওয়াত গ্রহণ করেছেন, যেখানে দাওয়াতকারীর রুজী-রোজগার, পরহেজগারী সম্মন্ধে স¤পূর্ণ জানা ছিল না। অনুসন্ধান করে নিজে স¤পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের কোন খাবার গ্রহণ করেন নাই। কোন ব্যক্তি হাদিয়া এনে উপস্থিত হলে হাদিয়া দাতার প্রতি লক্ষ্য করতেন এবং সুন্নাতের পাবন্দ হলেও হালাল মাল বলে বিশ্বাস হলে তা গ্রহণ করতেন, অন্যথায় ফেরত দিতেন। বর্তমানে এমন পরহেজগারী অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এ নীতি শুধুমাত্র নিজের পরহেজগারীর সাক্ষ্য প্রদান করে না, সমাজের উপর এর কী বিরাট প্রভাব পড়েছিল সেটিও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

হাদিয়া নিয়ে কেউ মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কাছে হাজির হলে তার মাঝে সুন্নাতের কোন খেলাফ প্রত্যক্ষ করলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেনঃ "আপনার মাল বা পেশা কি হালাল? পাঁচ ওয়াক্ত রীতিমত নামাজ পড়েন কি? আপনার কোন সুদী বা কট দলীল আছে"? ইত্যাদি। এর যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তরে খটলা বাঁধলে তার হাদিয়া তিনি গ্রহণ করেননি। কারও দাড়ি মুড়ানো, ছাটা কিংবা লম্বা চুল থাকলে তার হাদিয়া তিনি গ্রহণ করতেন না। ফলে সাক্ষাৎ প্রার্থীরা নিজের শরীয়তের খেলাফ কাজের দরুন তাদের হাদিয়া গৃহীত হলোনা বলে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হত এবং নিজ গুনাহের জন্য তওবা করতে এগিয়ে আসত। লম্বা চুল ওয়ালা চুল কেটে ফেলার জন্য তৎক্ষণাত রাজী হয়ে যেতো। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা অনেক সময় নিজ হাতে এক গোছা চুল কেটে দিতেন। বহুলোক অনুতপ্ত হয়ে চুল বের করে বলত "হুজুর, আমার চুলও কেটে দিন"। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তখন সমবেতভাবে তওবা পড়াতেন এবং যারা নিজ গুনাহ থেকে ফেরার জন্য ওয়াদা করত তাদের জন্য দু'হাত তুলে দোয়া করতেন। 'মনে হত যেন এই মানুষগুলি হঠাৎ তাহাদের চেতনা ফিরে পেয়েছে, যেন কোন এক পরশ পাথরের সংস্পর্শে তাদের মরিচা ধরা লৌহ কঠিনপ্রাণগুলি দ্রবীভ‚ত হয়ে গিয়াছে; যেন তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে অন্ধকারময় এক গোপন গুহায় প্রভাতের অরুণ আলোর ছটা হঠাৎ ঝলমল করে উঠেছে এবং সেই আলোর বন্যায় হৃদয়ের গহন গভীরে নিজকে প্রত্যক্ষ করে বারবার শিহরিয়া উঠতেছে'।

অনেক সময় কোন লোকের তওবা এবং হেদায়েত কবুল করা সত্তে¡ও মরহুম পীর ছাহের কেবলা হাদিয়া গ্রহণ না করে হাদিয়া তার নিকটই আমানত স্বরূপ রেখে দিয়ে বলতেন, "কিছু দিন পরে পুনঃ আমার সহিত দেখা করিবেন, পরে আমাকে এই হাদিয়া পৌঁছাইবেন, কিংবা নামাজ যখন আর মোটেই কাজা হইবেনা তখন এই 'আমানত' আমার নিকট পৌঁছাইবেন"। কখনও তাদেরকে ধমকের সুরে বলতেন, "খবরদার! আমার এই আমানত মৃত্যুর পূর্বে পরিশোধ করিবেন"। বলা বাহুল্য এমনিভাবে কত হাজার হাজার লোক, তাঁর হাতে হেদায়েত

পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেক সময় দেখা যেতো ফেরত দেয়া হাদিয়া দু'মাস, ছ'মাস অথবা এক বছর পর হুজুরের হাতে এসেছে। আগন্তুকরা সবিনয়ে আবেদন জানিয়েছে, "হুজুর, আমি আর তারপর নামাজ কাজা করি নাই, দাড়ি রাখিয়াছি, ঘুষ ছাড়িয়াছি, পর্দা করিয়াছি, মাথার লম্বা চুল কাটিয়াছি। আপনার সেই হাদিয়া আজ কবুল করুন"। এতে পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) অত্যন্ত খুশী হতেন এবং সমবেত সকলকে নিয়ে দোয়া করতেন এবং বলতেন "দেখ, আমি যদি আলাহ্র উপর ভরসা না করে সেদিন লোভ করে তাদের হাদিয়া গ্রহণ করতাম, তাহলে লোকগুলো কি হেদায়েত পেত"? তিনি প্রায়ই বলতেন, "আলাহ বলেনঃ এমন কোন প্রাণী নাই যার রিজিকের ভার আলাহর উপর ন্যাস্ত নহে। এ প্রতিশ্র"তি থাকা সত্তে¡ও আলেমগণ নিজেদের রুজী রোজগারের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। তারা তাহকীক না করিয়াই হাদিয়া খয়রাত গ্রহণ করিয়া হেদায়েত পণ্ড করিয়া দিতেছে, ফলে দেশে গোমরাহী ছড়াইয়া পড়িতেছে"।

তথাকথিত অর্থলোভী আলেমগণের পরমুখাপেক্ষীতার কারণে তারা লোকের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা আত্মমর্যাদাবোধ বর্জিত ঐ সব আলেমদের কঠোর সমালোচনা করতেন। সমাজকে আলাহ্র পথে আহŸান করতে ছলফে ছালেহীনের পবিত্র আদর্শ অনুসরণ, তাদের তাকওয়া নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তিনি তাঁর তাবলীগী ধারাকে অক্ষুণœ রেখেছিলেন। বস্তুতঃ আমীরানা ভাব প্রকাশের দরুনই মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি এরূপ প্রগাঢ় মহব্বত সৃষ্টি হত।

সূফীয়ানে কেরামের মাঝে এ আমীরানা চালচলন প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ঘটনার বর্ণনায় জানা যায়, হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ) রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে যখন আলাহর রাস্তায় বের হন তখন একসময় তিনি জনৈক এক ধনী লোকের বাগানমালীর কাজে নিয়োজিত হন। ঘটনাচক্রে একদিন মালিকের এক বন্ধুর আগমনে বাগানের মালিক হযরত ইব্রহিম আদহাম (রঃ) কে একটি আনার খাওয়াতে বলায় তিনি আনার নিয়ে উপস্থিত হন। আগন্তুক ব্যক্তি তাঁকে দেখেই চিনে ফেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুকে বললেন, "তুমি যাকে মালী হিসেবে নিয়োজিত রেখেছ তিনি আর কেউ নন, তিনিই হলেন প্রখ্যাত আলাহ্র ওলী হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ)। তিনি নিজেকে ইচছা করে গোপন রেখেছেন, তাঁর সংস্পর্শে থাকার জন্য তাঁকে এক নজর দেখার জন্য মানুষ তাকে প্রতিনিয়ত সন্ধান করছে"। গৃহকর্তা সবকিছু শুনে অনুতপ্ত ও সংকুচিত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন 'আমায় আপনি ক্ষমা করুন, আপনাকে চিনতে না পেরে আমার কর্মচারী হিসেবে আমি নিয়োগ করেছি। আপনি আজ থেকে মুক্ত। আপনি যতদিন, জীবিত থাকবেন আজ হতে আমি আপনার খেদমত করব, আমার বাড়িতে স্বাচ্ছন্দে আপনি এবাদত করুন। হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ) উত্তর দিলেন, 'তা কখনও সম্ভব নয়। এতদিন আমি আপনার বাড়িতে আমার অর্জিত অর্থ দ্বারা পানাহার করতাম। এখন থেকে আমি আপনার অনুগ্রহের দাস হব, এমন কাজ আমার দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। আমি তাক্ওয়ার বিনিময়ে আপনার খাদ্য গ্রহণ করতে পারিনা'। এই বলে কোন কালক্ষেপণ না করে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন। আমীরানা আদর্শের এই দুর্লভ রূপটি সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার চরিত্রে। এদিক দিয়ে তিনি তাঁর সময়কার অনন্য বললেও একটুকু অত্যুক্তি হবে না।

সমাজের মানুষের মাঝে হেদায়েত পৌঁছানই যে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার তাবলীগী ছফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এতে নিজের কোন স্বার্থ ছিলনা সেটি ইতিপূর্বেই উলেখ করা হয়েছে। পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে দু'একটি ঘটনা নিম্নে উলেখ করা হলো।

কোন এক সময় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এক সম্ভ্রাংত তালুকদার সাহেবের বাড়িতে দাওয়াত কবুল করেন। তাদের ধারণা ছিল পূর্বে যে সমস্ত আলেম ওয়ায়েজীন তাদের বাড়িতে এসে ওয়াজ নসীহত করে খেয়ে দেয়ে টাকা পয়সা গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গিয়েছেন তাদের ন্যায় পীর ছাহেবেও তাদের আমল, আখলাকের দিকে খেয়াল না করে যথারীতি

খানাপিনা হাদিয়া গ্রহণ করে বিদায় নিবেন। তাদের বাড়িতে গ্রামোফোনে গান চলত, বাইরের লোকজন ভিতর বাড়িতে অবাধে চলাফেরা করত, তাদের আয় উপার্জনেও অনেক সময় ত্র“টি থাকত। তারা পীর ছাহেবকে তাঁর খাওয়া বাবদ একটি কাতল মাছ, একটি খাসি, ঘি, তৈল, চাল-ডাল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে বজরায় হাজির করল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তখন নিজ অজীফা আদায় করছিলেন। কিছুক্ষণ পর বের হয়ে সবকিছু দেখে গম্ভীর স্বরে দাওয়াতকারীকে বললেন, “সাহেব, আমাকে আপনারা কি জন্য দাওয়াত করিয়াছেন? আমি হেদায়েতের নিয়তে আসিয়াছি, খাইতে আসি নাই। যদি আপনারা আমার হাদিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমিও আপনাদের হাদিয়া গ্রহণ করিব, নইলে নয়”। পীর ছাহেব কেবলার এরূপ ভাষণের প্রতিবাদ করার সাহস তাদের হলনা। তারা বলল “হুজুরের যা মরজী, আমরা তাতেই রাজী”। পীর ছাহেব অনেকক্ষণ ধরে সেই বাড়িতে ওয়াজ নসীহত করলেন। তাদের প্রদত্ত ভেট সারাদিন সেই ভাবে পড়ে রইল। রাতে বোটে ফিরে এসে খাওয়ার নিজস্ব সামান্য যা কিছু ছিল তা দিয়েই পীর ছাহেব সকলকে নিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করলেন। তার ওয়াজে লোকজন অনেকেই পথে আসল, বাড়িতে গ্রামোফোন বন্ধ হলো। নারী মহলে পর্দার বন্দোবস্ত হলো। সকলে মিলে পীর ছাহেব কেবলার হাতে তওবা করল। বাড়ির দু’একজন প্রভাবশালী লোক হুজুরের কাছে বয়াত হলো। পরে তারা বিশেষ মোত্তাকী ও পরহেজগার হয়েছিল। পীর ছাহেব কেবলা চলে আসলেন, কিন্তু হাদিয়ার একটি দানাও তিনি গ্রহণ করলেন না। তাদের হাদিয়া তাদের নিকটই জমা রইল।

কোন এক নতুন স্থানে পীর ছাহেব কেবলা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে সকলে মিলে চাঁদা তুলে পীর ছাহেব কেবলা এবং তাঁর সঙ্গীয় লোকদের জন্য বিরাট এক ভোজের সামগ্রী এবং বিস্তর টাকা পয়সা জমা করে রাখল। সেগুলো ডালায় করে সাজিয়ে তারা পীর ছাহেব কেবলার বজরায় ফিরে এলো এবং টাকাগুলো তাঁকে দেয়ার জন্য ইচছা প্রকাশ করল। পীর ছাহেব কেবলা সেগুলো সেখানেই রেখে দিতে বললেন। ওয়াজ-নসীহত হলো, সভার কাজ শেষ হলো। খাদ্যাদি এবং টাকা পয়সা কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে জানতে চাইলে তারা জানাল সকলের কাছে চাঁদা ধরে এগুলো আদায় করা হয়েছে। পীর ছাহেব কেবলা চাঁদা দাতাদের সকলের উপার্জন হালাল কিনা সে ব্যাপারে কোন সদুত্তর না পেয়ে সমুদয় হাদিয়া ফেরত দিয়ে দিলেন।

এক জমীদার বাড়িতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা আমন্ত্রিত হন, কিন্তু এই শর্তে দাওয়াত কবুল করেন যে, তিনি সেখানে শুধুমাত্র ওয়াজ নসীহত করবেন, এক গ্লাস সরবতও গ্রহণ করবেন না। সভাশেষে বৃষ্টি শুরু হলো। তারই মাঝে কষ্ট করে পাঁচ মাইল হেঁটে পীর ছাহেব কেবলা আপন বজরায় ফিরে এলেন। বজরায় খাওয়া দাওয়ার তেমন কোন বন্দোবস্ত ছিলনা বলে হুজুর কেবলা সকলকে নিয়ে শুধুমাত্র চিড়া খেয়ে রাত্রি যাপন করলেন। বর্তমানে এরূপ ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হলেও পীর ছাহেব কেবলার জীবনে এগুলো নিত্য নৈমিত্তিক ছিল। কোন কোন স্থানে এরূপ হয়েছে যে, পীর ছাহেব কেবলা দাওয়াতকারীদেরকে প্রথমে ভাল মনে করে এবং তাদের উপার্জন হালাল জেনে তাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেছেন। কিন্তু পরে জেনেছেন দাওয়াতকারীর আমলে শরীয়তের বিচারে অনেক ত্র“টি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে পীর ছাহেব কেবলা তাকে ডেকে সমুদয় খানার মূল্য হিসেব করে তাকে দিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, “আপনার খানা খরিদ করিয়া খাইলাম। আপনি যদি আপনার ত্র“টিগুলো সংশোধন করিতে পারেন, তবে আপনার নিকট আমার এই প্রদত্ত টাকা ফেরত লইব, নইলে নয়”। যাইহোক, এইরূপ শত শত ঘটনা মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনে ঘটেছে। সেগুলো উলে-খ করা এখানে সম্ভব নয়। তিনি কয়েক শ্রেণীর লোকের দাওয়াত ও হাদিয়া কোনদিন গ্রহণ করেননি। কারণ তাদের পেশা সম্পর্কে পীর ছাহেব কেবলা নিশ্চিত হতে পারেননি। এইসব লোকদের মাঝে অনেকেই তাঁর মুরীদও ছিলেন।

আজ সমাজ অনেকটাই ধর্মবিমুখ হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণীর লোক ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং আলেম সমাজকে নানা ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এর উপর

তথাকথিত কিছু লোভী আলেম এবং নামধারী পীর ছাহেবদের মাঝে তাহকীক না করে নির্দ্বিধায় হাদিয়া গ্রহণের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে এতে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে ঢালাও ভাবে অশুভ তৎপরতা চালানোর ব্যাপারে ইসলাম বিদ্বেষীদের জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে একদিকে তাদের লিল াহিয়াতের অভাবে মানুষ প্রকৃত হেদায়েত পায়না, অপর দিকে তাদের লোভ লালসার দরুন নিজেরাই নিজেদের মর্যাদাকে বহুলাংশে ক্ষুণœ করছে। মানুষের হেদায়েত এবং সমাজে নিজেদের মান-ইজ্জত অক্ষুণœ রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আমীরানা ভাব বজায় রাখতে অনুরোধ করছি।

তরীকার তা'লীমের ব্যবস্থা

আল্লাহ ও রাসূল (দঃ)-এর মহব্বত অর্জন ছাড়া কেউ শরীয়ত অনুযায়ী পূর্ণভাবে আমল করতে পারেনা। যার অন্তরে যতটুকু মহব্বত আছে সে সেই পরিমাণই আমল করতে সক্ষম হয়। পূর্বে উলেখ করা হয়েছে যে, এই মহব্বত অর্জনের জন্য শুধু বাহ্যিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, এর সাথে জিকির আজকার, মোরাকাবা- মোশাহাদা করে তরীকা মশ্ক করা আবশ্যক। এই জন্যই হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা লোকদিগকে আমভাবে মুরীদ করে তরীকার তা'লীম দিতেন। হুজুরের হাতে বয়াত হওয়ার সাথে সাথে পাষাণ হৃদয়ও আলাহ্ রাসূল (দঃ)-এর মহব্বতে বিগলিত হয়ে পড়ত। তিনি তাদেরকে প্রাথমিক জিকির অজীফা শিক্ষা দিতেন এবং নামাজ-রোজা সঠিকভাবে আদায় করার জন্য সতর্ক করে দিতেন। হুজুর কেবলার অতি অল্প সময়ের সামান্য নসীহতেও শ্রবণকারীর অন্তর গোনাহ্ হতে বিমুখ হয়ে যেতো এবং নেক আমল করার সামর্থ অর্জন করত। "মুহূর্তকাল কোন ওলী লোকের সঙ্গলাভ রিয়াহীন শত বছরের ইবাদতের চাইতেও উত্তম", যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারাই জানেন হুজুর কেবলা এ কথার কেমন জ্বলন্ত নিদর্শন ছিলেন।

ছফরে ও বাড়িতে সব সময়ই তিনি তরীকার তা'লীম দিতেন। যখন বাড়িতে থাকতেন, তখনও শত শত লোক তাঁর কাছে তরীকা শিক্ষা করতে আসতেন। তরীকার তা'লীমের সাথে তিনি তাদেরকে মছলা মাছায়েল শিক্ষা দিতেন। হুজুর কেবলা তাঁর মুরীদানদিগকে দ্বীনী মাসলা মাসায়েল ও তরীকার ছবকাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন সাপ্তাহিক বা মাসিক জিকির ও তা'লীমী মজলিসের ব্যবস্থা করেছিলেন। এর সংখ্যাও কম পক্ষে কয়েক হাজার হবে। চারি তরীকায় ছনদ প্রাপ্ত হুজুর কেবলার খলিফাগণ তাঁর নির্দেশ মোতাবেক এইসব মজলিসে উপস্থিত হয়ে লোকজনকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। পীর ছাহেব কেবলা প্রায়ই বলতেন, "কোন পীর যদি তাহার মুরীদানদিগকে তা'লীম দেওয়ার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন তবে তাহাকে কেয়ামতের দিন তাহার মুরীদানের জন্য দায়ী হইতে হইবে"। বস্তুতঃ তিনি আজীবন কষ্ট স্বীকার করে মুরীদানকে এমনিভাবে তা'লীম তাওয়াজ্জুহ দিয়েছেন বলেই আজ বাংলার সর্বত্র ইসলাম জারী রয়েছে। অসংখ্য আলেম, হাদী, ওলী পয়দা হয়েছে।

পীর ছাহেব কেবলার দৈনিক কর্মসূচী

কর্মসূচী কেন ?

আল্লাহ পাক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীতে তাঁর সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করাই হ'ল মানুষের কাজ। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তদুপরি শয়তান মানুষের প্রধান শত্র"। সে মানুষকে বিপথগামী করার জন্য তার চলার পথে সদাসর্বদা ওঁৎ পেতে বসে আছে। তাই মানুষ যদি বিশেষভাবে সময় সচেতন এবং সতর্ক না হয়, দৈনন্দিন কাজগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে, তবে সে পথহারা হতে বাধ্য, জীবনের সাফল্য অর্জন তার জন্য অসম্ভব।

মানুষের পেশা,পারিপার্শ্বিকতা, রুচি, আদর্শ ইত্যাদি ভিন্ন হওয়ার দরুন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি মানুষের কাজের ধারাও ভিন্ন। শুধু তাই নয়, একই মানুষ প্রতিদিন একই কাজ করবে- এ ধারণাও অবাস্তব। কারণ মানুষ কাজ করে কোন না কোন প্রয়োজনে এবং নিত্যকার প্রয়োজন কারও কখনও এক হতে পারেনা। তবে যেহেতু মুসলমানের জীবন দর্শন এবং উদ্দেশ্য আল-াহ কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে, তাই সময়, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদির বিভিন্নতা সত্তে¡ও তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীর মূল কাঠামো (*Basic Structure*) কখনও ভিন্ন হতে পারেনা। পুরুষ কিংবা মেয়ে হোক, আফ্রিকাবাসী বা বাংলাদেশী হোক, বর্তমান বা ভবিষ্যতের হোক- যদি তারা মুসলমান হয়, তবে তাদের মূল জীবন-বিন্যাস অবশ্যই এক হতে হবে, সকলের দৈনন্দিন কাজের মূল কাঠামো একমাত্র আল-াহ-রাসূলের অনুমোদিত ছাঁচেই তৈরী হতে হবে। প্রতিটি মুসলমানের উচিত এই মূল কাঠামো অক্ষুণœ রেখে নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে দৈনন্দিন কাজের একটি সুন্দর কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং সেটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা। তবেই সে কখনও বিপথগামী হবেনা। এই কর্মসূচীর মাধ্যমেই সে নিজের কাজগুলোকে মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পাবে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কাজের পরিধি ছিল ব্যাপক। মাদরাসা পরিচালনা, তা'লীম, সংগঠন, রাজনীতি, ওয়াজ-নসীহত, জনসেবা ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কাজের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তাই একদিকে যেমন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী নির্দিষ্ট কোন তালিকা দিয়ে গণ্ডীবদ্ধ করা অসম্ভব, অন্যদিকে অপরের জন্যও তাঁর কর্মসূচী হুবহু পালন করা সম্ভব নয়। মূলতঃ এর প্রয়োজনীয়তাও নেই। যেটি দরকার সেটি হল- এক, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁর কর্মসূচীর কাঠামোটিকে আল-াহ-রাসূলের নির্দেশমালার সাথে কী করে এত গভীরভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন, সেটি লক্ষ্য করা; দুই, তাঁর কর্মসূচীর কোন্ বিশেষ দিকগুলোর উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা নিরূপণ করা। তাহলেই স্ব স্ব অবস্থানে থেকেও আল্লাহ-রাসূল অনুমোদিত জীবন কাঠামোর মাঝে নিজ নিজ করণীয় কাজগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষ্ঠু কর্মসূচী প্রণয়ন করা আমাদের জন্য সহজ হবে। এই কর্মসূচীই হবে আমাদের নিত্যদিনের সাথী, চলার পথে সঠিক দিশারী।

দৈনন্দিন কাজের মোটামুটি বিবরণ ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার বিশাল কর্মপরিসরের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র পাঠকবর্গের উৎসাহ নিরসনের জন্য তাঁর দৈনিক কর্মসূচীর সাধারণ একটি বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ভোরবেলা জামায়াতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করার পর এশরাক পর্যন্ত মোরাকাবাসহ অজীফা আদায় করতেন। হাদীস মতে এটি একটি মোবারক সময়, এ সময় আল -াহর ধ্যানে মগ্ন থাকা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা অথবা অপরকে তা'লীম দেওয়ার চাইতেও উত্তম। এতে অন্তরে অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের মহব্বত সৃষ্টি হয়, আমলনামায় হজ্জ ওমরার ছওয়াব লিখিত হয়। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বাড়িতে, ছফরে, দেশে-বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, সুস্থ অবস্থায় জীবনে কখনও এই আমলের ব্যতিক্রম করেন নি।

এশরাকের পর পুনরায় তিনি মোরাকাবায় বসতেন। বেলা ৮টা- ৯টার পর বাড়িতে থাকলে কুতুবখানার বারান্দায় অথবা ছফরে গেলে যেখানে থাকতেন সেখানেই লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতেন। ধর্মীয় অথবা সাংসারিক বিভিন্ন সমস্যা লয়ে প্রতিদিন অনবরত লোকজন তাঁর কাছে আসত। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য সহকারে তিনি তাদের কথা শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন। সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিত। উলে-খ্য যে, মরহুম হুজুরের এই আমলটি হুজুর পাক (দঃ)-এর আমলেরই পূর্ণ অনুকরণ। মানুষকে উপদেশ দিয়ে খুশী করা একটি বিশেষ ইবাদত। যাই হোক, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ঐ সময় মাঝে মাঝে উদ্ভুত কোন সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ প্রদান, বিভিন্ন চিঠি পত্রের জওয়াব, কিতাব

পড়া, কুরআন শরীফ ও দালায়েল খায়রাত তেলাওয়াত ইত্যাদি কাজগুলোও সমাধা করতেন। ওয়াক্ত হলে চাশতের নামাজ আদায় করতেন।

এগারটা হতে বারোটার মধ্যে সাধারণতঃ মুসাফিরখানায় উপস্থিত মেহমানদের খাবার শেষ হত। এরপর তিনি নিজে আহার করতেন। খাবার শেষ করে তছবীহ্ হাতে জেকেরসহ কায়লুলার নিয়তে তিনি সামান্য সময় শয়ন শোতেন। তখনও মনে হত তিনি যেন মানসিকভাবে অন্য চিন্তায় বিভোর রয়েছেন। সেই সময় তাঁর সম্মুখে রাখা ঘড়ি দেখে জোহরের নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেন। দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে জোহরের নামাজ শেষ করে এক- দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত মোরাকাবায় কাটাতেন। এরপর মাঝে মাঝে তিনি পুনরায় কুরআন শরীফ ও দালায়েলে খায়রাত তেলাওয়াত করতেন। এছাড়াও এ সময়টিতে দরবারের লোকজনদের সাথে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত। আছরের পর নিজের এবং দরবারের অন্যান্য কাজ সমাধা করতেন। এসবের মাঝেও অন্দর মহলে গিয়ে ঘর-সংসারের খোঁজ-খবর এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

মাগরিবের নামাজ আদায় করে যথারীতি ছালাতুল আওয়াবীন পড়তেন। এটি তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই। হাদীসে আছে- আওয়াবীনের নামাজ পড়লে বার বছরের ছগীরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এরপর দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত জিকিরের মজলিসে বসে তরীকার ছবক দিতেন। সাধারণতঃ এই সময়ই বেশি সংখ্যক লোক হুজুরের সাথে বসে জিকির করত এবং তাঁর কাছ থেকে তরীকা বিষয়ক শিক্ষা নিত। এরপর এশার নামাজের আজান হত। আজানের পরই সাধারণতঃ দীর্ঘ মুনাজাত হত। যারা তাঁর মুনাজাতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তারা জানেন এই মুনাজাত কত হৃদয়স্পর্শী হত। মানুষ কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে পড়ত। আল াহর রহমত, মাগফেরাতের আশায় তাদের এই ক্রন্দনে মনে হত আশেপাশের পরিবেশ পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। হুজুর কেবলা বলতেন- "বাবারা, মুনাজাতের মধ্যে যে কি রহস্য আছে তা যদি তোমরা জানতে তবে সারাদিন আল াহর দরবারে হাত তুলে থাকতে"। মুনাজাতের পর পরই এশার নামাজ পড়া হত। এরপর যথারীতি দরূদ শরীফের অজিফা শেষ করে সকলের খাওয়া-দাওয়ার হুকুম দিতেন। সকলের খাওয়া শেষ হলে তিনি আহার করতেন।

সাধারণতঃ রাত এগারটা হতে বারেটার মধ্যে তছবীহ হাতে তিনি বিছানায় যেতেন। এর মধ্যে কোন মুসাফির এসে পড়লে তাকে কাছে নিয়ে তার কথা শুনে, তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। কোন কারণে রাত বেশি হলে হুজুরের খেদমতে যিনি থাকতেন তাকে এই বলে বিদায় দিতেন- 'বাবা যান, এখন গিয়ে আরাম করুন'।

দরবারের মরহুম মুফতী আবদুল মজিদ ছাহেব বলেন- সকলকে বিদায় দিয়ে হুজুর বিছানায় যেতেন সত্যি কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই আবার উঠে বসে একাকী মোরাকাবায় লিপ্ত হতেন। আল াহর ধ্যানে মগ্ন থাকা কত শান্তিদায়ক এটা হুজুর কেবলাকে লক্ষ্য করলে বুঝা যেত। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষ যেখানে বিশ্রাম করে ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করে শান্তি পেতে চায়, সেখানে আল াহর প্রেমিকগণ সকল আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করে বসে বসে চক্ষু বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আল াহর ধ্যানে লিপ্ত থেকে অনাবিল মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন।

ঘুমাতে যাওয়ার সময় সামনে একটি ঘড়ি রাখতেন- এবং যথাসময়ে ঘুম হতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। তিনি বলতেন- তাহাজ্জুদ না পড়ে কোন লোক কামেল হতে পারেনা। বাস্তবিকই আরামের ঘুম পরিত্যাগ করে আল াহর রহমতের আশায় যে বান্দারা আল াহর ইবাদতে মশগুল থাকে তারা কত ভাগ্যবান। চারিদিক নিস্তব্ধ, সবাই ঘুমে অচেতন এই সময়ে নিভৃতে স্রষ্টার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে বান্দা তার দোজাহানের মঙ্গল কামনায় বিভোর- কী অপূর্ব এই ক্ষণ! কী মহিমাময় এ দৃশ্য! নামাজের পর হুজুর কেবলা যখন দীর্ঘ সময় ধরে দু'হাত তুলে মুনাজাত করতেন, তখন চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ত এবং বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিত।

তাহাজ্জুদ নামাজের পর সময় থাকলে মোরাকাবা করতেন, আবার কখনও কখনও একটু নিদ্রা যেতেন, তাও ক্ষণিকের জন্য। এরপর চলত ফজরের নামাজের প্রস্তুতি। আজান হলে অজু করে মসজিদে চলে যেতেন। যারা তখনও ঘুমিয়ে থাকত তাদেরকে জাগিয়ে জামায়াতে শরীক হওয়ার ব্যবস্থা নিতেন।

উপরে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দৈনিক কর্মসূচীর একটি সামান্য আভাস দেয়া হল মাত্র। এই কর্মসূচীর মাঝেই পরিচালিত তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ড- যেমন মাদরাসার কাজ, পরোক্ষ রাজনীতি, তাবলীগী সফর, কিতাব প্রণয়ন ইত্যাদি। এখানে সেগুলো উলে-খ করা সম্ভব নয়। পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে সে গুলোর বিভিন্ন দিক বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমলের বিশেষ লক্ষণীয় দিকগুলো ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বাড়িতে হোক, ছফরে হোক, শত ঝামেলা এবং ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর দৈনিক কর্মসূচীর বিশেষ করণীয় দিকগুলো পালন করতে কখনও গাফলতি করেননি। সারাটি জীবন এমনিভাবে একটি রুটিন-এর মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিচালিত করা সহজ কথা নহে। যাই হোক, এই অংশে হুজুর কেবলার আমলের শিক্ষণীয় তিনটি বিশেষ দিক অনুকরণের জন্য পাঠকের সামনে তুলে ধরছি ঃ

সদাসর্বদা আল্লাহর স্মরণে থাকা ঃ

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন ঃ বেহেশ্তবাসীদের মন সকল প্রকার ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে। তবে তাদের শুধুমাত্র একটি আফসোস থাকবে-জীবনের অনেকগুলো মুহূর্ত কেন তারা বৃথা ব্যয় করেছিল? এজন্যই ওলী আল াহদের জীবন চরিত পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁরা বিশেষভাবে সতর্ক থাকেন যেন একটি মুহূর্তও তাঁরা আল াহর স্মরণ থেকে গাফেল না হন।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনের দিকে তাকালে বুঝা যায়- কম্পাসের কাটাটি যেমন সারাক্ষণ উত্তর দিকে তাক্ করা থাকে, তেমনি শত কাজের ভীড়ের মাঝেও তাঁর অন্তরটি আল াহ্ পাকের স্মরণে পরিব্যপ্ত থাকত। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারাই জানেন কত উচ্চ পর্যায়ের 'এনাবত' তাঁর হাছিল ছিল। তিনি প্রায়ই নসীহত করতেন ঃ 'আল াহ পাকের যাবতীয় নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। সকল নেয়ামতের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। তাই প্রতিটি মানবের হামেশা 'পাছ-আনপাছ' বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে জিকিরে মশগুল থাকা আবশ্যক, যেন একটি মুহূর্তও আল াহর জিকিরবিহীন অতিবাহিত না হয়'।

গীবত, বেহুদা কথা অথবা হাসি-তামাসায় লিপ্ত থেকে সময়ের বৃথা অপচয় করা থেকে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিতেন। তিনি বলতেন, "কথা তিন প্রকারঃ এক, এমন কথা, যা বললে ছওয়াব হয়, সেটি ডান কাঁধের ফেরেশতা লিখে থাকেন; দুই, এমন কথা, যা বললে গোনাহ হয়, সেটি বাম কাঁধের ফেরেশতা লিখে থাকেন; তিন, এমন কথা, যা বললে ছওয়াব বা গোনাহ কিছুই হয়না, এটিও বাম কাঁধের ফেরেশতা লিখে থাকেন। অর্থাৎ, ঐ মুহূর্তের আমলটুকু মানুষের লাভের খাতায় লিখা হয়না, যা মূলতঃ তার জন্য ক্ষতিই হল।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দৈনন্দিন জীবনে এমন কোন দৃষ্টান্ত কেউ খুঁজে পাবেনা, যেখানে আল াহ-রাসূলের নির্দেশের বহির্ভূত কোন কাজে স্বেচ্ছায় তিনি এক মুহূর্তও লিপ্ত ছিলেন। সাধারণভাবে একথাটি অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। এখানে একটি মাত্র কথাই উলে-খ করতে চাই- আল াহ্র ইবাদত করে করে যারা আল াহর নৈকট্য লাভ করেছেন, আল াহর মহব্বতে যাদের অন্তর চিরউদ্ভাসিত, তাঁদের পক্ষে এক মুহূর্তও আল াহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকা কষ্টকর।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এই আমলটিকে সামনে রেখে আমরা যদি আমাদের কাজের মূল্যায়ন করি তাহলে আমাদের দৈন্য সহজেই ধরা পড়বে। বেহুদা কথাবার্তা, গল্প-গুজব, পরনিন্দা ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকে আমাদের আমলনামায় মন্দ দিকটি আমরা কতটুকু ভারী করে তুলছি, সেদিকে আমাদের খেয়াল নেই।

দৈনিক কর্মসূচীর নিয়মিত অনুশীলন ঃ

কোন আমল থেকে সত্যিকার উপকার পেতে হলে নিয়মিত অনুশীলনের বিকল্প নেই। হাদীসে আছে- ছোট আমলও যদি নিয়মিত করা যায়, এর মূল্য অনেক বেশি। কোন আমল যথারীতি এবং নিয়মিত অনুশীলন না করলে সেটির প্রতি মনের সংযোগ দৃঢ় হয়না, আগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হয়না। ফলে অনেক সময়ই সেটি কিছুদিন পরই পালন করা আর সম্ভব হয়না।

হযরত পীর ছাহেব কেবলা সকল অবস্থাতেই তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোর নজীরবিহীন নিয়মিত অনুশীলন করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি কথা এখানে পুনরায় তুলে ধরছিঃ 'বাবা, তোমরা অজীফা আদায়ের সময় পাওনা। আল াহর শোকর, পঞ্চাশ বছরের মাঝে দুনিয়ার কোন কাজ, কোন প্রয়োজন আমার দৈনন্দিন অজীফা আদায় থেকে আমায় কোনদিন বিরত রাখতে পারেনি'। সুবহানাল াহ্! আমলে এরূপ দৃঢ়তা না থাকলে কোন মানুষ কখনও বড় হতে পারেনা।

কোন কাজের নিয়মিত অনুশীলনে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার যে একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা ছিল আমাদের মাঝে তার বড় অভাব। এজন্যই আমাদের কোন কাজ বা ইবাদতে আমরা আশানুরুপফল লাভ করতে পারিনা।

কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ ঃ

যে কোন কর্মসূচী থেকে সফলতা লাভের একটি অপরিহার্য শর্ত হল করণীয় কাজগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ এবং তদনুযায়ী আমল করা। এর অভাবেই আমাদের অনেক বড় বড় কর্মসূচীও যথাযথ ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এই সূ² বিষয়টি শুধু অনুধাবনই করেননি, অত্যন্ত সতর্কতা এবং দৃঢ়তার সাথে এটি নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা নিম্নে দেয়া হলঃ

একবার ঢাকা হতে একজন ধনী লোক ছারছীনা এসে হুজুরকে বলল- 'আমি বহু কষ্ট করে একটি তাবীজের জন্য আপনার কাছে এসেছি, আমাকে একটি তাবীজ দিন'। হুজুর বললেন, 'বাবা, আমার তাবীজ লেখার সময় নেই। এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাকে করতে হয়- যেমন কিতাব দেখা, লোক হেদায়েত করা ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে তাবীজ লেখা ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাবীজ লেখার জন্য মুফতী ছাহেবকে এজাযত দিয়েছি। সকলে তার কাছ থেকেই তাবীজ নেয়'। লোকটি উত্তর করল- 'হুজুর, যতদিন লাগে আমার নিজ খরচে থাকব, খাবার খাব, তবুও আপনার কাছ থেকেই তাবীজ নিতে চাই'। মরহুম হুজুর তখন জওয়াব দিলেন- 'বাবা, একশত বছরও যদি আপনি থাকেন, তবুও আমি আপনাকে তাবীজ দিতে পারবনা, কারণ যতক্ষণ আমি তাবীজ লিখব, ততক্ষণ কিতাব দেখে দ্বীনী মাসয়ালা লিখে দিলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান উপকৃত হবে'। একথা শুনে লোকটি মুফতী ছাহেবের কাছ থেকেই তাবীজ নিল। কারও কারও কাছে ঘটনাটি হয়ত কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, তবে এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে সময়ের মূল্য এবং কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী সময়ের ব্যবহার- এ দুটো বিষয়ের প্রতি মরহুম হুজুরের যে দুর্লভ মন-মানসিকতার পরিচয় মিলে, সেটি যে সুধীজনের কাছে আদৃত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রতিটি কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে যেটি প্রয়োজন, সেটি হল একটি সময়সূচী। এ ছাড়া কাজের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় যার ফলে এটি অনেক সময়ই ফলপ্রসূ হয়না। আগেই বলা হয়েছে আমরা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ব্যস্ত থাকি, তাই স্বাভাবিকভাবেই সবার দৈনিক কর্মসূচী

এক হতে পারেনা। তবে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দৈনিক কর্মসূচী থেকে যে শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত, সেটি হলো একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে জীবন গঠনের জন্য আল াহ-রাসূলের অনুমোদিত ছাঁচে নিজের দৈনন্দিন কাজগুলিকে আমরা যেন নিয়ন্ত্রণ করি। তরীকত পন্থীদের জন্য পীরের নির্দেশিত অজীফা যথারীতি আদায় করে প্রতিটি কথা ও কাজ পীরের হুকুমের সাথে সঙ্গতি রেখে নিয়ন্ত্রণ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলেই একটি সুন্দর দৈনন্দিন কর্মসূচী আপনা থেকে গড়ে উঠবে। আল াহ পাক আমাদের সকলকে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আর্দশ সামনে রেখে আমাদের প্রতিটি কাজের গুরুত্ব নিরূপণ করে, সুপরিকল্পিত একটি কর্মসূচীর নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে সদাসর্বদা আল াহকে স্মরণে রেখে জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন- এই কামনা করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

জিকির-আজকার, মোরাকাবা-মোশাহাদা াঃ

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা স্বীয় পীরের নির্দেশ মোতাবেক জিকির-আজকার, মোরাকাবা- মোশাহাদা এমনকি নফল ইবাদতেও কখনও শিথিলতা করেননি। কঠিন রুগ্ন অবস্থায়ও তিনি নিয়মিতভাবে অজীফা আদায় করতেন। একবার নসীহত প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন াঃ 'বাবারা, আমি যখন ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হয়ে কয়েকমাস পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম, ওঠা-বসা ও কথাবার্তা বলতেও অসমর্থ হয়েছিলাম, আল াহর শোকর, তখনও আমি নিয়মিতভাবে জিকির, অজীফা ও মোরাকাবা আদায় করতে বিন্দুমাত্র ত্র"টি করিনাই।'

মলফুজাতে নেছারিয়া প্রথম খণ্ডে উলে-খ আছে -হুজুর কেবলা বলেনঃ 'যে ব্যক্তি আল াহর উপর ভরসা করে তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকে, আল াহপাক নিজ অনুগ্রহে তার সমস্ত কাজ সমাধা করে দেন'। কুরআন পাকের এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

'এখানে বলা হয়েছে, 'আমি আমার যাবতীয় কার্যাদি আল াহ তা'য়ালার উপর সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাগণের সকল অবস্থায়-ই দর্শন করেন।' চিন্তা করুন। যখন আল াহতা'লা আমাদের যাবতীয় অবস্থা দর্শন করেন তখন আর আমাদের চিন্তা কিসের? তাই তাঁর উপর সোপর্দ করে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন থাকবেন, তিনি সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন।' এ প্রসঙ্গে নসীহতের জন্য তিনি নিজের একটি ঘটনা উলে-খ করেনঃ

কোন এক সময় একদল লোক মরহুম পীর ছাহেব কেবলার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তদন্তের জন্য একজন ডেপুটি সা'ব তাঁর বাড়িতে আসেন। বাইরের ঘরে গোলমাল হয় বলে বাড়ির ভিতরে হুজরায় তিনি সেই সময় মোরাকাবায় মগ্ন ছিলেন। বিপক্ষদলের কথা শোনার পর ডেপুটি সাহেব মরহুম পীর ছাহেবকে ডেকে পাঠান। তিনি কিন্তু ডেপুটি সাহেবের তলব উপেক্ষা করে সমস্যার সমাধান আল াহর উপর সোপর্দ করে পূর্বের ন্যায় তাঁর মোরাকাবার কাজ চালিয়ে যান। মোরাকাবা শেষ করে যখন তিনি বেরিয়ে আসেন তখন ডেপুটি সাহেব চলে গেছেন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে বলল- ডেপুটি সাহেব যখন জানলেন পীর ছাহেব (রঃ) ইবাদতে মশগুল আছেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'যে নেককার ব্যক্তি এখন পর্যন্ত ইবাদত ও মোরাকাবায় মশগুল আছেন তাঁকে অভিযুক্ত করা ও দোষী সাব্যস্ত করা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না, আমি চললাম। মাওলানা সাহেবের নিকট আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম জানাবেন এবং বলবেন তিনি অবসর মত আমাকে সংবাদ দিলে আমি স্বয়ং এসে তাঁর মোকদ্দমা ফয়সালা করে দিয়ে যাব'।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা একবার ছারছীনা মাদরাসার মুদাররিছ ফখরে বাংগাল মরহুম আবদুল আওয়াল ছাহেবকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ বাবারা তোমরা আলেমগণ সকালে ও সন্ধ্যায় জিকির-মোরাকাবা করার সময় পাওনা? আমি নেছারউদ্দীন আজ ৫৫ বৎসর আগে ফুরফুরা শরীফে মুরীদ হয়েছি, অথচ এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে দুনিয়ার কোন ঝামেলা আমাকে সকাল ও সন্ধ্যায় আল াহর ধ্যানে বসা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সুবহানাল াহ!

মৌকরার পীর ছাহেব হযরত মাওলানা ওয়ালিউল াহ ছাহেব বলেনঃ যে লোকটি হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার গরু-ছাগল চড়াত তার নাম কালু খাঁ। সে একদিন মসজিদের দক্ষিণে একটি গাভী চড়াচ্ছিল। তার দিকে ইঙ্গিত করে হুজুর কেবলা দরবারে উপস্থিত আলেম ও মুদাররিছ ছাহেবদের উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমরা জিকিরের সময় পাওনা, ঐ দেখ কালু খাঁ, আমার গরু-ছাগল চড়ায়, হাট-বাজার করে- কিন্তু এর ভিতরও সে দৈনিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বার জিকির করে।

উক্ত মাওলানা ছাহেব আরও বলেনঃ প্রথম দিকে আমি নির্জন জায়গায় গিয়ে জিকির-মোরাকাবা করতাম; দেখতাম আমার মাথা গরম হয়ে যেত। হুজুরকে এ কথা জানালে তিনি বললেন- যে জিকির তোমার মাথা গরম করেছে, সেই জিকিরই তোমার মাথা ঠাণ্ডা করবে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা একদা বলেছিলেনঃ বাবারা, জমিন যেমন সাত চাষ ছাড়া আবাদের উপযুক্ত হয় না, তদ্রƒপ কলবও দৈনিক ১৫০০ বার নফি এছবাতের কমে মা'রেফাতের উপযোগী হয় না।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তরীকা শিক্ষা করে এত উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন যে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবেনা। একই ছেলছেলার মুরীদ হয়েও আমরা অনেকেই তরীকার সুফল দেখতে পাইনা। এর প্রধানতম কারণ হল আমরা যথাসময়ে মোরাকাবা- মোশাহাদা করি না। নিজেদের খেয়াল-খুশীমত যখন ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা অনুশীলন করে উন্নতির আশা করি। এটি কখনও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে মুফতি মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেবের একটি ভাষণের আংশিক তুলে ধরছিঃ

পীর একটি দরিয়াসদৃশ এবং মুরীদ পুকুর সমতুল্য। দরিয়ায় পানির অভাব নেই বটে কিন্তু ঐ পানি পুকুরে নিতে হলে নালা কাটা অথবা পাইপ লাগান প্রয়োজন। এইরূপে পীরের নিকট হতে ফায়েজ গ্রহণ করতে হলে পীরের প্রতি মুরীদের অটল ভক্তি এবং ফরমাবরদারী থাকা প্রয়োজন- যেমন পীর মুরীদকে হুকুম করলেন যে, ফজর ও মাগরীব বাদ কিছু সময় জিকির করো। মুরীদ যদি তা না করে তবে ফায়েজ ও তাছীর কিভাবে লাভ করবে? রেডিও কেন্দ্র হতে নির্দিষ্ট সময় খবর পরিবেশিত হয়। আপনার কাছে রেডিও আছে। আপনি সেটি ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছেন কিন্তু প্রোগ্রাম অনুযায়ী সময়মত সেটি খুলবেন না- আপনি কি খবর শুনতে পাবেন? পাবেন না। ঠিক তদ্রƒপ আপনি আপনার কলব খুলে বসলেন না। কি করে ফায়েজ ও তাছীর লাভ করবেন? তাই বলি, আপনারা নির্ধারিত সময়ে আপন পীরের নির্ধারিত অজীফা আদায় করবেন। কোন বিশেষ ওজরবশতঃ ফওত হয়ে গেলে কাজা করে নিবেন। ইনশা-আল াহ অতি অল্প পরিশ্রমেই আল াহর মহব্বত লাভ করতে পারবেন।

ইবাদত ওবরা কাজ, কাজ ওবরা ইবাদত নয় ঃ

যে কাজে মানুষ যত বেশি গুরুত্ব প্রদান করে সে কাজে সে তত বেশি ফল লাভ করে। আমরা ইবাদতের চাইতে সাংসারিক কাজ-কর্মের দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি; তাই ইবাদতের প্রভাব আমাদের মাঝে কমই লক্ষ্য করা যায়। পীর ছাহেব কেবলা প্রায়ই বলতেনঃ বাবা, কাজ ওবরা ইবাদত করনা, ইবাদত ওবরা কাজ করো- সফলকাম হবে। এর অর্থ হল- সাংসারিক সকল কাজ সম্পন্ন করার পর ইবাদত না করে যথাসময়ে ইবাদত সম্পন্ন করার পর বাকী সময়টিতে সাংসারিক কাজ করতে হবে। তিনি সারা জীবন এই কথার উপর আমল করতেন। এখানে হযরত মাওলানা শরীফ সিরাজুল হক ছাহেবের কাছ থেকে শোনা একটি ছোট্ট ঘটনা উলে-খ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করবঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা রাতে অতি সামান্যই ঘুমাতেন। প্রায় সারা রাতই ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। বার্ধক্য কালে হুজুরের শারীরিক অবস্থা লক্ষ্য করে ডাক্তার তাঁকে রাতে ঘুম নষ্ট না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু হুজুর কেবলা কিছুতেই ইবাদত কম করতে রাজী হননি। একদিন ফজরের নামাজের পর মাওলানা শরীফ সিরাজুল হক ছাহেব হুজুরের কাছে গিয়ে দেখলেন

ঘুম কম হওয়ার দরুণ তাঁর শরীর অবসন্ন, চোখ দুটো লাল। মাওলানা সিরাজুল হক ছাহেব মহব্বতের জোশে খানিকটা উচ্চ স্বরে হুজুর কেবলাকে বললেনঃ আপনি ঘুম নষ্ট করে শরীর দুর্বল করেন কেন? সারা জীবন আপনি কঠিনভাবে ইবাদত করেছেন, এখন রোগজনিত কারণে পারছেন না, তাতে ত কোন অসুবিধা হবেনা। কুরআন পাকে রয়েছে- 'লাহুম আজরুন গায়রু মামনূন'- অর্থাৎ, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস রয়েছে। সেটি হলঃ যারা যৌবনকালে অথবা সুস্থ অবস্থায় যে সমস্ত ইবাদত বন্দেগী করেন তারা বার্ধক্য অথবা রোগের কারণে যদি ঐ সমস্ত ইবাদত চালাতে অসমর্থ হয় তবে কেরামান-কাতেবীনকে বলা হবে- তোমরা তার ঐ ইবাদতগুলো পুরা করে তার আমল নামায় লিখে দাও। হুজুর বললেনঃ কিতাব দেখাও। যখন তাঁকে কিতাব দেখানো হলো, তখন তিনি আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু বললেনঃ বাবা, মন ত মানে না। সুবহানাল াহ! আল াহর ওলীদের মন-মানসিকতা কতো ভিন্নতর! হুজুর কেবলার এ কথাটি আমাদেরকে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর একটি উক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। যখন হুজুর (দঃ) কে বলা হলো- হুজুর, আপনার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়ে আপনাকে ত বেহেস্তের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। আপনার ইবাদতের জন্য এত পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? হুজুর (দঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি কি শোকরকারী বান্দা হব না?'

পর্দার অনুশীলনে পীর ছাহেব কেবলা

পীর ছাহেব কেবলার জীবনের একটি উলে-খযোগ্য দিক হলো পর্দার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন। কুরআন হাদীসের কথাগুলো তিনি যে সতর্কতার সাথে অনুশীলন করতেন ভাবতে বিস্ময় লাগে। নামাজ-রোজার মত পর্দা রক্ষা করাও যে শরীয়তের একটি অবশ্য করণীয় বিধান- এ কথাটি তাঁর অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল ছিল এবং সেটি যথাযথভাবে পালন করতে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র কসুর করেননি।

তাঁর বাড়িতে ভিন্ন পুরুষ যাওয়া ত দূরের কথা, ছোট ছোট মেয়ে, এমনকি ভিক্ষুক মেয়েলোককে পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। হুজুর কেবলার কন্যাগণও হুজুরের সামনে বিশেষ সতর্কতার সাথে আসতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কোন কোন মেয়েলোককে সামনাসামনি বয়াত করাতেন না। কেহ মুরীদ হতে চাইলে পূর্ণ পর্দার সাথে তাকে তৌবা করাতেন এবং তার কোন ওলী ও মোহাররামের মারফত ছবকাদি শিক্ষা দিতেন। আজ বহু ভণ্ড পীরের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের দরবারে মেয়ে পুরুষের কোন বাছ-বিচার নেই। একত্রে বসে জিকির করে, লাফালাফি করে, ঢলাঢলি করে। অনেকে এটাকে শুধু জায়েজই মনে করে না, এই প্রক্রিয়াকে বাতেনী উন্নতির সহায়ক বলে গণ্য করে। নাউজুবিল্লাহ এইসব নামধারী পীর জাহেল, জিন্দিক; এরা নিজেরা যেমন জাহান্নামী, অপরকেও তেমনি জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কোন কোন মাহফিলের আশেপাশে ছোট ছোট মেয়েরা অনেক সময় ভীড় করত। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দৃষ্টি তাদের দিকে পতিত হলেই তিনি তাদেরকে সভাস্থল থেকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিতেন। কোন কোন সময় রাগান্বিত হয়ে তিনি বলতেন, "তোমরা যদি পাগলামী করে সভায় বালিকাদের আমদানী কর তবে আমি সভা ভঙ্গ করে চলে যাব"। সভাস্থল থেকে যদি কোন স্থানে মেয়েদের দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত তিনি সেদিকে পর্দা টানিয়ে দিবার নির্দেশ দিতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে তাবলীগী ছফরে অনেক সময় পালকিতে করে নিয়ে যাওয়া হত। তাঁর কথা শুনে মেয়ে লোকেরা পর্যন্ত তাঁকে দেখার জন্য বাড়ির আঙ্গিনায়, উঠানে ও আশেপাশে সকৌতুকে বের হয়ে আসত। এরূপ দৃশ্যের অবতারণা হলে পীর ছাহেব কেবলা সাথে সাথে পালকীর দরজা বন্ধ করে দিতেন।

কিশোর বালকদের সম্পর্কেও তিনি সাবধান ছিলেন। কিশোরদের নমনীয় কচি চেহারা নারী মুখের তুল্য, এতে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। পাপে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে বলে এখানেও তিনি পরহেজ করতেন। ছোট বালিকাদের ব্যাপারেও তিনি বলতেন- এখানেও পরহেজ করা উচিত। অনেকের নিকট হয়ত এসব অতিরিক্ত মনে হতে পারে কিন্তু মরহুম পীর ছাহেব কেবলা যেখানে পাপে পতিত হওয়ার সামান্যতম আশংকা দেখতেন সেখান থেকে নিজেকে কিভাবে সরিয়ে রাখতেন তা লক্ষ্য করার বিষয় বৈ কি·

কোন বেগানা নারীর চেহারা দৃষ্টি পথে পতিত হওয়ার বিন্দুমাত্র আশংকা থাকলে তিনি সেখান থেকে ছুটাছুটি করে পালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় নিতেন। সীরাতে নেছারিয়া গ্রন্থে উলে-খ রয়েছে- একবার ফুরফুরা শরীফ হতে বাড়ি ফিরার সময় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা গাড়ির কামরায় ছিলেন। বরিশাল এক্সপ্রেস, স্বভাবতঃই প্রচুর ভীড়। গাড়ির কামরায় বহু হিন্দু নারী তাদের স্বাভাবিক বেশভ‚ষায় হেলে দুলে ভীড় ঠেলে ঢুকে পড়ল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এ দৃশ্য দেখে এত বিচলিত হয়ে উঠলেন যে মনে হলো তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল চুরি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ট্রেনের কামরা হতে নিচে নেমে গেলেন এবং সেই গাড়িতে তার আর আসা হলনা। পরে তিনি এই ঘটনা উলে-খ করে বলেছিলেন, "জান, আমি টিকিটের এই টাকাগুলো কেন ব্যয় করলাম? উহা আমি আমার নজরের ছদকা দিলাম"।

ওলী আল াহদের অনেক ঘটনাই সাধারণ মানুষের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা উচিত তাদের বিবেক বিবেচনা অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তারা একটি বিষয়কে যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন সাধারণ মানুষ তার কোন হদিস পায়না। উচ্চ পর্যায়ের তাক্ওয়াপ্রসূত আমল সাধারণ মানুষের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিতাবে আছে, একদা পথ চলতে গিয়ে এক ওলী আল্লাহর দৃষ্টি কোন ভিন্ন মেয়েলোকের উপর পতিত হওয়ায় তিনি হুজরায় গিয়ে সিজদায় পড়ে আল াহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, 'ইয়া আল াহ! তুমি আমার চক্ষুদ্বয়কে উঠিয়ে নাও, জ্যোতিহীন করে দাও। তুমি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর না করলে আমি আমার মাথা উত্তোলন করব না'। আল াহ পাক তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। যখন তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতি কমে গিয়েছে, তখন অশেষ শোকরিয়া আদায় করে সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কন্যা হযরত (দঃ) -এর পত্নী হযরত হাফছা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর গৃহে অন্য কেহ আছে কিনা? ভিতর হতে উত্তর এলো- না। হঠাৎ হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি হাদীস স্মরণ হল। হুজুর (দঃ) বলেছেন, "একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক একই গৃহে সমবেত হলে শয়তান এসে তৃতীয় ব্যক্তি হয়"। সাথে সাথে তিনি দিশেহারা হয়ে এমন জোরে দৌঁড় দিলেন যে, দেয়ালের সাথে ধাক্কা লেগে তাঁর কপাল ফেটে রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল। কোন কোন সাহাবা বাড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলো পর্যন্ত নেকড়া দ্বারা বন্ধ করে দিতেন।

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্বকালের ওলী দরবেশগণ ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী যেভাবে পর্দা মেনে চলতেন মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তেমনি কঠোরভাবে পর্দা অনুশীলনের চেষ্টা করতেন। নিজ মুরীদগণকেও তিনি এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন-হাদীসে আছে- তিন ব্যক্তির উপর দোজখের আগুন হারাম করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল- যে নিজ চক্ষুদ্বয়কে অবৈধ দৃষ্টি হতে সংযত রেখেছে।

বর্তমান সময়ে চক্ষু সংযত রাখা বড়ই কঠিন, কেননা মেয়েলোকেরা যেভাবে রাস্তা-ঘাটে, হাটে-মাঠে অবাধে চলাফেরা করছে তাতে চক্ষুদ্বয়কে নিজ আয়ত্বাধীনে রাখা বিশেষ মুশকিল হয়ে পড়েছে। ভিন্ন মেয়েলোকের সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিলে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূলের মহব্বত তখন কমে আসে। অতএব, আমি আমার সকল মুরীদগণকে সাবধান করে দিচ্ছি তারা যেন বিনা আবশ্যকে হাটে বাজারে না যায়। বিশেষ জরুরী হলে যেতে পারেন কিন্তু চক্ষু নিæগামী করে খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। বিশেষ সাবধানতার পরও যদি কোন ভিন্ন

মেয়েলোকের উপর দৃষ্টি পতিত হয় তবে সাথে সাথে তওবা করে চক্ষুদ্বয়কে ফিরায়ে নিবেন। মনে রাখবেন, অন্যথায় তরীকার সকল মেহনত বরবাদ হয়ে যাবার আশংকা থাকে। ভিন্ন মেয়েলোকের প্রতি একটি কুদৃষ্টি একশত বৎসরের ইবাদত নষ্ট করে দিতে পারে।

বিবি ছাহেবানদের সতর্কতা ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার বিবি ছাহেবানগণ পর্দার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ ছাহেবের বর্ণনা হতে জানা যায়- এক সময় ভোলা থেকে একজন লোক তার স্ত্রীকে পর্দা অবস্থায় নৌকা করে ছারছীনায় নিয়ে এসেছিলেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করতে লোকটি উত্তর দিল, "হুজুর, আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ থেকে প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় চলে গিয়েছিল, হঠাৎ রাতে স্বপ্নে দেখে পীর আম্মার সাথে কোলাকোলি করছে এবং ঘুম হতে জেগে দেখে দীর্ঘ দিনের তার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সে স¤পূর্ণ সুস্থ। এরপর থেকেই আমার স্ত্রী বিশেষভাবে আবদার করেছে পীর আম্মাকে একবার চোখের দেখা দেখতে। এ জন্যই হুজুর তাকে নিয়ে এসেছি। আপনার এজাজত পেলে হুজুর তাকে অন্দর মহলে পাঠাতে পারি"। সবাইকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাসিমুখে ফিরে এসে বললেনঃ বাবারা, আমি আজ মেয়ে লোকের নিকট একটি মাসয়ালা শিখলাম। আমি বাড়ির ভিতরে লোকটির আবদারের কথা জানালে তারা বলল- আমরা আপনার হুকুম অবশ্যই পালন করব। তবে দুই কারণে আমাদের দেখা করার এজাজত দেওয়া ঠিক মনে করিনা। প্রথমতঃ আপনার লক্ষ লক্ষ মুরীদ। সকলে ত পর্দা করে না। আজ যদি আমরা দেখা দেই তবে একথা প্রচার হয়ে যাবে এবং অনেকেই তাদের বিবিগণকে আমাদের সাথে দেখা করার জন্য নিয়ে আসতে পারে। এতে আমাদের মাকরূহ তাহরীমের গোনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে- কারণ পর্দানশীন মেয়েদের জন্য বেপর্দা মেয়েদের সাথে দেখা দেওয়াও মাকরূহ তাহরীম। দ্বিতীয়তঃ আমরা এখন পর্দার ভিতরে নিরিবিলিতে সংসার ধর্ম পালন করে আল াহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকার সুযোগ পাই। যদি আপনার মুরীদগণের বিবিরা আসতে থাকে তাহলে আমাদের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটবে। হুজুর সকলের সামনে এই কথা বলে দোয়া করে লোকটিকে বিদায় দিলেন।

শেষবারের হজ্জ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার প্রথম জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা ছিলনা। পরবর্তীতে তিনি যখন মালেকে নেছাব হন, তখন শুধু ফরজ যাকাত আদায় করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং যাকাতের অতিরিক্ত বহু টাকা-পয়সা মুক্ত হস্তে দান করতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা জীবনে তিনবার হজ্জ করেছেন। প্রথম হজ্জ কৈশোর জীবনে, দ্বিতীয় হজ্জ মধ্য বয়সে এবং শেষ হজ্জ তিনি ৮০ বছর বয়সে সম্পন্ন করেন। শেষ বারের হজ্জ হুজুর কেবলার জীবনে একটি উলে-খযোগ্য ঘটনা। হযরত পীর ছাহেব কেবলা হজ্জে যাবেন এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে-সাথে হুজুরের সাথে একত্রে হজ্জ করবেন এই নিয়তে বহু লোক হজ্জের আবেদন করলেন, সরকারিভাবে এই ব্যাপারে ছারছীনায় একটি হজ্জ অফিস খোলা হয়। বহু লোকের আবেদন সত্তে¡ও সরকারী আইন মোতাবেক ১৪০১ জনের দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় কারণ এর চাইতে অধিক লোক একজনের সাথে যাওয়া সরকারী আইন মোতাবেক সিদ্ধ ছিলনা।

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে পূর্ব হতেই এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ধর্মীয় নেতা হিসেবে হুজুর কেবলার খ্যাতি ছিল। তাই তাঁর হজ্জে যাওয়ার সংবাদে সে দেশ থেকে শত শত অভ্যর্থনাপত্র আসতে লাগল। বাড়ি হতে রওয়ানা দেয়ার কয়েকদিন পূর্বে ছফিরে হুজ্জাজ সৈয়দ আহমদ ছাব্বাস ছাহেব মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সাথে দেখা করার জন্য ছারছীনায় আসেন। তদানীন্তন সিভিল সাপ্লাইয়ের মন্ত্রী মহোদয় জনাব সৈয়দ আফজাল ছাহেবও

হুজুরের রওয়ানার প্রাক্কালে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। বাংলা ১৩৫৬ সালের ১৫ই ভাদ্র বাড়ি হতে মক্কা শরীফের পথে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি যে মূল্যবান ভাষণ দেন সেটি শুধু তাঁর খোলাফা, মুরীদ ও ভক্তবৃন্দের জন্যই প্রযোজ্য নয়, সকল মুসলমানের আমলের জন্য একটি সার্বক্ষণিক নসীহতমালা।

অসুস্থ শরীরে বৃদ্ধ বয়সে এত অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে তিনি হজ্জে যাচ্ছেন, এটি অনেকের কাছেই কেমন যেন রহস্যময় ছিল। যাকে কেন্দ্র করে এদেশে ইসলামের এক অনুক‚ল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যার বদৌলতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ চিনতে পেরে নিজেদেরকে ধর্মীয় ছাঁচে গঠন করার সুযোগ পেয়েছে, তিনি আজ এই বয়সে হজ্জে চলেছেন- তাঁকে আবারও নিজেদের মাঝে ফিরে পান কিনা একথা কল্পনা করে মনের ভিতর বিষাদের এক তীব্র দাহ তারা অনুভব করলেন।

হুজুর কেবলার সঙ্গী লোকদের নিয়ে ছারছীনা থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য একখানা বিশেষ জাহাজের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তিনি যখন জাহাজে উঠেন তখনকার দৃশ্য একদিকে কত হৃদয়বিদারক, অপরদিকে কত মধুর। লক্ষ লক্ষ লোক হুজুরকে বিদায় দেয়ার জন্য, তাঁর দোয়ার প্রার্থী হয়ে ছারছীনায় আগমন করেছিলেন। নদীর তীরে,আশে-পাশে যে দিকেই দৃষ্টি দেয়া যাকনা কেন মাথায় টুপি, সাদা পোশাকধারী মানুষ আর মানুষ। বেহেশতী মানুষের ঢল নেমেছে যেন। মনে হয়েছিলো লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা যেন ছারছীনার বুকে নেমে এসে হুজুর কেবলাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। প্রতিটি মুখ বিষাদমাখা, প্রতিটি চোখ অশ্র"সিক্ত, প্রতিটি অন্তর মহব্বতের জোশে উদ্ভাসিত। হুজুর কেবলা নিজে সকলের দিক চেয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিলেন। হাত তুলে সকলের জন্য মহান আল াহর দরবারে মুনাজাত করলেন।

চাঁদপুর থেকে একটি বিশেষ ট্রেনে সবাইকে নিয়ে তিনি চট্টগ্রাম পৌঁছলেন। প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই ট্রেন থামানো হত। হাজার হাজার লোক হুজুরের দোয়া নেয়ার জন্য সমবেত হয়েছিল। হুজুর কেবলার পক্ষ থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মাওলানা শাহ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেব (রঃ) সকলকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন- ধৈর্য ধরার আহŸান জানাতেন। অতঃপর সকলকে তওবা করাতেন এবং দোয়া করে তাদেরকে বিদায় দিতেন। চট্টগ্রামে কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি ২৭শে ভাদ্র মোজাফফরী জাহাজে মক্কা শরীফের পথে রওয়ানা হন। ছোট পীরজাদা মরহুম হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূর ছাহেব কর্তৃক লিখিত তার ছফরের বিশদ বিবরণ মরহুম জনাব আঃ বারী ছাহেবের লেখা হুজুর কেবলার জীবনীগ্রন্থে উলে-খ আছে। উৎসাহী পাঠকবর্গকে সেখান থেকে সেটি পাঠ করার অনুরোধ করছি।

আশ্বিন মাসের নয় তারিখ জাহাজ এসে ভীড়ল জেদ্দা বন্দরে। হাসান রফি নামে আরব দেশের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির তত্ত¡াবধানে সকলে জেদ্দায় অবস্থান করেন। হুজুর কেবলার শারীরিক তেমন কোন অসুস্থতা না থাকলেও ক্লেশ সহ্য করার মত অবস্থা ছিলনা-তাঁর জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

কার্তিক মাসের ১২ তারিখ মরহুম পীর ছাহেব কেবলা হজ্জের কাজ সমাধা করার জন্য মক্কা-মোয়াজ্জমায় রওয়ানা হলেন। হেরেম শরীফসংলগ্ন বাবল বস্তিয়াতে তিনি অবস্থান করেন। হেরেম শরীফে নামাজের জামায়াতে তিনি ঘরে থেকেই সামিল হতে পারতেন। তিনি যখন মীনায় অবস্থান করছিলেন তখন সুলতান আবদুল আজিজ এবনে সউদ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সাধারণ মানুষকে বহু টাকা পয়সা দান করেন।

এই সময়ে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই সকলের পরামর্শে তিনি প্লেনযোগে কয়েকজন সাথী নিয়ে মদীনা শরীফ গমন করেন। সেখানে তিনি হযরত আবু

আইয়ুব আনছারী (রাঃ)-এর বাড়ি ভাড়া করে অবস্থান করেন। এখানে তিনি ১২ দিন অবস্থান করেন, রাসূলে পাক (দঃ)-এর রওজা পাক যিয়ারত ছাড়াও তিনি সবাইকে নিয়ে জান্নাতুল বাকী, জাবালে অহুদ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান যিয়ারত করেন। মদীনা শরীফ অবস্থানকালেও তিনি বিভিন্ন স্থানে বহু টাকা পয়সা দান করেন। এই সময়ে মদীনা শরীফে বাঙ্গালীদের অবস্থানের জন্য একটি মুসাফিরখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন এবং এজন্য প্রাথমিকভাবে কিছু টাকাও তিনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখে আসেন।

পবিত্র হজ্জ যিয়ারত সমাপন করে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পবিত্র মক্কা-মদীনা শরীফ থেকে শেষবারের মত বিদায় নেন এবং বিমানযোগে করাচী হয়ে ১২ই নভেম্বর ঢাকায় পৌঁছেন এবং ১৩ই নভেম্বর ছারছীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার তৃতীয়বার হজ্জ গমনের সাথে পূর্ব যমানার নেক ওলী আল াহদের হজ্জ গমনের একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ) শত শত মুরীদসহ আল াহ পাকের ঘর যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল হিসেবে আরববাসীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলাও সহস্রাধিক মুরীদসহ হজ্জ ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনা শরীফ গমন করলে সারা বিশ্বের একজন বিশিষ্ট ওলীয়ে কামেল হিসেবে ইরান-ইরাক, সৌদি আরব এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের অধিবাসীগণ তাঁকে যে সম্মান প্রদর্শন করে তা সত্যিই বিরল। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক বিশ্বের সকল স্থানেই সকল সময়ে তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মান ও মর্যাদা এমনিভাবেই বুলন্দ রাখেন।

লেবাস

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ব্যবহারে কুরআন-হাদীসের নির্দেশ কিতাব দেখে হুবহু পালন করতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নেছফে-ছাক পর্যন্ত ফাড়াবিহীন গোল জামা তিনি ব্যবহার করতেন। জামায় একটি মাত্র বোতাম থাকত। এখানে উলে-খ্য যে, রাসূল (দঃ) ও সাহাবীদের জামার পার্শ যে ফাড়াবিহীন ছিল তার একটি প্রমাণ হ'ল- অনেক গরীব সাহাবী ছিলেন যাঁরা শুধুমাত্র একটি জামা গায় দিয়ে নামাজ আদায় করতেন। জামার পার্শ্ব ফাড়া থাকলে সতর ঢাকা সম্ভব হতনা। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর টুপি ছিল গোল, উপরিভাগ সমতল। তিরমিজী শরীফ থেকে জানা যায় সাহাবায়ে কেরামের টুপি গোল ছিল এবং মাথার সাথে লাগানো থাকত। পাগড়ী কোন্ নামাজে কত হাত লম্বা হবে, কিভাবে পড়তে হবে, কি ভাবে খুলতে হবে- এসব সূ² ব্যাপারেও তিনি সুন্নতে আমলের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করেননি। কিতাব দেখে দেখে আমল করতেন। মাথায় সব সময়ই টুপি ব্যবহার করতেন। গোসলের সময় ভিন্ন তিনি কখনও মাথা খালি রাখেন নাই। রাতে ঘুমের অবস্থায় টুপি মাথা থেকে আলগা হয়ে পড়লে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে টুপি মাথায় দিয়ে দিতেন। টুপি সর্বদা মাথায় রাখা সম্পর্কে তিনি অনেক সময়ই বলতেনঃ একদিন হযরত নবী করীম (দঃ)-এর মাথা হতে টুপি আলগা হয়ে যাওয়ায় তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন- আল াহ হাজির আছেন, তাঁর সম্মুখে খোলা মাথায় থাকা বেয়াদবী হয়েছে। এই বলে লজ্জিত মনে মাথায় টুপি রাখলেন।

ছুরত ঃ

ইসলামী ছুরতের একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো দাড়ি রাখা। এটি ফেলে দেয়া নিষিদ্ধ। দাড়ি না রাখা ও গোঁফ রাখা মোশরেক ও অগ্নিপূজকদের জাতীয় চিহ্ন ও ইউনিফরম ছিল। সুতরাং হুজুর (দঃ) তাদের বিপরীত ইউনিফরম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ছহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে-

অর্থাৎ, "তোমরা বিধর্মী মোশরেকদের বিপরীত আচরণ কর, দাড়ি লম্বা হতে দাও এবং গোঁফ কর্তন কর।"

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সাধারণভাবে দাড়ি মুণ্ডনকারীর হাদিয়া এবং দাওয়াত কবুল করেননি। প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলে তিনি দাড়ি রাখার ব্যাপারে সবাইকে জোর তাগীদ দিতেন। মুখের উপর গজানো চুলের কোন্‌গুলি দাড়ির অন্তর্ভুক্ত. গোঁফ কতটুকু, কি ভাবে ছেটে রাখতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে কিতাব দেখে তদনুযায়ী নিজেও আমল করতেন, অপরকেও সেইভাবে নির্দেশ দিতেন। তিনি দাড়িতে মেহেদীর খেজাব ব্যবহার করতেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলিম জাতি লেবাছে, ছুরতে ইসলামী ভাবধারা পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের অনুকরণে সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছে। যে পোশাক, যে ছুরত আল্লাহর রাসূলের প্রিয়- সেটি মুসলমানের কাছে গ্রহণীয় নয়, কারণ এতে অপরের কাছে বোকা, সৌন্দর্য জ্ঞানহীন, গোড়া বলে গণ্য হয়- মুসলমানের জন্য এর চাইতে বিকৃত মানসিকতা আর কি হতে পারে! এরূপ মনমানসিকতা যে কোন মুসলমানের খোদ্‌ ঈমানের উপরই কতবড় আঘাত হানতে পারে এবং তার জন্য কিরূপ ধর্মীয় বিপর্যয় বইয়ে আনতে পারে সেদিকে অনেকেই খেয়াল করেনা। হযরত নবী করীম (দঃ) বলেছেন ঃ দশটি কুকর্মের দরুণ হযরত লুত (আঃ)-এর কওম ধ্বংসমুখে পতিত হয়েছে, তন্মধ্যে চারটি হলোঃ (১) দাড়ি কর্তন করা, (২) গোঁফ লম্বা রাখা, (৩) হাতে তালি দেয়া, এবং (৪) রেশমী বস্ত্র পরিধান করা। যেখানে গুরুর আদেশ রক্ষার্থে শিখগণ আজও মাথায় বেণী বেঁধে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে, সেখানে মুসলমানেরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হয়েও তাঁর নির্দেশ অমান্য করে তাঁদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলী দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়না। এটি জাতীয় জীবনের এক চরম অধঃপতন বৈ কিছুই নয়।

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে ইসলামে লেবাস ও ছুরাত এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? একটু চিন্তা করলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে-কৃষ্টি-সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, লেবাস-আকৃতি ইত্যাদিতে যারা আপন বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে চলে সেই জাতি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকে। এই উপমহাদেশে গ্রীক, আফগান, আর্য, তুর্কী, মিশরী, সুদানী-কত জাতি আগমন করেছে, আজ তাদের কোনই ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়না। ভারতীয় সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে তারা মোটামুটিভাবে হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ শিখগণ তাদের জাতীয় চিহ্ন মাথার চুল ও দাড়ি ঠিক রেখেছে, তাই তারা আজও একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ভারতে বসবাস করছে। মুসলমানরাও তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখার দরুনই একটি আলাদা জাতি হিসেবে টিকে রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমা সভ্যতার ছোঁয়ায় লেবাস পোষাকে মুসলমানগণ আজ বহুরূপী- অনেক সময় পোশাক দেখে তাদেরকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোট, প্যান্ট, টাই, হাফ শার্ট ইত্যাদি ইসলামী লেবাসের বিরোধী পোশাক পরিধান করতে মুসলমান জাতি আজ লজ্জিত হওয়াতো দূরের কথা, ইসলামী পোষাকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতেও তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়না। দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়কি?- যে পোশাক, যে ছুরত আল াহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) মর্যাদার চিহ্ন হিসেবে উলে-খ করেছেন, সেটি বর্জন করে মুসলমানগণ কিভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। বস্তুতঃ মুসলমান হওয়ার শর্তই হলো, হযরত নবী করীম (দঃ)কে সর্বাবস্থায় সর্ববিষয়ে আমাদের মহান নেতা হিসেবে গ্রহণ করা। তাই লেবাস ও ছুরত সম্পর্কে তাঁর যে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সেটি মেনে চলা আমাদের একান্ত করণীয়। পোশাক পরিচ্ছদ এবং আকৃতি প্রকৃতির মধ্যেও মুসলমানদের যে বিরাট বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে এবং উহা সমগ্র বিশ্বের মুসলমান সন্তানকে যেভাবে এক মহান সাম্যের বাঁধনে আবদ্ধ করে রেখেছে তা কোনক্রমেই উপেক্ষার বস্তু নয়। আজ যেখানে অমুসলিম চক্র মুসলমানদেরকে সর্ববিষয়ে হেয় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেখানে মুসলমানদের উচিত লেবাস-ছুরাত, কৃষ্টি-কালচার, আচার-ব্যবহার সকল বিষযে বিজাতীয় ভাবধারা বর্জন করে ইসলামের আদর্শ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া- একমাত্র তখনই বিশ্বের বুকে মুসলমানগণ একক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হবে। মনে রাখতে হবে, মুসলিম জাতির উন্নতি সকল বিষয়ে আল াহ রাসূলের নির্ধারিত বিধানের অনুসরণ-অনুকরণের মাঝে নিহিত, অন্য কিছুতে নয়।

পরিশেষে ছোট্ট একটি মন্তব্য রেখেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছিঃ সুন্নতী পোশাক ও ছুরত মানুষকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সহায়তা করে। একজন পেন্ট, শার্ট, টাই পড়া লোক যদি কোন সিনেমা বা নৃত্যানুষ্ঠানে গমন করে অথবা কোন কুরুচিপূর্ণ ছবি বা দৃশ্য অবলোকন করে- এটি সাধারণভাবে কারও কাছে তেমন চোখে পড়েনা। অথচ লম্বা জামা পড়া, টুপি মাথায় দাড়িওয়ালা কোন লোকের জন্য একই কাজ কত বেমানান! শুধু তাই নয় এই সব লোক মিথ্যা কথা বললে, ঘুষ খেলে বা যে কোন মন্দ কাজ করলে মানুষের কাছে তুলনামূলক ভাবে অধিক সমালোচিত হয়। অর্থাৎ, মন্দ ও নিষিদ্ধ কাজ এবং সুন্নতী লেবাস ও ছুরত- এ দুটোর সহ অবস্থান সাধারণভাবেই কারও কাছে কাম্য নয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে ব্যক্তি লেবাস ও ছুরত সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের পুরোপুরি অনুশীলন করে চলে, তার এই আমলই নিঃসন্দেহে তাকে অনেক মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার সহায়ক হয়। এটি খুবই স্বাভাবিক। মানুষের ঈমান, আকীদা যেমন তার বাইরের আমলের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে, ঠিক তেমনি তার বাহ্যিক আমলও পরোক্ষভাবে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। সবাইকে এই ছোট্ট বিষয়টি অনুধাবন করার অনুরোধ করছি।

পানাহার ও বাসগৃহ

পানাহারঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার পানাহার ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। তিনি অধিকাংশ সময়ে এক তরকারী দিয়ে মাটির বর্তনে খানা খেতেন। কখনও-বা শুধু ডাল দিয়ে খাবার শেষ করতেন। খাদ্যের পরিমাণ ছিল খুবই কম। একজন পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ মানুষের এত অল্প খাদ্যে কিভাবে চলতে পারে সেটি ভাববার বিষয়। এটা নিশ্চিত যে তিনি সেই সামান্য পরিমাণ খাদ্যে পেট পূর্ণ করতে পারতেন না। কেবল জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যই তিনি গ্রহণ করতেন। বস্তুতঃ সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী পেটের তিন অংশের এক অংশ খাদ্যে এক অংশ পানিতে পূর্ণ করে অপর অংশ খালি রাখার বিধান রয়েছে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এটি পূর্ণভাবে পালন করতেন। খাওয়া শেষ করে তিনি বর্তন ধুয়ে খেতেন, মাঝে-মাঝে পরিষ্কার করে খেতেন। বস্তুতঃ এ দুটোই সুন্নাত তরীকা।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সাধারণতঃ সকালে নাস্তা করতেন না। অবশ্য পরে বৃদ্ধ বয়সে চিকিৎসকগণের পরামর্শে এক আধটু দুধ পান করতেন। বেলা বারোটার দিকে সামান্য আহার করতেন। দুপুরের পর কখনও খানিকটা দুধ, এক পেয়ালা চা বা কখনও অর্ধঝুনা নারিকেলের পানি বা খালি নারিকেল খেতেন। এরপর এশার নামাজের পর সকল মেহমানের খাওয়া শেষ হয়েছে জানলে তিনি খেতে বসতেন। তবে ব্যাপারটি তত সহজ ছিল না। মেহমান আসার বিরাম ছিলনা, কোন মেহমান বা পরিবারে কাউকে অভুক্ত রেখে হুজুর কোন দিনই আহার করেননি। নবাগত মেহমানদের জন্য পরিশ্রান্ত বাবুর্চিকে পুনরায় পাক করতে বলা হুজুরের বিবেক বাঁধা দিত। তাই অন্দরমহলে গিয়ে যা সম্ভব তাই মেহমানদের সামনে হাজির করতেন। অনেক সময় এইরূপ ঘটেছে- হুজুরের বিবিগণ খেতে বসছেন কিন্তু মেহমানের সংবাদ পেয়ে আর এক লোকমাও মুখে দেন নাই, তাদের সব খাবার বাহির বাটিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরূপও ঘটেছে মেহমানদের জন্য কোন কিছুই করা সম্ভব হলনা- তখন তিনি নিজ পকেট থেকে পয়সা দিয়ে মেহমানকে হোটেল থেকে খেয়ে আসার জন্য বলতেন। এসব ব্যবস্থাদির পরই তিনি খেতে বসতেন।

প্রথম জীবনে পীর ছাহেব কেবলা মুসাফিরখানায় সকলের সাথে একত্রে বসে আহার করতেন। পরবর্তীতে সকলের অনুরোধে খাবার কুতুবখানায় নিয়ে খেতেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় মেহমানের জন্য যে ব্যবস্থা হত তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন না। অবশ্য বার্ধক্যের কারণে মুসাফির খানার খাবার সহ্য না হওয়ায় তাঁর জন্য আলাদাভাবে ভাত নরম করে তরকারী বিনামরিচে পাকানো হত। সাধারণতঃ তাঁর জন্য আলাদা তরকারী পাকালে তিনি এই বলে ফেরত দিতেন যে, এটি ফেরাউনী খাসলাত।

একবার তাবলীগ ছফরে বোটে খানা পাকানো হলো। সকলকে খেতে আদেশ দিলেন, বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করলেন- কি পাক করেছ? বাবুর্চি বলল- "হুজুর, ডাল পাক করেছি, আর আপনার জন্য বাচ্চা মুরগী"। সাথে সাথে তিনি রাগতঃ কণ্ঠে বললেন- "আমার জন্য ফেরাউনী খানা পাকায়েছ কেন?" হুজুরের দায়িত্ব, শারীরিক অবস্থা সবকিছু বিবেচনা করে সঙ্গী-সাথীদের পরামর্শেই তাঁর জন্য ঝাল ছাড়া সেই তরকারী পাকানো হয়েছিল। তবুও কোন যুক্তি-পরামর্শেও হুজুরকে সেই খাবার খাওয়ানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন- 'ঠিক আছে, এটি তোমরা খাও, আমার জন্য ডাল নিয়ে আস।' অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হল।

মরহুম মুফতী আবদুল মজিদ ছাহেব একটি ঘটনা উলে-খ করেছিলেন, ঘটনাটি এইঃ এক সময় বার্ষিক ইছালে ছওয়াবের মাহফিলে দুপুরের খাওয়ার পর কিছু ভাত উদ্‌বৃত্ত হওয়ায় মুসাফিরখানার কর্মচারী এসে হুজুরকে বলল যে, রাতে আর পাক হবে না, দুপুরের অবশিষ্ট ভাত পানি দিয়ে রাখা হয়েছে, সেটিই রাতে চলবে। হুজুর কেবলা অনুমতি দিলেন। কোন এক মেহমান বললেন- হুজুর, আমার শরীর খারাপ। পানি-ভাত খেলে আমার রোগ বেড়ে যেতে পারে। তাই হুজুরের অনুমতি পেলে আমার বোটেই আমি পাকের ব্যবস্থা করতে পারি। হুজুর কেবলা মুফতী ছাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন- "বাবা, মাওলানা ছাহেবকে কি পাক করে খাওয়াতে পারবে?" তিনি সম্মতি জানালেন। রাতে খাওয়ার সময় হুজুরকেও গরম ভাত দেওয়া হলে তিনি বললেন- 'সকল মেহমান খাবে পান্তাভাত আর আমি খাব গরম ভাত- কখনও হতে পারে না।' হুজুর কেবলা পান্তাভাত খাবেন এ কথা জানতে পেরে এক মস্তান মুরীদ, চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। লোকটাকে শান্ত করার জন্য হুজুর কেবলা পান্তা ভাতের সাথে সামান্য গরম ভাত নিয়ে বললেন- 'লোকটাকে বল- আমি গরম ভাত খেয়েছি।' এই ছিল হুজুর কেবলার আদর্শ।

পীর ছাহেব কেবলা প্রথম জীবনে গরীব থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল। কিন্তু রাসূলুল াহ (দঃ)-এর আদর্শ সামনে রেখে অত্যন্ত দীনহীনভাবে তিনি জীবন-যাপন করতেন। খাওয়ার ব্যাপারে কোন বিলাসিতা, বাড়াবাড়ি তিনি কোন দিনই করেন নাই। মাটির বাসন, মাটির পেয়ালা, নারিকেলের আঁচির চামচ, কাচের একটি নিমকদান, একটি দস্তরখানা, একটি টিফিনকেরিয়ার ইত্যাদি একান্ত জরুরী জিনিসগুলোই তাঁর ব্যবহার্য ছিল।

তিনি অতি ধীরভাবে খেতেন। তাঁর খাওয়ার সময় মনে হতো খাদ্যদ্রব্যের চাইতে অন্য একটি বিশেষ চিন্তায় তিনি মগ্ন রয়েছেন। অনেক সময় বলতেন- "বাবা, কিতাবে কোন কিছুই বাদ দেয়নি।" এই বলে সুন্নাত তরীকানুযায়ী মুখে কিভাবে লোকমা স্থাপন করতে হবে, কোন্ আঙ্গুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা তিনি খানা খেতে খেতে দেখিয়ে দিতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কাছে বড় লোকদের খাওয়া-দাওয়ার ধরন এবং অপচয় সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করতেন এবং দুঃখ প্রকাশ করতেন। কোন অপচয় তার সহ্য হতনা। প্রতিটি খাদ্যকণার হিসাব দিতে হবে- হাদীস উলে-খ করে একথা অনেক সময়ই উপস্থিত সকলের কাছে ব্যক্ত করতেন।

আজ কোন অনুষ্ঠানাদিতে বিশেষ করে বিয়ে-শাদীতে খাদ্যের যে অপচয় হয় তা বর্ণনাতীত। যেখানে দেশের বিরাট অংকের জনসমাজ অনাহারে অর্ধাহারে কালাতিপাত করছে সেখানে নিজের প্রতিপত্তি জাহির করার জন্য এইরূপ মাত্রাতিরিক্ত খরচ জাতীয় অপচয়ের সামিল। সমাজের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের এই অপচয়রোধে এগিয়ে এসে জনমত গঠন করা একান্ত কর্তব্য।

বাসগৃহ ঃ

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা লেবাছ- পোশাক, পানাহার বিষয়ে যেমন জাঁকজমক পছন্দ করতেন না তেমনি ঘর-দরজা তৈরীর ব্যাপারেও 'ফকীরী' ভাব অবলম্বন করতেন। তিনি ইচ্ছা

করলে নিজে থাকার জন্য সুন্দর অট্টালিকা, দালান কোঠা তৈরী করতে পারতেন- কিন্তু বাসগৃহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুন্দর হওয়া তাঁর কাছে একেবারেই অপছন্দনীয় ছিল।

তিনি প্রায়ই বাহির বাড়িতে থাকতেন। সেখানে তাঁর অবস্থানের জন্য পৃথক কোন ঘর ছিলনা। কুতুবখানার ভেতর তিনি রাত্রি যাপন করতেন। পরিবারবর্গের বসবাসের জন্য বাড়ির ভিতর ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ বিশিষ্ট আস্তরবিহীন একটি একতলা দালান ছিল। ছাদ ফেটে মাঝে মাঝে পানি পড়ত। ঘরগুলোকে তাই মেরামত করার জন্য তাঁর বিবিছাহেবাগণ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেনঃ "দুনিয়া অল্পদিনের জায়গা, এরপর বহুদিন যে কবরে অবস্থান করতে হবে সেই কবরের কথা স্মরণ কর।" ধর্মে-কর্মে তাঁর বিবিছাহেবাগণও অতিশয় অগ্রগণ্য ছিলেন। তাই মরহুম পীর ছাহেবের সেই নসীহতের পর কোনদিন আর তাঁরা সে সম্পর্কে কোন ওজর-আপত্তি পেশ করেননি।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা প্রথম দিকে বিছানার উপর কোন তোষক বা ফরাস ব্যবহার করতেন না। শুধু চাটাইয়ের উপর শয়ন করতেন। বাতে আক্রান্ত হওয়ার পর ডাক্তারের পরামর্শে তিনি তোষক ব্যবহার করতে রাজী হন। কিন্তু তোষকের উপর কোন গেলাফ তিনি দিতে রাজী হলেন না। যখন তাঁকে বলা হল তোষকের উপর গেলাফ না থাকলে তোষক নষ্ট হয়ে যাবে তখন তিনি তোষকে গেলাফ দেওয়ার হুকুম দিলেন। এই ছিল তাঁর থাকার ব্যবস্থা।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আর্থিক অবস্থা সচ্ছলতা থাকা সত্তে¡ও পীর ছাহেব কেবলা পোশাক-পরিচ্ছদ এবং থাকা-খাওয়ার ব্যাপার এত কঠোরভাবে সংযম পালন করতেন কেন? বস্তুতঃ শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকেও তিনি অনায়াসে আরও আরাম-আয়েশে জীবন চালাতে পারতেন। কিন্তু সে জীবন তিনি গ্রহণ করেননি। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিঃসন্দেহে আল্লাহর একজন ওলী ছিলেন। সারাটি জীবন কিতাব দেখে-দেখে কুরআন হাদীসের আলোকে নিজের প্রতিটি কাজ, কথা, চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে আল াহ্র এক মাহবুব বান্দায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল আল াহ্ পাকের দীদার। দুনিয়ার অসারতা তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই এখানকার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ তাঁর কাছে একেবারেই নিরর্থক ছিল। বস্তুতঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অবস্থা এমনই। সাধারণ মানুষ যেখানে কঠোর পরিশ্রম করে দুনিয়াতে থাকা খাওয়ার স্বচ্ছল অবস্থা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় রত থাকে, সেখানে আল াহর আশেক বান্দাগণ দুনিয়ার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আখেরাতে স্থায়ী শান্তি অর্জনে মশগুল থাকেন। দুনিয়াদার লোক ওলী-আল াহ্দেরকে বোকা মনে করে, অন্যদিকে ওলী-আল াহ্গণ নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করতে পারেন দুনিয়াদার লোকই বোকা- তারা দুনিয়ার অলীক মোহে পড়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনকে বিনষ্ট করছে। আল াহ্র শ্রেষ্ঠতম বান্দা, দুনিয়া আখেরাতের বাদশাহ হযরত নবী করীম (দঃ)-এর কথা স্মরণ করুন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেনঃ 'দিনের পর দিন আমাদের ঘরে চুলা জ্বালানো হয়নি। খেজুর আর পানিই ছিল তখন আমাদের খাদ্য সামগ্রী।' খেজুর পাতায় চাটাইয়ের উপর শোয়ায় হুজুর পাক (দঃ) এর পবিত্র দেহ মোবারকে দাগ পড়ে গিয়েছিল- যা দেখে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কেঁদে ফেলেছিলেন। কিসের লোভে বলখের বাদশাহ হযরত ইব্রাহিম আদহাম (রঃ) মসনদের সকল চাকচিক্য বিসর্জন দিয়ে আল াহর পথের কাঙাল সেজেছিলেন? এগুলো চিন্তা করার বিষয় নয়কি?

ছোট্ট একটি মন্তব্য রেখেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। সৎভাবে দুনিয়ায় টাকা পয়সা, ধন-দৌলত উপার্জনে কোন বাধা নেই। বিশেষ করে এগুলো যখন সৎকাজে ব্যয়িত হয়ে আখেরাতের সহায়ক হবে তখন ত এগুলো শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। বস্তুতঃ ইসলামী জীবনাদর্শের মূল কথা হল সকল কাজে পরকালকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া, দুনিয়া বর্জন নয়। দুনিয়া আর পরকালের মাঝে এই ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন ব্যাপার। এর জন্য প্রয়োজন মনের পবিত্রতা, আল াহ-রাসূলের মহব্বত। এটি অর্জন করতে হলে কামেল ওলী-আল্লাহর সংশ্রবে এসে তাদের নির্দেশিত পথে জীবন গঠন করতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

প্রতিবেশীর প্রতি পীর ছাহেব কেবলা

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনচরিত আলোচনা করলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশী সম্পর্কে কুরআন পাক এবং হাদীস শরীফের উপরোক্ত নির্দেশাবলী তাঁর অন্তরে চির বিরাজমান ছিল।

প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের সাথে হুজুরের ব্যবহার ছিল একান্ত উদার ও আন্তরিকতাপূর্ণ। আত্মীয়, অনাত্মীয়, বিধর্মী- সকলের প্রতি তার সহানুভূতি, সহমর্মিতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রতিবেশীদের ঝগড়া, কলহ অনেক সময়ই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মাধ্যমে মিটাতে হত। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, সূ² বিচারক হিসেবে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কেমন খ্যাতি ছিল। স্থানীয় মহকুমা হাকীম পর্যন্ত অনেক মামলা- মোকদ্দমার জন্য হুজুরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর বিচার এবং সিদ্ধান্তের উপর প্রতিটি গ্রামবাসীর আস্থা ছিল, কারণ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে সব পাড়া প্রতিবেশী হুজুরের মুরীদ ছিলনা-তারাও যেকোন ব্যাপারে তাঁর মীমাংসাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিত। এতে গ্রামবাসীগণ বহু মামলা-মোকদ্দমা, শত্র"তা-ইত্যাদির হাত হতে রক্ষা পেতো।

পীর ছাহেব কেবলার সিদ্ধান্ত সকলে এক বাক্যে মেনে নিলেও তিনি বিচার মীমাংসায় গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকদের কখনও উপেক্ষা করেননি; বরং তাদের কথা মান্য করার জন্য দু'পক্ষকেই উপদেশ দিতেন। এইভাবে তিনি গ্রামের 'মাতবর' শ্রেণীর লোকদের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। হুজুরের নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রধান ব্যক্তিগণের অনেকেই তাঁর হাতে বয়াত হলেও তিনি তাদের মর্যাদার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তারা দরবারে এলে হুজুর তাদেরকে সম্মানের সাথে বসতে দিতেন। মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতেন এবং যথারীতি আদর আপ্যায়ন করে বিদায় দিতেন। বস্তুতঃ এটি একটি মস্তবড় আদব এবং সকলের জন্যই শিক্ষণীয় বটে।

প্রতিবেশীদের অসুস্থতার সংবাদ পেলে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাদেরকে দেখতে যেতেন। পুরুষ হলে তাদের কাছে বসতেন, দোয়া করতেন এবং প্রয়োজন বোধে তাদের ঔষধ এবং পথ্যের বন্দোবস্থ করতেন। প্রতিবেশী হিন্দুদের বেলায়ও তাঁর এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হতনা। গ্রামে কারও মৃত্যু সংবাদ পেলে হুজুর কেবলা সেখানে উপস্থিত হয়ে সমবেদনা প্রকাশ করতেন। মৃতের মাগফেরাতের জন্য মাদরাসায় ছাত্রদের দিয়ে কুরআন শরীফ পাঠ করাতেন এবং শরীয়ত অনুযায়ী দাফন কাফন এবং জানাযার সকল কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। পরিশেষে মৃতের ওয়ারেসগণকে সান্ত¡না ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বিদায় হতেন। তিনি সব সময়ই তার দোয়ায় মৃত পাড়া প্রতিবেশীদের কথা উলে-খ করতেন এবং তাদের সকলের জন্য আল াহর কাছে রোদন করতেন।

প্রতিবেশীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি, যেমন আকীকা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদিতে হুজুর নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। জীবনের শেষ ভাগে বিভিন্ন কারণে বিশেষতঃ সময়ের অভাবে গ্রামে কারও বাড়িতে দাওয়াতের জন্য যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁর নিজ বাড়ির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীদেরকে দাওয়াত দিতেন, এমন কি কেহ অনুপস্থিত থাকলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবর নিতেন।

গ্রামের প্রায় সকলেই সাংসারিক ও বৈষয়িক কাজে হুজুরের পরামর্শ নিত এবং তার অনুমতি লওয়া জরুরী এবং কল্যাণকর মনে করত। বিবাহ, ব্যবসা, ঘর তৈরী করা, পুকুর কাটা, দোকান করা- এমনি ব্যক্তিগত শত শত বিষয়ের পরামর্শ ও অনুমতির জন্য গ্রামবাসীরা পীর ছাহেবের পাশে ঘিরে থাকত। হুজুর কেবলা একারণে কখনও সামান্যতম বিরক্ত হন নাই।

প্রতিবেশী ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও হুজুর খুব øেহ করতেন। কাছে এসে দাঁড়ালেই তিনি তাদের পড়াশুনা ও পিতা মাতার কথা জিজ্ঞাসা করতেন এবং কখনও কখনও কারও কারও হাতে ফলমূল তুলে দিতেন।

প্রতিবেশীদের মাঝে শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু নজরে এলে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা খুব ব্যথিত হতেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ডেকে কখনও বুঝাতেন অথবা মৃদু ভর্ৎসনা করতেন। কখনও কখনও আবার বিশেষ ভাবে সতর্ক করে দিতেন। একবার এক প্রতিবেশী কলহ করে উত্তেজিত হয়ে মাকে প্রহার করেছিলেন। হুজুর সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলের সামনে তাকে পায়ের জুতা দিয়ে বেদম প্রহার করেছিলেন।

হুজুর কেবলার পরশীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তার ঘোর বিরোধী ছিল, তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা মানুষের কাছে কুৎসা রটনা করে বেড়াতো। হুজুর সেগুলো জানা সত্তে¡ও কোন প্রতিবাদ করেননি। শুধু তাই নয়, গ্রামে কোন বিচার মীমাংসার শালিশ করলে পীরছাহেব কেবলা তাদেরকে সম্মান দেখাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। একবার পীর ছাহেব কেবলার কাছে একটি গ্রাম্য বিচার মীমাংসার জন্য আনা হল। সেখানে হুজুরের চরম শত্র“ভাবাপন্ন একজন প্রতিবেশীকেও শালিশ মান্য করা হয়েছিল। যদিও ঐ ব্যক্তি বয়স এবং মর্যাদায় হুজুরের চাইতে অনেক ছোট, তথাপি হুজুর সেদিন তাকে “আপনি” এবং “বড়মিয়া” বলে ডেকে বিচারের মীমাংসা তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পীর ছাহেব কেবলা গ্রামবাসীদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য একদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অপরদিকে নেতৃস্থানীয় লোকদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি গ্রামের বিধবা, এতিম, দুঃখী এবং অভাবগ্রস্থদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে সেই অনুসারে তাদেরকে যথাসাধ্য দানখয়রাত করতেন। কোন কোন পরিবার এমন ছিল তারা প্রায় প্রতিদিনই বাজারে যাওয়ার পথে ব্যাগ হাতে হুজুর কেবলার দরবারে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। হুজুর অবস্থাভেদে তাদেরকে দান করতেন। মনে হত এটি কোন দান-খয়রাত নয়, যেন আপন পরিবারের জন্য নিত্যকার একটি খরচ। কোন পরিবার অভূক্ত অবস্থায় আছে একথা জানলে তিনি ব্যস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। প্রতিবেশীদের প্রতি পীর ছাহেব কেবলার এই সব আমল আখলাক আমাদেরকে সেই হাদীসটির কথা মনে করিয়ে দেয়ঃ যে পেট ভরে খায়, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, সে প্রকৃত ঈমানদার নয়।

প্রতিবেশীদের প্রতি আচার ব্যবহারে পীর ছাহেব কেবলার উদারতা ও মহানুভবতার একটি ছোট্ট ঘটনা উলে-খ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

পীর ছাহেব কেবলা প্রথমবার যখন মক্কাশরীফ যান তখন তার ভগ্নিপতিকে তিনি বাড়িতে রেখে যান। সেই সময় কতক পরশী বাড়ির জমিজমা নিয়ে ভগ্নিপতির সাথে অনর্থক ঝগড়া বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়। এমন কি তাকে তাড়িয়ে ঘরবাড়ি দখল করারও হুমকি দেয় এবং নানাভাবে জুলুম অত্যাচার করে। শেষ পর্যন্ত আল াহর রহমতে তারা কোন অনিষ্ট করতে পারেনি। পীরছাহেব কেবলা মক্কাশরীফ থেকে ফিরে এলে উক্ত ভগ্নিপতি সহ অন্যান্য পাড়া পরশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সমস্ত ঘটনা তার কাছে তুলে ধরেন। হুজুর কেবলা চুপ করে সকল ঘটনা শুনলেন। পরদিন কাউকে কিছু না বলে সর্বপ্রথম তিনি উক্ত শত্র“তা পোষণকারী পরশীর বাড়িতে গিয়ে মহব্বতের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন। এমন কি তাঁরা তাকে কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। এদিকে বাড়িতে বহুলোক তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি ফিরে এলে সবকিছু শুনে সবাই অবাক হয়ে বলে উঠলঃ হুজুর আপনার কি পিত্ত নেই? যে পরশী আপনার জান ও মালের শত্র“, তাদের বাড়ি সর্বপ্রথম গেলেন এবং তাদের ঘরে খাওয়া দাওয়া করলেন? হুজুর কেবলা হেসে উত্তর দিলেনÑ দুনিয়ায় আমার কোন শত্র“ নেই। পরবর্তী সময়ে ঐ সকল পাড়া প্রতিবেশীদের সন্তানগণ যখন বিশেষভাবে অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন দেখা যেতো পীর ছাহেব কেবলা অন্যান্য গরীবদের

চাইতে তাদেরকে অধিক সাহায্য করতেন এবং বিভিন্ন ভাবে খোঁজ খবর নিতেন। তিনি এই কারণে এটি করতেন যেন তারা কিছুতেই একথা ধারণা করতে না পারে যে, তাদের পূর্ব পুরুষগণ পীর ছাহেবের সাথে যে অসৎ ব্যবহার করেছিল তা তিনি ভুলেননি এবং এখন তিনি তার প্রতিশোধ নিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহর ওলীদের মনমানসিকতা, তাঁদের মহানুভবতা কত উচ্চ পর্যায়ের!

বিচার মিমাংসা, আচার-ব্যবহার, সাহায্য-সহানুভূতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পীর ছাহেব কেবলা প্রতিবেশীদের সাথে যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দবোধ গড়ে তুলেছিলেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি যে তাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, নির্ভরযোগ্য অভিভাবক, পরম শুভাকাংখী, সুখ-দুঃখের একজন সাথী- একথা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করত। মধুর ব্যবহার দ্বারা এইভাবে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা শিক্ষিত- অশিক্ষিত, বড়-ছোট, শত্র"-মিত্র সকল পাড়া প্রতিবেশীদের অন্তর জয় করেছিলেন। আমরা সবাই যদি এমনিভাবে আশেপাশের প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে থাকি, একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হই, নিজেদের মাঝে মমত্ববোধ বজায় রাখি কেবল মাত্র তখনই সুন্দর, সুখী সমাজ গড়ে উঠা সম্ভব।

জীবে দয়ায় পীর ছাহেব কেবলা

জাতি ধর্ম নিবিশেষে সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যেমন ধর্মের অঙ্গ, অন্যান্য সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও তেমনি ধর্মের বিধান। কুরআন পাকে উলে-খ রয়েছেঃ

"জমিনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়েনা যাতোমাদের মত উম্মত নয়" তারা সবাই তোআদের মতই এক একটি শ্রেণী (সূরা আনয়ামঃ ৩৮)।

পরস্পর একে অন্যের প্রতি জুলুম না করার জন্য আল াহ পাক যেমন মানুষকে হুকুম দিয়েছেন, ঠিক তেমনি এ হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, জমীনে বিচরণশীল প্রাণী এবং আকাশে উড়ন্ত পাখীর প্রতিও তারা যেন জুলুম অত্যাচার না চালায়। তবে হিংস্র ও রক্ত পিপাসু পশু পাখীর কথা আলাদা।

হযরত নবী করীম (দঃ) বলেছেন, "একটি স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কারণ সে একটি বিড়ালকে বেধে রেখে অনাহারে মেরে ফেলেছিল"। তিনি আরও বলেছেন, "একটি স্ত্রীলোকের গুনাহ আল াহ পাক মাফ করে দিয়েছিলেন, কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি খাওয়াইয়েছিল।"

কুরআন-হাদীসের এইসব উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন সৃষ্টি জীবের প্রতি অন্যায় আচরণ করা বৈধ নয়, বরং যথাসাধ্য তাদের প্রতি দয়া দেখানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

আল াহ পাকের মাহবুব বান্দাদের জীবনেতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় তাঁরা আল াহর সকল সৃষ্ট জীবের প্রতিই মহব্বত রাখেন। মরহুম পীর ছাহেব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন- আল াহকে ভালবাসার অর্থ হল তাঁর সকল সৃষ্ট জীবকে ভালবাসা। তাই দেখা যায় তাঁর ভালবাসা, øেহ, মমতা শুধু মানুষের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, পশু-পক্ষী এমনকি কীট পতঙ্গের বিপদেও তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যেতো।

হযরত পীর ছাহেব কেবলাকে অনেকে মোরগ, বকরী, গরু, মেষ ইত্যাদি দান করত। সেগুলো কোন সময় রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, ক্ষুধায়, পিপাসায়, শীতে অথবা যে কোন কারণে কষ্ট পাচ্ছে দেখতে পেলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সুবন্দোবস্ত করা না হত ততক্ষণ

তিনি স্বস্তি পেতেননা। অকারণে কোন গরু, ছাগলকে কেউ আঘাত করলে তিনি রেগে যেতেন এবং কঠিনভাবে তাকে ধমক দিতেন।

একদিন হুজুর কেবলা কুতুবখানার বারান্দা হতে ভিতরে যাওয়ার সময় একটি বিড়াল তাঁর পায়ের নিচে পড়ে যায়। তিনি বিড়ালটিকে রক্ষা করতে গিয়ে একপার্শ্বে মাটিতে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলেন। কিন্তু নিজের ব্যথার কথা বিন্দু মাত্র প্রকাশ না করে বিড়ালটি ব্যথা পেয়েছে কিনা বার বার একথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

হুজুর কেবলার জামাতা মরহুম মাওলানা গোলাম রহমান ছাহেব বর্ণনা করেন যে, একদিন মরহুম হুজুর কেবলা বারান্দায় বসে অজু করছিলেন। সেই সময় কয়েকটি পিঁপড়া অজুর পানির সাথে ভেসে যেতে লাগল।

এটি দেখা মাত্র তিনি অস্তির হয়ে পড়লেন এবং যতক্ষণ সেগুলোকে পানি থেকে সরায়ে শুকনা জায়গায় রাখা না হল ততক্ষণ তিনি শান্ত হলেননা।

পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির প্রতি মরহুম হুজুরের এরূপ দয়াপ্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এসব ছোট ছোট ঘটনা অনেকের কাছে নেহায়েত তুচ্ছ ও মামুলী মনে হতে পারে। তবে কুরআন-হাদীসের আলোকে এসবের মধ্য দিয়ে তাঁর মাঝে প্রকৃত ইসলামী চরিত্রের যে উজ্জ্বল জ্যোতি বিকশিত হচ্ছে সেটি অতুলনীয়।

মানবসেবার উজ্জ্বল প্রতীক

হেমায়েতে ইসলাম তহবিল ঃ

১৯৪৫ সালের কথা। জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক সস্ত্রীক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় প্রতিবেশী হিন্দুগণ ষড়যন্ত্র করে দুটি শিশু সন্তানসহ তার স্ত্রীকে অপহরণ করে এবং তার গৃহ লুটপাট করে। যুবকটি স্থানীয় মুসলমানদের শরণাপন্ন হল। তারা তাকে নিয়ে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কাছে হাজির হল। সবকিছু শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর দয়ার্দ্র অন্তর কেঁদে উঠল। তিনি অনুধাবন করলেন ঘটনার গুরুত্ব। কেবলই ভাবতে লাগলেন কিভাবে যুবকটির অপহৃতা স্ত্রী- সন্তানদের উদ্ধার করা যায়, তার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা যায় এবং স্বজাতির আক্রমণ ও আক্রোশ থেকে তাকে বাঁচানো যায়? এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সামগ্রী এবং উদ্যোগী উদার জনবল কোথায়? যাই হোক, পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে যা ছিল তা-ই ঐ যুবককে প্রদান করলেন এবং অপরকেও যথাসাধ্য সাহায্য করার অনুরোধ জানালেন। এতে সাময়িকভাবে কিছু টাকার সংস্থান হল, সমস্যার কিছুটা লাঘব হল।

উক্ত ঘটনার পর হতেই নব্য অসহায় মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে কীভাবে স্থায়ী কার্যকরী সমাধান খুঁজে বের করা যায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সে ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে উঠেন। এই সব নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য আজও যেমন কোন কার্যকরী সংগঠন নেই, তখনও ছিলনা। সূ²দর্শী ওলীয়ে কামেল সেদিন সত্যই অনুধাবন করেছিলেন যে, এই সমস্ত অসহায় বিপন্ন লোকদের যথাসময়ে যদি প্রয়োজনমত সাহায্য সহায়তা না করা যায় তবে তারা হয়ত ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পুনরায়

ধর্মান্তরিত হয়ে পড়বে। কিছুদিন পর পটুয়াখালী টাউনের কাছে কালিকাপুর গ্রামে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তাঁরই নির্দেশে নবদীক্ষিত মুসলমানদের সাহায্যার্থে একটি তহবিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করা হলে উপস্থিত সকলে সেটি স্বতঃস্ফ,র্তভাবে সমর্থন করে। পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) নিজেই তহবিলের বুনিয়াদ স্বরূপ প্রথমে পাঁচশত টাকা প্রদানের প্রতিশ্র"তি দেন। এতে উৎসাহিত হয়ে উপস্থিত অনেকেই উক্ত তহবিলে সাধ্যানুযায়ী টাকা পয়সা দান করেন এবং ভবিষ্যতে উক্ত তহবিলটিকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার প্রদান করেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা উক্ত তহবিলটির নাম দিলেন

"হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মরহুম পীর ছাহেব কেবলার উপরই উক্ত তহবিল পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। তিনি সেটি সানন্দে গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে এবং তাঁর অনুগত ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় এই তহবিল ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠে। অল্প দিনের মধ্যেই তহবিলের টাকার পরিমাণ ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

"হেমায়েতে ইসলাম" তহবিলটি তৎকালীন সময়ে সমাজের কতটুকু খেদমত করেছে তা একটু খেয়াল করলেই অনুধাবন করা সম্ভব। যে নও মুসলিমকে উপলক্ষ করে এই তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার স্ত্রী-পুত্র ও সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রায় ছয় হাজার টাকা ব্যয় হয়। এ ছাড়াও বহু নও মুসলিমকে তার পড়াশুনার খরচ হিসেবে এই তহবিল হতে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হত।

"হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল যদিও মূলতঃ দরিদ্র নব্য মুসলিমদের বিভিন্ন অসুবিধা দূরীকরণার্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এই তহবিলের অর্থ অন্যান্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয়েছে।

'নেজামে ইসলাম' কায়েম করতে হবে, এই দৃঢ় প্রতিশ্র"তি নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন তখন খুব বেগবান। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানগণ প্রদেশে-প্রদেশে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামদিবস পালন করছিল তখন কলিকাতার হিন্দুরা তাদের উপর এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সূত্রপাত করে। এতে বহু মুসলমান হতাহত হয় এবং বহু পরিবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। সেই সময় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সেবার জন্য মাননীয় এ.কে.ফজলুল হক সাহেব কলিকাতায় যে রিলিফ ফান্ড গঠন করেন সেখানে দুঃস্থ মানবতার সেবায় এতদাঞ্চল থেকে যিনি সকলের আগে সাড়া দিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন- জনদরদী মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলা। "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল হতে তিনি বহু অর্থ উক্ত রিলিফ ফাণ্ডে দান করেছিলেন।

অল্প কিছুদিন পরই ঘটল বিহারের মর্মান্তিক দাঙ্গা। পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী হিন্দু স¤প্রদায়ের নৃশংস হামলায় হাজার হাজার মুসলমান নিহত হল। বহুলোক নিরাশ্রয় ও বিপন্ন হয়ে পড়ল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ঐ ঘটনা শ্রবণ করে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁরই নির্দেশে "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল হতে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল অনতিবিলম্বে বিহারে পাঠানো হয়।

এরপর আসল সিলেটের গণভোট। হিন্দুগণ কংগ্রেস সমর্থিত ওলামাদের সহায়তায় সিলেট জেলাটি যাতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হয় তার প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। সেদিন তাদের সকল হীন ষড়যন্ত্র ছিন্ন করার সংকল্প নিয়ে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁর জ্যেষ্ঠ ছাহেবজাদা পীরে মরহুম হযরত আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রঃ)-এর নেতৃত্বে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করে জাতির যে উপকার করেছিলেন তা চিরদিন ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। সেই অভিযানের সকল ব্যয় "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল হতে নির্বাহ করা হয়।

পাকিস্তান অর্জনের পর পরই ছারছীনা শরীফে যে বিরাট ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার সমুদয় ব্যয়ভারই এই "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল হতে বহন করা হয়। এ ছাড়াও নোয়াখালীতে প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, চট্টগ্রামে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিলের খেদমত বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বর্তমানে সৌদী আরব একটি তেলসমৃদ্ধ ধনী দেশ। কিন্তু বেশি দিন আগের কথা নয় যখন এর অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল গরীব। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হত। ছারছীনার মত এক নিভৃত পল্লীতে বসেও মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাদের কথা চিন্তা করতেন। "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল হতে মক্কা ও মদীনা শরীফের কতগুলো বিশিষ্ট পরিবারকে প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে অর্থ সাহায্য দেওয়া হত। মদীনা শরীফে শায়খুস সায়াদাতের নামে পৃথকভাবে টাকা পাঠানো হত। ছৈয়দ পরিবারের খেদমত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা অত্যন্ত সূ²দর্শী ছিলেন। "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিলের অর্থ বাড়ানোর জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে একটি বস্ত্রবয়ন প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। সেখানে শাড়ী, চাদর, মশারী, লুঙ্গি ইত্যাদি তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করে সে অর্থ তহবিলে জমা রাখা হত। সমাজের উপকারার্থে তাঁর এই মহান উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

মক্কা শরীফের রিলিফ ফান্ড ঃ

সৌদী আরব আমাদের প্রিয় নবীর দেশ। স্বাভাবিকভাবেই এই দেশটির প্রতি প্রতিটি মুসলমানের দরদ রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে এ দেশের অবস্থা আগে মোটেই ভালো ছিলনা। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা "হেমায়েতে ইসলাম" তহবিল ছাড়াও বিভিন্নভাবে ঐ দেশে সাহায্য পাঠান। ঐ দেশের জনগণকে সহায়তা করার জন্য ১৯৪১ সনে "মক্কাশরীফের রিলিফ ফাণ্ড" নামে তিনি একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেন। তাঁর আবেদনে বহু টাকা পয়সা এই তহবিলে জমা হত। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মক্কা ও মদীনা শরীফে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ খবরে পীর ছাহেব কেবলা বিচলিত হয়ে পড়েন। ভক্তদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে উক্ত তহবিলে টাকা প্রদানের জন্য জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করেন। ঐ সময় তিনি নিজ পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকেও অর্থ আদায় করেন। আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় একান্ন হাজার টাকা। সেই আমলে বহির্ভারতে মাসে এক ব্যক্তির নামে এক হাজার টাকার অধিক প্রেরণ করা আইনানুসারে নিষিদ্ধ ছিল। তাই ভিন্ন ভিন্ন নামে টাকা পাঠিয়ে তিনি সে দেশের দরিদ্র মানুষের অশেষ উপকার সাধন করেন।

ঐ সময় হেজাজের আবদুল আজিজ ইবনে সউদের সরকার একটি খাদ্য রিলিফ পরিচালনা করতেন। উক্ত তহবিলেও মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মোটা অংকের অর্থ সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। বাদশাহ সরকারিভাবে পত্রযোগে কৃতজ্ঞতা সহকারে তার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

উক্ত তহবিল হতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা প্রায় অর্ধ লাখ টাকা বিভিন্ন উপায়ে মক্কা মদীনা শরীফে প্রেরণ করেন। পরে যখন তিনি হজ্জ করতে যান সে সময়ও উক্ত তহবিল হতে সাহায্যের নিমিত্ত প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা সাথে নিয়ে যান। সে টাকা তিনি নিজে সেখানকার গরীব দুঃখীদের মাঝে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করেন। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ প্রদান করেন তন্মধ্যে ছাওলাতিয়া মাদরাসা ও খায়রিয়া আরাবিয়া মাদরাসা বিশেষ উলে-খযোগ্য।

মদীনা শরীফে মরহুম পীর ছাহেবের নামে একটি পানি বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। এই পানি বিতরণ কেন্দ্রের জন্য প্রতি মাসে পৃথক টাকা পাঠানো হত। এই অর্থ প্রদান করে তিনি বায়তুল াহ শরীফের প্রতিবেশী এবং মদীনা শরীফের রওজা মোবারকের প্রতিবেশীগণের খেদমত জুগিয়েছিলেন।

অন্যান্য দান তহবিল ঃ

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বাড়িতে অথবা ছফরে যেখানেই থাকতেন না কেন মানুষ তাঁকে ঘিরে রাখত। যখনই কোন গরীব-দুঃখী তাঁর কাছে সাহায্যের হাত বাড়াত, তিনি কখনও তাদের নিরাশ করেননি। সর্বসাধারণ গরীব-মিছকিন ও বিপন্নকে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি সাধারণ দান তহবিল গঠন করেন। এটি একান্তই তাঁর নিজস্ব ছিল। নিজের আয় থেকে একটি অংশ নিয়ে এই তহবিলের অর্থ যোগান দিতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে হাদিয়া গ্রহণে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাই কোন মানুষ মিথ্যা বলে তাঁকে টাকা দিতে পারে এই সন্দেহে তাঁর আয় থেকে আরও অতিরিক্ত কিছু অংশ এই তহবিলে জমা দিয়ে দিতেন। অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত অথবা বিপদগ্রস্ত হলে মানত করে আল াহর ওয়াস্তে হুজুরকে যে

টাকা দিতেন, তিনি তা নিজের জন্য খরচ না করে এই দান তহবিলে জমা দিতেন। এই তহবিলটির বিভিন্ন বিভাগ ছিল, যেমন "বস্ত্র বিতরণ তহবিল", "যাকাতে নাফেলা" ইত্যাদি।

এই তহবিলের নিয়মিত কোন হিসাব রাখা হতনা। প্রায় প্রতিদিনই গরীবদের এখান থেকে বস্ত্র, শাড়ী, খোরাকী, পথখরচ ইত্যাদি প্রদান করা হত। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার খলিফা মরহুম হযরত আব্দুল বারী ছাহেব বলেনঃ 'আমি বাংলা ১৩৫৬ সনে হুজুরের সঙ্গে ছফরে থাকিয়া একদিন এই তহবিলের দান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই তহবিল হইতে এক হাজার টাকার শাড়ী কাপড় দান করা হইয়াছে এবং প্রতি মাসে একশত টাকার লুঙ্গি কাপড় দান করা হয়। তিনি দরবার শরীফে বসিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থা বুঝিয়া মিছকিনদিগকে নিজ হাতে দান করিতেন। এই তহবিল হইতে দেশে বিদেশে গরীবদের জন্য মানি অর্ডার ও ইনস্যুরেন্স যোগেও বহু টাকা পাঠানো হইত।'

নোয়াখালী জিলার রশিকপুরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন বড় আলেম মাওলানা মুহিব্বুল াহ ছাহেব এক সময় খুব অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারও কাছে নিজের অবস্থা ব্যক্ত করে সাহায্য চাইতে তার মনে চাইলনা। শুধু বিভিন্ন দোয়া দরুদ পড়ে আল াহ পাকের দরবারে তার অভাব মোচনের প্রার্থনা জানাতেন। হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখেন তিনি একটি মসজিদের এক কোণে চিন্তিতভাবে বসে আছেন। এমন সময় হযরত নবী করীম (দঃ) সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি এরূপ চিন্তিত কেন? উত্তরে মাওলানা ছাহেব অত্যন্ত বিনীতভাবে তার অভাব ও কর্জের কথা হুজুর (দঃ)-কে জানালে তিনি বলেন- ছারছীনায় নেছারুদ্দীন নামে আমার এক প্রিয় সন্তান আছে-তাঁর কাছে তোমার অভাবের কথা জানিয়ে দিলে সে তোমায় সাহায্য করবে। মাওলানা ছাহেব বললেন-ইয়া রাসূলুল াহ, আমার ত পাঁচ শত টাকার দরকার, এত টাকার সংস্থান কি করে হবে? এ কথা শুনে হযরত নবীয়ে করীম (দঃ) উত্তর দিলেন-নেছারুদ্দীনকে তুমি কি মনে করেছ? সে আমার সুন্নতের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। গরীব-দুঃখী অভাবগ্রস্তদের সাহায্য সহায়তা আমার একটি বড় সুন্নাত। মনে রেখ, এটি পালনে নেছারুদ্দীন অগ্রগামী। মাওলানা ছাহেব স্বপ্নের কথা মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে জানালে রাসূলে পাক (দঃ)-এর মহব্বতে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন তখনই পাঁচ শত টাকা জোগাড় করে বললেন- এখনই ইনসিওর করে পাঠিয়ে দাও। এরূপ হাজার হাজার টাকা তিনি মানি অর্ডার করে পাঠিয়েছেন।

নোয়াখালী হতে মুন্সি কলিমুল াহ্ নামে একজন গরীব লোক হুজুর কেবলার নিকট পত্র দিলেন-"হুজুর, আমি একজন গরীব মুসলমান, স্ত্রী পুত্রাদি সহ টাকার অভাবে কষ্ট পাইতেছি। এই বিষয়ে হুজুরের নিকট দোয়া চাহিতেছি। হুজুর কেবলা পত্র পেয়ে তার নামে প্রয়োজনীয় অর্থ মানি অর্ডার যোগে পাঠিয়ে দেন।

মাওলানা মোহাম্মদ এরশাদ নামে মেদিনীপুরে একজন তেজস্বী আলেম ছিলেন। মুরীদ হওয়ার জন্য তিনি ছারছীনায় আসেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে তরীকায় বহুদূর অগ্রসর হন। হঠাৎ তিনি রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কয়েকদিন পরই ইন্তেকাল করেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সেই তরুণ আলেমটির ইন্তেকালে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। উক্ত মাওলানা সাহেবের একটি শিশুপুত্র, স্ত্রী ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন। হুজুর কেবলা দীর্ঘদিন ধরে সেই বিপন্ন পরিবারকে নিয়মিত অর্থসাহায্য পাঠাতেন।

একবার মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কোন এক গরীব মুরীদ হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তার তেমন কোন অর্থ-কড়ি যোগাড়ের সঙ্গতি ছিল না। হুজুর কেবলা একথা জানতে পেয়ে ঐ ব্যক্তির হজ্জে যাওয়ার সমুদয় খরচ বহন করেছিলেন।

হুজুর কেবলার দরবারে বহুলোক নিয়োজিত থাকত। কেউ বাবুর্চিখানায় কাজ করত, কেউ গরু, বকরী পালন করত- কেউ বা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকত। হুজুর তাদের সকলের প্রতি সমভাবে খেয়াল রাখতেন এবং তাদের প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে কাছে ডেকে তার

পরিবারের সংবাদ নিতেন এবং তাদেরকে সাধ্যমত দান খয়রাত করতেন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে তাদেরকে ডেকে পরিবারের লোকজনদের কাপড়- চোপড় কিনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে বাড়ি থেকে ঘুরে আসার নির্দেশ দিতেন। তাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ উৎসবে টাকা পয়সা দান মরহুম পীর ছাহেব কেবলার চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

দুর্ভিক্ষের সময় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের জন্য ব্যাপক সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ঐ সময় এলাকার সচ্ছল লোকদের আহŸান করে সবাইকে নিয়ে "পঞ্চগ্রাম সাহায্য সমিতি" গঠন করেন। সেই সমিতির মারফত অভাবগ্রস্তদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে সুষ্ঠুভাবে দান-খয়রাতের ব্যবস্থা করেন।

বাংলা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বরিশালে তিনি একটি লঙরখানা কায়েম করেছিলেন। মানুষের সেই দুর্দিনের সময় তিনি নামেমাত্র যৎসামান্য আহারাদি করতেন। গরু-বকরী, আম-কাঁঠাল, মাছ ইত্যাদি যা কিছু দরবারে আসত সেগুলো বিক্রি করে সমুদয় টাকা তিনি রিলিফ ফান্ডে জমা দিয়ে দিতেন।

এ ছাড়াও মরহুম পীর ছাহেব কেবলা গোপনে অনেক অভাবগ্রস্তকে ডেকে দান করতেন। অনেক সময় এমন হয়েছে- গরীব-দুঃখী দেখে তাকে কাছে ডেকে না দেখেই পকেট থেকে মুঠ দিয়ে টাকা তুলে দান করতেন এবং সাথে সাথে চলে যেতেন। তাঁর এই দান করার আদতটি যেন সেই হাদীসেরই অনুশীলন- 'এমন গোপনে দান কর যেন অন্য হাত না জানে'।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দান-খয়রাতের কথা লিখে শেষ করা যাবেনা। বস্তুতঃ যখনই তিনি কারও দুঃখ কষ্ট দেখেছেন, কারও বিপদ আপদের কথা শুনেছেন তখনই সেটিকে লাঘব করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে তৎপর হয়ে উঠতেন। কোন কিছু করা সম্ভব না হলে অন্ততঃ দুহাত তুলে আল াহর কাছে মুনাজাত করতেন।

মদীনা শরীফে বাংলাদেশী হাজীদের থাকার খুব কষ্ট হত। এটি লক্ষ্য করে দরদী পীর ছাহেব কেবলা একটি মুসাফীরখানা তৈরীর কাজে হাত দেন। তিনি প্রাথমিকভাবে এ কাজের জন্য একটি কমিটি গঠন করে "বার হাজার সাতশত রিয়াল" তাদের কাছে রেখে আসেন। বর্তমানে সেখানে মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- বাঙ্গালী হাজীদের কষ্ট অনেক লাঘব হয়েছে।

হযরত নবী করীম (দঃ)-এর কাছে যখন কোন হাদিয়া আসত সেগুলো গরীব দুঃখীদের মাঝে বিতরণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। মনে হত এ সবের তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই। তাকওয়া অনুশীলনে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ছিলেন অনেক উর্ধ্বে। তাই হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতি সতর্ক। এতদসত্তে¡ও কোন কোন সময় প্রচুর অর্থ ও বিভিন্ন সামগ্রী তাঁর হাতে আসত। তখন একদিকে তিনি মহান আল াহর দরকারে কৃতজ্ঞতা জানাতেন, অপরদিকে মুক্তহস্তে দান-খয়রাত করে নির্মল আনন্দ অনুভব করতেন। মাঝে মাঝে উক্ত অর্থ গরীব-দুঃখীদের মাঝে এত বেশি বিতরণ করে দিতেন, মনে হত এসব অর্থের তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই, ঘর-সংসার ছেড়ে তিনি বুঝি অন্য কোথায়ও চলে যাবেন। মুত্তাকীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল াহ পাক বলেন ঃ

"এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি সেখান থেকে তারা দান করে"

-(সূরা বাকারাহ)।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ছিলেন আল্লাহর ওলী। তাই আল্লাহর মেহেরবানীতে তাঁর কাছে যে অর্থ-সামগ্রীর সমাগম হত সেখান থেকে গরীব-দুঃখীদেরকে অযাচিত দান-খয়রাত করে কুরআন পাকের উক্ত আয়াতের পুরোপুরি হক আদায় করতে সদাসর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরীব-দুঃখীদের প্রতি মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সহমর্মিতা আর সমবেদনার শত শত ঘটনা রয়েছে। সবগুলো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হবে।

দরবার ও পরিবারে দানের অনুশীলন ঃ

গরীব দুঃখীদের প্রতি হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দয়া প্রদর্শন সত্যিই এক বিরল দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল। দরবারের লোকজন এবং নিজ বাড়িতে পরিবারের সবাই যাতে একইভাবে দয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় সেজন্যও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। দু'একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই এর সত্যতা মিলেঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জ্যেষ্ঠ ছাহেবজাদা পীরে মরহুম হযরত মাওলানা শাহ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রঃ)-এর বিয়ের সময় সবাই আশা করেছিলেন যে, মেহমানদের আহারাদির ব্যবস্থা সাধারণ না হয়ে কিছুটা জাঁকজমকপূর্ণ হবে। তাই দরবারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হুজুরের কাছে কিছুটা ঘি এবং আধমণ দুধের প্রস্তাব দিলেন। সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯৪১ সাল। ভোলায় তখন এক ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। অসংখ্য লোক ও গবাদি পশুর প্রাণ হানি হয়, বহু ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বন্যাপীড়িতগণের জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। সেই মুহূর্তে উক্ত আয়োজনের প্রস্তাবে তিনি জবাব দিয়েছিলেন- "বাবা, দেশের লোক আজ বিপন্ন, তাদের খাওয়া-পড়ার খুব অভাব। তারা ভাতের ফেন পর্যন্ত পায়না। আর এই অবস্থায় আমি আমার ছেলের বিয়েতে ঘি খরচ করে জৌলুস করব, তা হতে পারে না।" হুজুরের কথাগুলো যুক্তিযুক্ত হলেও অনেকের মনে কিছুটা আক্ষেপের ভাব রয়ে গেল। তিনি সেটি বুঝতে পেরে সকলকে বিপন্নদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা এবং আল াহ পাকের কাছে এর পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যাই হোক্, পরিশেষে তিনি বললেন, "তোমাদের ঘি-এর টাকা আমি মঞ্জুর করলাম। তবে আমি যদি উক্ত অর্থ এবং দুধের পরিবর্তে নাস্তায় নারিকেল ব্যবহার করে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ তোমাদের পক্ষ হতে রিলিফ তহবিলে দান করে দেই তবে তোমরা সকলে খুশী হও কিনা?" দুঃখী জনগণের প্রতি হুজুর কেবলার এরূপ কথা শুনে সকলেরই হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তাঁর কথায় সবাই কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর মতকেই সমর্থন করলেন। তখন ঘি এবং দুধের টাকা রিলিফ ফান্ডে জমা দেয়া হল।

দরবারের মরহুম মুফতী আবদুল মজিদ ছাহেব থেকে জানা আরও একটি ঘটনাঃ তিনি বলেন- ভোলার বন্যার কয়েক মাস পরে আমি একদিন হযরত পীর ছাহেব কেবলার কাছে আরজ করলাম- "হুজুর, বহুদিন যাবৎ দরবারে খাসী বকরী জবাই হয়না, আমরা একটি খাসী জবাই করতে চাই।" হুজুর কেবলা সবাইকে ডেকে বললেন, "বাবারা, ভোলার লোক না খেয়ে মরিতেছে, আর তোমরা খাসী খেতে চাও? যাও, খাসিটি বিক্রি করিয়া সেই টাকা রিলিফ ফান্ডে জমা দাও।"

হুজুর কেবলার নির্দেশে দরবারের জনৈক খাদেম খাসিটি বিক্রি করার জন্য রওয়ানা হলে মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেব মনে মনে বললেন- খাসিটি যদি আমি ক্রয় করে সেই টাকা রিলিফ ফাণ্ডে জমা দেই এবং পরে সেই খাসিটি জবাই করি তবেত হুজুরের কথাও রক্ষা হল, দরবারের লোকদের ইচ্ছাও পূরণ হল। একথা মনে করে তিনি খাসিটি কিনে নিলেন। খাসির টাকা রিলিফ ফান্ডে জমা হ'ল। কিছুদিন পর হুজুর কেবলার কাছে সকল ঘটনা খুলে বলে উক্ত খাসিটি জবাই করার অনুমতি চাইলে তিনি এবারও একই কথা বলে সবাইকে নিষেধ করলেন। অগত্যা খাসিটি পুনরায় বিক্রি করে সমুদয় টাকা রিলিফ ফান্ডে জমা দেয়া হল।

দেশের অভাব-অনটন এবং বিপদ-আপদের সময় তিনি পরিবারবর্গকেও সংযমী হওয়ার উপদেশ দিতেন। কখনও কখনও বাড়ির ভিতরে গোস্ত কিংবা পিঠা খাওয়া বন্ধ করে দিতেন।

তিনি বলতেন- "দেশের লোক ভাত পায়না, এ সময় আয়োজন করে ভালো খাওয়া ত্যাগ করো।" একবার দুর্ভিক্ষের বহু দিন পর্যন্ত বাড়ির ভিতরে কোন পিঠা বা মিষ্টান্ন তৈরী হয়নি।

একবার ঈদ উপলক্ষ্যে বাড়ির ভিতরে ছেলে মেয়েরা কিছু খাওয়ার আয়োজন করেছিল। তখন পীর ছাহেব কেবলা বরিশালের বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য রিলিফের টাকা পয়সা সংগ্রহ করে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। সেই সময় বাড়িতে ঈদের বরাদ্দ হতে খরচের একাংশ রিলিফ ফান্ডে জমা দিয়ে সকলকে ডেকে বললেন- "ঈদের খুশীতে সবাইকে সামিল করতে হয়। এস আমরা সবাইকে নিয়ে ঈদ করি।" কথাটি ছোট্ট। কিন্তু এ যেন আল াহ পাকের প্রিয় হাবিবের কথার প্রতিধ্বনি। একবার ঈদের দিনে হযরত নবী করীম (দঃ) একটি দুঃখী এতিম ছেলেকে কোলে নিয়ে এসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "আয়েশা, এটি তোমার ছেলে।"- অর্থাৎ এই দুঃখী ছেলেটিকে আমাদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক রাখ।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ছোট্ট একটি বিষয়ের উলে-খ করছি। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

"এবং তোমরা গরীব-মিছকীনদের খাদ্য (অন্ন-বস্ত্র) প্রদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করনা" - (সূরা আল ফজর ঃ ১৮)

আমরা অনেক সময় নিজেরা ধর্ম-কর্ম করি, দান-খয়রাত করি; কিন্তু পরিবারে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বন্ধু বান্ধব বা অধীনস্তদের সেই সব কাজের জন্য তাকিদ দিইনা এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করিনা। এতে ঘরে এবং নিজের চারিপাশে ঐসব আমলের অনুক‚ল পরিবেশ সৃষ্টি হয়না, ফলে উক্ত সৎ আমলটি পরিবারে এবং সমাজে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। উপরের আয়াতে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর দৃষ্টি ছিল অতি সূ²। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দান-খয়রাত করেই ক্ষান্ত হননি, পরিবারের সকল সদস্য এবং ভক্তবৃন্দের মাঝেও যাতে দানের অনুশীলন স্থায়ীভাবে জারী থাকে সেজন্য তাদেরকে সদাসর্বদা উপদেশ-উৎসাহ প্রদান করতেন।

কৃতজ্ঞ বিনয়ী দাতা ঃ

পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলা বাড়িতে, ছফরে যেখানেই থাকতেন, সব সময়ই তাঁর চারপাশে লোকের ভীড় জমে থাকত। গরীব মিছকিনের সমাগম এত বেশি হত যে, তাদেরকে ঠেকানোই কষ্টকর হত, অথচ তিনি তাদের প্রতি কখনও বিরক্ত হতেন না অথবা কোনদিন তাদেরকে কোন কড়া কথাও বলেননি। তাদের বিরক্তি নীরবে সহ্য করতেন। মনযোগ সহকারে সকলের অভাব-অভিযোগ শুনে অবস্থানুযায়ী দান খয়রাত করতেন। বৃদ্ধ বয়সে যদিও তার অধিক কথা বলতে কষ্ট হত, তথাপি শুধুমাত্র গরীব দুঃখীদের মনতুষ্টির জন্য তিনি মনযোগ সহকারে তাদের কথা শুনতেন। পীর ছাহেব কেবলার কষ্ট দেখে দরবারের কেউ যদি কখনও কোন খয়রাতীকে সামান্য ধমক দিত অথবা একটু 'চড়া' কথা বলত তখনই হুজুর কেবলা তাকে বাধা দিয়ে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে বলতেন- 'বাবারা, আপনারা রাগ করেন কেন? এরা ত আপনাদের কাছে কিছু চায়না'।

কুরআন পাকে রয়েছে- "ভিক্ষুককে ধমক দিওনা" (সূরা দোহা ঃ ১০)

গরীব-দুঃখীদের প্রতি মরহুম পীর ছাহেব কেবলার অস্বাভাবিক বিনয় আর মধুর ব্যবহার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কেবলই মনে হত তাদের ব্যাপারে হুজুর কেবলা যেন ভীষণভাবে ভীত এবং দুর্বল। মিছকিনের প্রতি বিরক্ত আর কঠোর হওয়া ত দূরের কথা, তাদের সম্পর্কে আল াহ পাকের উপরোক্ত হুকুম তিনি যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হলেন কিনা সে নিয়েই সদা-সর্বদা শংকিত থাকতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা খয়রাতীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতেন সেটি বুঝানোর জন্য তাঁর খলিফা মরহুম হযরত আবদুল বারী ছাহেবের লিখা হুজুরের জীবনী থেকে ছোট্ট একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো।

একদা একজন মিছকিন খয়রাতের জন্য হাত বাড়ালে পীর ছাহেব কেবলা তাকে দুটি টাকা দিলেন। লোকটি আরও অধিক সাহায্যের জন্য আব্দার করলে হুজুর তাকে আরও দু'টি টাকা দিলেন। সে এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পুনরায় আব্দার জানাল। তখন হুজুর কেবলা সামান্য বিরক্তি সহকারে বললেন, 'বাবা, আর কত কষ্ট দিবেন? এবার চলে যান।' লোকটি আর কিছু না বলে চলে যায়। সে কিছুদূর যেতে না যেতেই হুজুর কেবলা অন্য একজন লোক মারফত তার জন্য আরও দু'টি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। ঐদিনই বিকালে উক্ত লোকটি দরবার শরীফে আসলে হুজুর কেবলা তাকে ডেকে নিয়ে বললেন- 'বাবা, সকাল বেলা আমি আপনার উপর খানিকটা রাগ করেছিলাম, আপনি নিশ্চয়ই মনে ব্যথা পেয়েছেন। আমাকে আল াহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন।' হুজুরের মত বিরাট ব্যক্তিত্বের অকারণে এমন মিনতি সহকারে ক্ষমা ভিক্ষা সেই মিছকিন ব্যক্তিটিকে বিস্ময়াবিভূত করে তুলল। লজ্জায় সে সংকুচিত হয়ে পড়ল। সে বার বার অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলতে লাগল- 'হুজুর, আমি মনে কোন ব্যথা পাই নি।' হুজুর কেবলা তখন বললেন- 'আমি কোন কথাই শুনতে চাইনা, আপনি সকলের সামনে মুখ খুলে বলুন আপনি আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।' বার বার পীড়াপীড়িতে অগত্যা লোকটি যখন বলল- 'হুজুর, আপনাকে আমি আল াহর ওয়াস্তে মাফ করে দিলাম', তখন তিনি শান্ত হলেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনে এরূপ ঘটনা বহু ঘটেছে। এগুলো খুবই সাধারণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের যে সূ² দিকটি ফুটে উঠেছে, তার তুলনা কোথায়? দান গ্রহীতা সাধারণতঃ দাতার প্রতি বিনীত এবং মুখাপেক্ষী থাকে, সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম- ছওয়ালকারী বিরক্ত করে, কষ্ট দেয় আর দাতা তার প্রতি বিনীত; শুধু তাই নয়, তাঁর কোন কথায় বা আচরণে ছওয়ালকারী কোন কষ্ট পেল কিনা তা নিয়ে তিনি সদা ভীত-শংকিত। বিচিত্র নয়কি! তবে বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করলে দান গ্রহীতার প্রতি মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এই মন মানসিকতা অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষকে আল াহ পাক ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সেখান থেকে তারই মঙ্গলের জন্য গরীব মিছকিনকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই দান করার মাঝে সত্যিকার অর্থে দাতার কৃপা বা অনুগ্রহ প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই। এটি নিতান্তই তার প্রতি আল াহ পাকের একটি নির্দেশ-একটি ইবাদত। দানের সাথে দান গ্রহীতার প্রতি দাতার অনুগ্রহ মিশ্রিত থাকলে সেটিকে মূলতঃ দান বলা যায় না; বরং সেটি নিজেকে প্রচার বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের একটি কৌশল মাত্র। এজন্যই কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এই দান আল াহ পাকের দরবারে গৃহীত হয়না, বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। সত্যিকার দাতা দানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। আল াহ পাক তাকে অনুগ্রহ করে ধন-সম্পদের মালিক করেছেন, তার অন্তরে দান করার মত একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদতের স্পৃহা যুগিয়েছেন এবং দয়া করে দান গ্রহীতাকে তার সামনে এনে এই ইবাদতটি সম্পন্ন করার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাই দান করে গর্বিত হওয়া ত দূরের কথা, তিনি মহান আল্লাহর প্রতি চির কৃতজ্ঞ এবং দান গ্রহীতার প্রতি বিনীত থাকেন। উপরন্তু এই ইবাদতের হকগুলো ঠিকমত পালন করতে পেরেছেন কিনা সে সম্পর্কে তিনি সব সময় ভীত থাকেন। বস্তুতঃ প্রকৃত দানের স্বরূপ এটিই। সুবহানাল াহ! মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মাঝে এটি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এজন্যই এতবড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও গরীব মিছকিনদের সাথে এরূপ বিরল আচরণ প্রদর্শন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আল াহ পাক আমাদের সবাইকে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আদর্শ সামনে রেখে নির্মল দান-খয়রাত করে আল াহর সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দিন, এই কামনা করি।

আমরা কোথায়?

মানুষের জন্য মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মমত্ববোধ বিশেষ করে অভাবগ্রস্ত গরীব-দুঃখীদের দুঃখ মোচনে তাঁর যে আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল তা অকল্পনীয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি

মহানুভবতার এক বিরল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গিয়েছেন। এসব ঘটনা আমাদের নবী-রাসূল এবং পুরানো দিনের অলী-দরবেশদের চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজ যদি আলেম সমাজ এবং অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসহায় আর্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতেন তাহলে আমাদের এই দরিদ্র দেশের চেহারা হয়ত কিছুটা অন্যরূপ হত। প্রায় প্রতি বছরই আমাদের দেশটি বন্যাকবলিত হয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়, মানুষের কষ্টের অন্ত থাকে না। কিন্তু তাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে, তাদের দুঃখমোচনে আন্তরিক হয়ে কতজন আলেম, সমাজকর্মী বা কয়টি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন?

প্রথম জীবনে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিলনা। তথাপি শুধুমাত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের উপদেশ উপেক্ষা করে নিজের আয়ের উৎস নারিকেল-সুপারীর বাগান নষ্ট করে, ভিটে-বাড়ি দান করে মানবতার এক চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। পরবর্তীতে গরীব মুসলমান ছাত্রদের লেখাপড়ার সহায়তা করার জন্য তৎকালীন সময়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত "এহইয়ায়ে সুন্নাত" সমাজে কী ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল যে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তিই তা সহজে অনুধাবন করতে পারেন। "হেমায়েতে ইসলাম" এর মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রতি দুঃখী মানুষের প্রতি হুজুর কেবলার মহানুভবতার কথা পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে। এগুলো তাঁর উদার, দরদী মনের এক একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

আজ কিছু কিছু এন.জি.ও এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সুকৌশলে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এর বিরুদ্ধে দেশের আলেম সমাজ থেকে শুরু করে আমরা অনেকেই সোচ্চার। সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাই, মিছিল করি, মিটিং করি- এসবই ঠিক, এগুলো আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সমস্যার মূল কোথায়, এ সমস্যা সৃষ্টি হল কেন- এসব কি একবার ভেবে দেখেছি? সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তদনুযায়ী সমস্যা-সমাধানে তৎপর হওয়াই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় সমস্যা, সমস্যাই থাকবে; এর সমাধান আর কিছুতেই হবেনা।

হাদীসের মর্মে বুঝা যায়- চরম দারিদ্রতা মানুষকে কুফরীর দিকে টেনে নিয়ে যায়। এর অর্থ হলো দরিদ্রতার একটি সীমারেখা আছে যার নিচে সাধারণভাবে ধর্মীয় বিধানসমূহ- এর রীতিনীতি মানুষের মনে তেমন কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনা, কারণ সেখানে পেটের ক্ষুধা ও জাগতিক উন্নতির কথাই মানুষের মনে অধিক মাত্রায় সক্রিয় এবং প্রবল থাকে। এইসব অসহায় মানুষের কাছে তাদের জাগতিক উন্নতিকল্পে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন লোক, যে কোন গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান যখন এগিয়ে আসে তখন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদের কথায় প্রভাবান্বিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই অতি সহজে তাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়।ে এই সহজ কথাটিই আজ দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর উম্মতেরা অনেকটা বিস্মৃত হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় খ্রীস্টান মিশনারীগণ এখানে অনেক বেশি অগ্রগামী। বিশ্বের দিকে তাকালেই দেখা যায় খ্রীস্টান মিশনারীরা অসহায় মানুষের জন্য কত হাজার হাজার জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে দিয়েছে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃস্থ মানবতার সেবায় দূরদেশ থেকে কিভাবে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছুটে আসছে। আর তার পাশে ইসলামের ধারক বাহক, রাসূলুল াহ (দঃ)-এর আদর্শের ঝাণ্ডাধারী মুসলিম সমাজের ভূমিকা কতটুকু, তারা কী করছে এর যদি একটি পরিসংখ্যান নেয়া যায়, তবে তারা লজ্জায় অধঃমুখী হতে বাধ্য।

আজ আমরা মুষ্টিমেয় অনুশীলনের মাঝে ধর্মকে বন্দী করে রেখেছি। ধর্ম সম্পর্কে একটি খণ্ডিত ধারণা লয়েই আল াহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমরা কি আমাদের আশে পাশের ছিন্নমূল মানুষগুলোর কথা কখনও চিন্তা করেছি? ডাস্টবিনে মানবসন্তান যখন খাবারের সন্ধানে কাক আর কুকুরের সাথে পাল া দেয় তখন আমাদের ধর্মপুষ্ট (?) সচেতন বিবেক কিছুমাত্র কেঁপে উঠে কি? সে দৃশ্য পাশ কাটিয়েই ত আমরা প্রতিদিন মসজিদে যাই, ধর্ম-সভায় গমন করি, মানুষকে নীতিকথা শুনাই। প্রশ্ন হলো, আমদের এই উপেক্ষা আর 'মিশনারী' মনোভাবের দরুন ঐ অসহায় লোকগুলো যখন এন.জি.ও অথবা খ্রীস্টান মিশনারীদের হাত ধরে বাঁচার পথ খুঁজে পায়- পরিণামে ধর্মান্তরিত হয়ে যায় তখন এর জবাব

কে দেবে? এর জন্য দায়ী কে? ঐ খ্রীষ্টান মিশনারী, এন.জি.ও, না আমরা? ধর্ম ত এসেছে নিজের মাঝে, সমাজের মাঝে মানবতা প্রতিষ্ঠা করতে- কৈ, সেখানে আমাদের ভূমিকা রইল কোথায়?

আর্ত-অসহায়, বিপদগ্রস্ত, এতিমদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য বহু আয়াত রয়েছে- রাসূল (দঃ) র অনেক হাদীস রয়েছে। কিন্তু এগুলো আমাদের অন্তরকে তেমনভাবে নাড়া দেয়না। কষ্ট ও ত্যাগের সুন্নাতগুলো সযতেœ বর্জন করি। এর কারণ কি? প্রধানতঃ দু'টো কারণ। এক, ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই বলেই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের অনুশীলনে আমরা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনা। দুই, আমাদের দিলের অভাব; আমাদের ত্যাগের অভাব, অর্থের অভাবের চাইতে অনেক বেশি প্রকট। এটিই হ'ল মূল সমস্যা। বস্তুতঃ এজন্যই ধর্মের বিশ্বজনীন রূপটি সমাজে বিকশিত হতে পারেনি। তাই ধর্ম নিয়ে আজ কত বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়- ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের গুটিকতক অনুশীলন মাত্র, ধর্ম সমাজ সেবায় ব্যর্থ ইত্যাদি। অথচ আসল ব্যাপারটি কত ভিন্ন। ধর্মের অঙ্গনে সেবার স্থান কত ঊর্ধ্বে। এটি এড়িয়ে মহান আল াহর সন্তুষ্টি অর্জনে কেউ ঈপ্সিত সাফল্যের দ্বারগোড়ায় পৌঁছতে পারেনা। হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেনঃ একজন মানুষকে তুষ্ট করা অথবা এতিমের মাথায় একবার হাত বুলানো শত শত রাকায়াত নফল নামাজের চাইতেও উত্তম।

একবার ইসলাম সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেছিলেনÑ একটি গল্প শোন, তবেই বুঝতে পাবে প্রকৃত ইসলাম কী এবং ইসলামে মানবতার স্থান কতটুকু। গল্পটি হলো ঃ

একবার জনৈক লোক মনে মনে স্থির করল সে বায়তুল্লাহ শরীফের জিয়ারতে যাবে। সে মনে মনে এও ঠিক করল দীর্ঘ পথ সে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করবে; শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি পা ফেলার পরই দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বে। কি কঠিন সংকল্প! এই সংকল্প নিয়ে সে যাত্রা শুরু করল এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে শেষ পর্যন্ত বায়তুল াহ শরীফ পৌঁছল। সেখানে পৌঁছে সে প্রশান্ত মনে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করল, আল্লাহ যেন তার কষ্টের যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন। সাথে সাথে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উত্তর এলোঃ হে দরবেশ। আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কষ্ট তুমি করেছ, তার যথার্থ প্রতিদান অবশ্যই তোমাকে প্রদান করব- কিছুমাত্র কমতি হবে না। তবে তোমার কাজের বিনিময়ে যে পুরস্কার তুমি লাভ করতে তার জন্য তোমার এত কষ্ট করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমার পাশের বাড়িতে যে অসহায় এতিম ছেলেটি আছে, তুমি যদি দয়া পরবশ হয়ে তার মাথায় শুধুমাত্র একবার তোমার হাতখানি বুলিয়ে দিতে, তবে আমি তোমার প্রতি অনেক বেশি খুশী হতাম এবং আমার তরফ থেকে এর চাইতে বহু বহু গুণ অধিক পুরস্কার তোমায় প্রদান করা হত।

হায়, কোথায় বা ইসলামের শিক্ষা, কোথায় বা আমরা! যারা ইসলামের কথা বলেন, এর আদর্শে নিজের জীবনকে বিকশিত করতে চান, ইসলামকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করার আন্তরিক আশা পোষণ করেন তাদেরকে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে ইসলামে প্রকৃত শিক্ষা কি এবং সেই আলোকেই প্রতিটি মুসলমানকে সচেতন করে তুলতে হবে।

এ অধ্যায় শেষ করার আগে মহান আল্লাহর দরবারে এই মুনাজাত রইল- মানবতার সেবায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আদর্শ, "হেমায়েতে ইসলাম" আর "এহইয়ায়ে সুন্নাত", শিক্ষা বিস্তারে তাঁর নিজের ভিটে-বাড়ি দান, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল অসহায়, নিরাশ্রয় মানুষের প্রতি তাঁর দয়ার পরাকাষ্ঠা, বিশ্বের সকল মজলুমের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ইত্যাদি আমাদের জীবনপথের দিশারী হোক; গরীব-দুঃখী, আর্তপীড়িতদের বেদনা লাঘবে আমাদের দিল সদা অনুপ্রাণিত হোক এবং অসহায় মানুষের প্রতি আমাদের দয়া আর ত্যাগের হাত চির-প্রসারিত হোক। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর কুরবানী মুসলিম সমাজের বুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক। বিশ্ববাসী নতুন করে অনুধাবন করুক- ইসলাম ত্যাগের ধর্ম, সেবার ধর্ম। মুসলমানদের মাঝে যে মানবতার পরশ পেয়ে একদিন কোটি কোটি বিধর্মী ইসলামের সুশীতল

ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল, যে ত্যাগ আর সহমর্মিতার বিরল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে সারা দুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, এই বস্তুবাদী সমাজে তারই অনুপম স্পর্শে সিক্ত সজীব, সতেজ হয়ে উঠুক প্রতিটি মুসলমানের 'মরা' দিল, বিশ্ব মুসলিম ত্যাগের মহিমায় আবারও বলীয়ান হয়ে উঠুক; অনাগতকাল তাদেরকে নতুন করে অভিনন্দিত করুক, চারদিক মুখরিত করে পুনরায় ধ্বনিত হোক্ ইসলামের স্তুতি আর জয়গান।

মুর্শিদের প্রতি আদবের অনন্য স্বাক্ষর

পীর ছাহেব কেবলার আদব এ'তেকাদঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজেই একজন স্বনামধন্য পীর ছিলেন। তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরীদান ছিল। এ সত্তে¡ও আপন পীরের কাছে নিজেকে অত্যন্ত ছোট ও হেয় মনে করতেন। পীরের দরবারে সবসময়ই তাঁর মাঝে একটি বিনয়ী এবং সংকুচিত ভাব পরিলক্ষিত হত। এ সম্পর্কে তাঁর বড় ছাহেবজাদা পীরে মরহুম হযরত আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ছালেহ (রঃ) বলেন ঃ হযরত নবী করীম (দঃ)-এর সম্মুখে হযরত আবু বকর সিদ্দীকী (রাঃ) এত নিæস্বরে কথা বলতেন যে, হুজুর (দঃ)-এর কান মোবারক তাঁর মুখের নিকট নিয়ে শুনতে হত। আমার ওয়ালেদ ছাহেব কেবলাকে ঠিক সেইরূপই আমল করতে দেখেছি। তিনি তাঁর মোর্শেদে কামেলের সাথে এরূপ মৃদু আওয়াজে কথা বলতেন যে, সময় সময় তা অন্য কারও বুঝিয়ে দিতে হত।

পীরে মরহুম আরও বলেনঃ হযরত ওয়ালেদ ছাহেব কেবলা (রহঃ) তাঁর পীর ছাহেব কেবলার প্রতি এতই প্রগাঢ় এ'তেকাদ রাখতেন যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কোন ওলী-আওলিয়ার মাজার হতে ফায়েজ লাভ করার জন্য জেয়ারত করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কারণ, তিনি বলতেন- তাঁর পীরে কামেলই তাঁর মকছুদের জন্য যথেষ্ট। এ দ্বারা আবার কেউ এ কথা না বলেন যে, অন্য ওলী-আওলিয়াগণের প্রতি তাঁর মহব্বত ছিলনা, বরং তিনি দুনিয়ার ছোট বড় সকল ওলী-আওলিয়াদের জন্য হামেশা দোয়া করতেন। তার মনের উক্ত অবস্থা বিরাজমান ছিল শুধুমাত্র নিজ পীরের প্রতি খাছ আদব এবং পূর্ণ এ'তেকাদের কারণে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পীরের বাড়িতে কখনও শান-শওকতের পোশাক পরিধান করে বা কোন খাদেম সাথে লয়ে যেতেন না। রেলস্টেশন হতে ফুরফুরা শরীফ তিন মাইল। এই পথটুকু সব সময়ই তিনি পায়ে হেটে যেতেন। এমনকি বৃদ্ধ বয়সে একান্ত প্রয়োজন সত্তে¡ও কখনও তিনি পালকীতে আরোহণ করে যেতে রাজী হননি। জানা যায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ফুরফুরা শরীফে অত্যন্ত বিনীতভাবে চলাফেরা করতেন, কোনদিন জুতা পায়ে হাঁটেন নাই। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এই আমলটি আমাদেরকে হযরত মালেক (রঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত মালেক (রঃ) জীবনে কখনও মদিনা শরীফে জুতা পায়ে হাঁটেন নাই। তিনি ভাবতেন, যে পাক জমিনে হুজুরে পাক (দঃ)-এর পবিত্র পা মোবারক স্থান পেত সেখানে তাঁর জুতার স্পর্শ কীভাবে লাগতে পারে! এটি তাঁর কাছে গর্হিত কাজ বলে মনে হত। সুবহানাল াহ, কী উচ্চ পর্যায়ের আদব!

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পাগড়ী পরিধান করে কখনও পীরের সম্মুখে যেতেন না। পীরে মরহুম বলেন- কোন এক সময় আমি একখানা আরবী রুমাল মাথায় বেঁধে ওয়ালেদ ছাহেব কেবলার সাথে ফুরফুরা হুজুর কেবলার সাথে দেখা করার জন্য হালদার লেনে যাচ্ছিলাম। হালদার লেনের নিকটবর্তী হলে ওয়ালেদ ছাহেব আমাকে মাথা হতে রুমাল নামিয়ে ফেলতে ইশারা করলেন। যদিও উহা নাজায়েজ নহে, মাত্র আদবের খেয়ালেই তিনি এরূপ করতে ইশারা করেছিলেন। শরীয়তের দিক দিয়ে যদিও কোন বাধা নেই, তবে পীরের আদবের প্রতি কতটুকু সূ² দৃষ্টি রাখলে সব সময় এরূপ আমল করা সম্ভব তা চিন্তা করার বিষয় নয়কি?

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পীরের বাড়িতে গেলে সাধারণ মুরীদের মত অবস্থান করতেন। বাড়ির অঙ্গণে ধূলায় ধূসরিত মাঠে কম্বল পেতে বসে পড়তেন এবং মাহফিল শেষে পীরের অনুমতি লয়ে বাড়ি চলে আসতেন। অনেক সময় পীরের সাথে ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য অনেকে পীরের চতুর্পার্শ্বে ভীড় করে থাকে, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সে সব থেকে বহুদূরে আত্মগোপন করে থাকতেন। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া তিনি পীরের সম্মুখে ঘুরাফিরা করা আদবের খেলাপ মনে করতেন। অবশ্য ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত পীর ছাহেব কেবলা কখনও তাঁর এই মুরীদটিকে বিস্মৃত হতেন না। যে কোন অনুষ্ঠানে কিংবা কোন প্রস্তাবনা উপস্থিত হলে তিনি নিজেই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু তখনও মরহুম পীর ছাহেব কেবলা উৎসাহিত হতেন বলে মনে হতনা। পীরের দরবারে তিনি নিজের মর্যাদাকে সব সময় খাটো করে রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি দীর্ঘ পঁয়তালি-শ বৎসর যাবত পীরের পশ্চাতে ঘুরিয়াছি। পীরের বাড়িতে আপন মর্যাদা ভুলিয়া গিয়াছি। সেখানে মাহফিলের পর বাড়ির ময়দান পরিষ্কার করার বেলায় সকলের সঙ্গে আমিও গোস্তের হাড় কুড়াইয়া বাড়ি সাফ করিয়াছি।"

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মনে তাঁর পীরের স্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি অনেক সময় বলতেন- "আমি পঁয়তালি-শ বৎসর পর্যন্ত খেদমত করিয়াছি। আল াহ তায়ালা আমাকে যাহা কিছু এনায়েত করিয়াছেন তাহা আমার পীর মরহুমের ফায়েজ, ছোহবত এবং তাওয়াজ্জোহের অসীলায় দিয়াছেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা সামাজিক যে কাজই করতে ইচ্ছা করতেন, সেটা তাঁর পীর ছাহেব কেবলার এজাজত নিয়েই করতেন। তিনি নিজ বাড়িতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে পীরের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মাদরাসা বিল্ডিং-এর কাজ শুরু করার আগে তিনি তাঁর পীর ফুরফুরা শরীফের হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর পবিত্র হস্তে একটি ইট স্পর্শ করায়ে আনেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তাঁর পীর ছিলেন মুজাদ্দিদে যমান এবং তাঁর হাতের ছোঁয়ায় অবশ্যই মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে।

কোন ফতোয়া সংকলন অথবা পুস্তক প্রণয়ন করলেও উহা প্রচার বা মুদ্রিত করার পূর্বে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বিষয়টি পীরের গোচরীভূত করতেন। তিনি অনুমতি দিলে কেবলমাত্র তখনই সে কাজে হাত দিতেন। ফুরফুরা শরীফ কিংবা কলিকাতা হতে তখন এরূপ অনুমোদন নেয়া যদিও সময় এবং খরচ সাপেক্ষ ছিল, কিন্তু এতে তিনি মোটেই কষ্টবোধ করেননি।

ফুরফুরা শরীফে পীর ছাহেব কেবলা যখন ইন্তেকাল করেন তখন মরহুম হুজুর রীতিমত বৃদ্ধ এবং একজন খ্যাতনামা পীর। তথাপি পীরের ইন্তেকালে মাঝে মাঝে পিতৃহীন শিশুর মত তিনি রোদন করতেন এবং এই বলে আক্ষেপ করতেন, "হুজুর চলিয়া গিয়াছেন, ইয়াতিম হইয়া গিয়াছি। এখন কাহার নিকট যাইব?"

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কেবলমাত্র পীরের প্রতিই আদব প্রদর্শন করেননি- তদীয় ছাহেবজাদাদের সাথেও পীরের ন্যায় ব্যবহার করতেন। তাঁদের সাথে কখনও সমকক্ষতার ভাব প্রদর্শন করেননি। তাঁদের কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁদের বিছানায় পর্যন্ত কোনদিন উপবেশন করেননি।

পীরজাদাদের প্রতি মরহুম পীর ছাহেবের আদবের একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলোঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) তখন এন্তেকাল করেছেন। ফুরফুরা শরীফে তখন গদ্দীনশীন বড় ছাহেবজাদা হযরত আব্দুল হাই সিদ্দিকী (রঃ) চাখারে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার একজন পীরভাই হযরত আবদুল হাই সিদ্দিকী (রঃ) কে দাওয়াত দিলেন। পীর ছাহেব কেবলা সংবাদ পেয়ে তাঁর নিজের পূর্ব নির্ধারিত একটি মাহফিল স্থগিত রেখে চাখার রওনা হলেন। পীরে মরহুম হযরত আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ছালেহ (রঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁর কাছে দ্বিধা হ'ল- লোকজন কষ্ট করে মাহফিলের ব্যবস্থা করল আর তাঁর ওয়ালেদ ছাহেব কেবলা চাখার

যাচ্ছেন। এদিকে হযরত আবদুল হাই সিদ্দীকী (রঃ) চাখার উপস্থিত হলেন। তিনি হুজুরকে দেখতে না পেয়ে উক্ত পীর ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন- মাগুরার ভাই ছাহেব (অর্থাৎ মরহুম পীর ছাহেব কেবলা) কোথায়? তাঁকে দাওয়াত দেননি? উত্তরে পীর ভাই বললেন- "জ্বি-না, হুজুর"। তখন তিনি বিরক্ত হয়ে বললেনঃ এটি কেমন আদব হ'ল? ভাই ছাহেব এত কাছে থাকেন, অথচ আপনি তাকে দাওয়াত দিলেন না। আপনি কি নিজে পীর হতে চান? এমনি সময় হুজুর কেবলা সেখানে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই মরহুম আবদুল হাই সিদ্দিকী উক্ত পীর ভাই-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন- আদব দেখলেন? আপনি দাওয়াত দেননি, তবু তিনি এসেছেন। পরে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বোটে ফিরে এসে বলেছিলেন- আমার পীর ছাহেব (রঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তাই আজ আমি যদি এই মাহফিলে হাজির না হতাম হুজুরের মনে আঘাত লাগত, এটি আদবের খেলাপ হত। বস্তুতঃ পীরের ছাহেবজাদার প্রতি আদব প্রদর্শনই ছিল ঐ মাহফিলে তাঁর আগমনের একমাত্র কারণ।

মকতুবাদে ইমাম রব্বানী কিতাবে আদাবে মুরীদ সম্পর্কে উলে-খ আছে যে, মুরীদকে পীরের সম্মুখে এই মৃতের মত থাকতে হবে- অর্থাৎ মুরদা যেমন নিজ ইচ্ছায় উঠা-বসা ও নড়া-চড়া করতে পারেনা, বরং যে গোসল করায় সে তাকে যে অবস্থায় রাখে সেই অবস্থায় পড়ে থাকে, তদ্রƒপ মুরীদের আবশ্যক এই যে, পীরের সামনে মুরদার ন্যায় অবস্থান করা অর্থাৎ পীর যা আদেশ করেন তা নির্দ্বিধায় মেনে চলা। এ প্রসঙ্গে মলফুজাতে নেছারিয়া হতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বর্ণিত তাঁর নিজের একটি ঘটনা উলে-খ করা হল-

একবার আমাকে পীর ছাহেব কেবলা ফেনী যেতে আদেশ করলেন, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ফেনী যাব তা জিজ্ঞাসা করার হিম্মত আমার হলনা। কেননা একথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ এই হতে পারে, আবশ্যক মনে হলে হুকুম প্রতিপালন করব এবং অনাবশ্যক মনে হলে এতেরাজ করে আদেশ রদ করার চেষ্টা করব। যাহা হোক আমি বহু টাকা পয়সা খরচ করে ফেনী পৌঁছলাম; কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়ে কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তখন বুঝলাম, হুজুর কেবলা আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই এই প্রকার আদেশ দিয়েছেন।

অনেকের কাছে এই ঘটনাটি অতিশয় মামুলী মনে হতে পারে, কিন্তু এর মাঝে কত বড় উচ্চ পর্যায়ের সূ² আদব যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা একটু ভাবার বিষয় বৈকি। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একটি ঘটনার উলে-খ করছিঃ

একদিন হুজুর (দঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীকী (রাঃ) কে বললেন- "আবু বকর, তোমাকে আমার প্রয়োজন হতে পারে"। হযরত আবু বকর সিদ্দীকী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন নাই কবে বা কখন প্রয়োজন হবে? তিনি দিনের অধিকাংশ সময়ই হুজুর (দঃ)-এর সাথে কাটাতেন। রাত্রিবেলায় বাড়িতে থাকতেন। তিনি ভাবলেন- কোন রাতে বেলায় যদি আমাকে হুজুর (দঃ)-এর প্রয়োজন পড়ে তবে ত সেই সময় তিনি আমাকে পাবেন না। এ কথা চিন্তা করে স্ত্রী সন্তানদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হুজুর (দঃ)-এর সেই কথার পর থেকেই প্রতিটি রাতে তিনি হুজুর (দঃ)-এর ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতেন। হিজরতের সময় হুজুর (দঃ) আপন ঘরেই একটু উৎকণ্ঠার সাথে বললেন- এখন আমার আবু বকরের প্রয়োজন। সাথে সাথে আবু বকর (রাঃ) বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হাজির। হুজুর (দঃ) অবাক হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর তুমি কখন এলে? উত্তরে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন- হুজুর, আজ নয়, তিন বছর আগে আপনি একদিন বলেছিলেন আমাকে আপনার প্রয়োজন হতে পারে, সেইদিন থেকেই প্রতিটি রাতে আমি এখানে হাজির থাকি। সুবহানালাল্লাহ ! বস্তুতঃ এরই নাম আদব। কেউ যদি এই ঘটনার মাঝে আদবের কোন অংশ (element) খুঁজে না পান- তবে তাকে বলার কিছু নেই। তবে এই সব আদব, এ'তেকাদের দরুনই হুজুর (দঃ)-এর কাছে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কি মর্যাদা ছিল শুনুন। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি এবং তাঁর মাহবুব হযরত নবী করীম (দঃ) বলেনঃ 'সকলের ঋণই আমি শোধ করেছি কিন্তু আবু বকরের ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি।' "আমি যদি আমার প্রভুকে ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধু বানাতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম।" "হে আবু বকর, আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম

জান্নাতে প্রবেশ করবে।" মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁর আদব, এতেকাদের দরুণ তদীয় মুর্শিদের কাছে কেমন ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে কি পেয়েছিলেন তা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা একদা কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন- তিনি কলিকাতা চাঁদনী চকের মসজিদে বসে মোরাকাবা করতেন। ঐ সময় ফুরফুরা শরীফের পীর ছাহেব কেবলা মসজিদের পূর্বদিকে কোন একটি কামরায় তাশরীফ রাখতেন। পীর ছাহেব কেবলা মসজিদে বসে নিজ পীরের দিকে মুখ করে মোরাকাবা করতেন। এতে অন্যান্য মুরীদগণের মাঝে গুঞ্জন শুরু হল- তিনি পশ্চিমমুখী না হয়ে কেন পূর্ব দিকে ফিরে মোরাকাবা করেন। একথা শেষ পর্যন্ত ফুরফুরার হুজুর পর্যন্ত পৌঁছল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "হুজুর যে পেছনে থাকেন"। তদীয় পীর ছাহেব বললেন, "কেন বাবা, দেয়াল তো রয়েছে?" অতি বিনীতভাবে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তখন উত্তর দিয়েছিলেনঃ "মোরাকাবা করার সময় আমার-আপনার মাঝে ত আমি কোন দেয়াল দেখিনা হুজুর।" এরপর ফুরফুরার হুজুর আর কিছুই বলেননি। সম্ভবতঃ প্রতিবাদকারীরা এ থেকেই শিক্ষা পেয়ে থাকবেন।

ফুরফুরা শরীফে পীরে মরহুমের থাকার জন্য একটি খাস কামরা তৈরী করা হয়েছিল। সর্ব প্রথম তিনি যেদিন সেই রূমের মেহমান হয়েছিলেন দেখতে পেলেন সুন্দর চৌকিতে তাহার জন্য বিছানা করা হয়েছে। হুজুর নিজ হাতে চৌকির বিছানা পার্শ্বে নামায়ে বিশ্রাম নিতে ছিলেন। উপস্থিত খাদেমদের বহু অনুরোধ সত্তে¡ও তাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করলেন না। খাদেমগণ ফুরফুরা শরীফের হুজুর কেবলাকে ঘটনার বিবরণ পেশ করলে তখনই হুজুর তথায় উপস্থিত হয়ে চৌকির নীচে মেজেতে বিছানা করার কারণ জানতে চাইলে পীরে মরহুম ইহা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেছিলেন। বার বার বলার পরে পীরে মরহুম বলেন, হুজুর আমার এই বিশ্রামের চৌকির চেয়ে আপনার ওয়াজের ষ্টেইজ বেশ নিচু। না জানি বেখেয়ালে কখনো চৌকিতে শুয়ে থাকব আর আপনি ঐ ষ্টেইজে থাকবেন ইহা আমার আদবের খেলাফ বোধে আমি নিচে বিছানা করেছি।

পীরে মরহুম হযরত আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রঃ) কে ফুরফুরা শরীফের আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) মুরীদ করে তরীকার প্রথম ছবক দেন। ফুরফুরার হুজুর কেবলা জীবিত থাকতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজে কখনও তাঁকে ছবক দেন নাই। একটি ছোট্ট ঘটনাঃ পীরে মরহুম তখন মাদরাসায় নিচের কোন এক ক্লাশে অধ্যয়ন করেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁকে ফুরফুরা শরীফ পাঠান। ফুরফুরার হুজুর কেবলা তাঁকে ১৫০০ বার নফি এছবাত করার নির্দেশ দেন। ঐ সময় তাঁর সেন্টার পরীক্ষা ছিল। তাই উক্ত জিকির কিছুটা কম করা যায় কি'না এ ব্যাপারে মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে পুনরায় ফুরফুরা শরীফে পাঠিয়ে দেন। তিনি একদিকে পিতা, অপরদিকে একজন এজাজতপ্রাপ্ত পীর হওয়া সত্তে¡ও শুধুমাত্র পীরের আদব রক্ষার্থে তাঁর বাতলানো ছবক পরিবর্তন করেননি।

ফুরফুরা শরীফের হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) একবার ছারছীনার তাশরীফ আনেন। পীরে মরহুম তখন খুব ছোট। তাঁকে আদর করে সামনে বসিয়ে গলায় তছবীহ ঝুলিয়ে ফুরফুরা শরীফের হুজুর কেবলা বলেছিলেন, "শাহ ছাহেব"। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পীরের এই একটি শব্দের আদব দেখাতে গিয়ে নিজের ছেলে হওয়া সত্তে¡ও আবু জা'ফর'মোহাম্মদ ছালেহ (রহ) কে নাম ধরে না ডেকে সারা জীবন "শাহ ছাহেব" বলে ডেকেছেন।

একবার একটি মসজিদে ফুরফুরা শরীফের হুজুর কেবলা (রঃ) এবং মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর ফুরফুরা শরীফের হুজুর কেবলা ভুলবশতঃ নিজের জুতা পায়ে না দিয়ে মরহুম হুজুরের জুতা পায়ে দিয়ে চলতে শুরু করেন। কয়েক পা সামনে যেতেই তিনি বুঝতে পেরে ফিরে এসে পাল্টিয়ে নিজের জুতা পরে নেন। ব্যাপারটি মরহুম পীর ছাহেব কেবলা লক্ষ্য করেন। নিজের জুতায় পীরের পা মোবারকের স্পর্শ থাকায় উক্ত জুতা জীবনে আর কোন দিন তিনি পরিধান করেননি। বরকতস্বরূপ যত্ন সহকারে তাঁর ঐ জুতা

জোড়া তিনি রেখে দেন। পরবর্তীতে তাঁর ইন্তেকালের পর আদবের নিদর্শন স্বরূপ সেগুলো সকলকে দেখানো হ'ত।

কোন এক শীতের দিনে ফুরফুরা শরীফের খোলাফাগণ হুজুর কেবলার পাশে বসেছিলেন। হঠাৎ করে হুজুর কেবলা সামনের একটি পুকুর দেখিয়ে বললেন- আপনারা ওখানে নেমে মাছ ধরে নিয়ে আসুন। হুজুরের নির্দেশে ছারছীনার মরহুম পীর ছাহেব শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহঃ) সহ পুকুরের পানিতে নেমে সবাই মাছ ধরার চেষ্টা করছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও কেউ কোন মাছ ধরতে পারেননি। শীতে হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল। তাই থাকতে না পেরে সবাই পুকুর থেকে উঠে পড়লেন, শুধুমাত্র ছারছীনার মরহুম হুজুর পুকুরেই রয়ে গেলেন। তাঁদের সাথে ফুরফুরার হুজুর কেবলার দেখা হওয়া মাত্র বললেন, "কি বাবারা, আপনারা যে উঠে এলেন? মাছ পেলেন না? ত, বরিশালের বাবা নেছারুদ্দীন কোথায়?" এই বলে তিনি সকলকে নিয়ে নিজেই পুকুর ঘাটে উপস্থিত হলেন। মরহুম হুজুরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কি বাবা, সবাই উঠে এলো, তুমি যে এলেনা?' উত্তরে মরহুম হুজুর বললেন- "হুজুর, আপনি ত মাছ ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই মাছ না পেয়ে আমি উঠি কিভাবে?" ফুরফুরার হুজুর হেসে দিয়ে বললেন, "বাবা, ওখানে হাত দিন ত।" নির্দেশ পেয়ে সেই স্থানে হাত দেওয়ার সাথে সাথে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা একটি বড় মাছ ধরে ফেললেন এবং সেটি নিয়েই উপরে উঠে এলেন। সকলকে দেখিয়ে খুশী হয়ে ফুরফুরার হুজুর কেবলা বললেন, দেখ- বরিশালের বাবা নেছারুদ্দীন কত বড় মাছ ধরেছে। মুজাদ্দিদে যমানের কোন কাজই অর্থহীন হতে পারেনা। এই ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার উচ্চ মর্যাদাকে সকলের সামনে তিনি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তা অবশ্যই লক্ষ্য করার বিষয় বৈ কি।

পীরের দৃষ্টিতে মরহুম হুজুর ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা যেমন তাঁর পীর কেবলাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন- তেমনি মুর্শিদের অগাধ স্নেহ মমতাও তিনি লাভ করেছিলেন। ফুরফুরার হুজুর নিজ মুরীদের কামালিয়াত সম্পর্কে অবশ্যই অবগত ছিলেন। এটি তাঁর কথায়, কাজে, ব্যবহারে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পেতো। এতদ অঞ্চলের বহু লোক ফুরফুরা হুজুরের কাছে যেত বয়াত হতে। বরিশাল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদেরকে তিনি মরহুম হুজুরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন- তাদেরকে তাঁর কাছ থেকে তরীকা শিক্ষার হুকুম দিতেন। এইভাবে নিজের মুরীদের যোগ্যতার কদর দিতে মুজাদ্দিদে যমান কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। মরহুম হুজুর যখন তাঁর পীর কেবলার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন তাঁর পীর কেবলা সøেহে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। ছোট ছোট অনেক ঘটনার মধ্য দিয়েই হুজুরের প্রতি তাঁর গভীর øেহ মমতার আভাস পাওয়া যায়- যেমন, ফুরফুরার হুজুর বললেন- "বাবা, আকাশে মেঘ হচ্ছে, আপনি ফুরফুরাকে বেষ্টন করে একটু দোয়া করুন, যেন মেঘটা বাইরে থেকে যায়"- অথবা, "বাবা, বিদয়াতী ফকিরের হালতটা একটু দেখুন ত" ইত্যাদি।

ফুরফুরার বার্ষিক ইছালে ছওয়াবের মাহফিলে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হত। তাই কারও জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠেনা। কিন্তু ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) ছারছীনার মরহুম পীর ছাহেবের জন্য মসজিদের সঙ্গে একটা কামরা তৈরী করেছিলেন। একবার ইছালে ছওয়াবের মাহফিলে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা গেলে ফুরফুরার হুজুর বললেন, "বাবা, আপনার এখানে থাকার বড় অসুবিধা হত, তাই আপনার জন্য মসজিদের সঙ্গে এই কামরাটুকু তৈরী করেছি। ছাদটা এখনও বাকী আছে। আপনি এখন এখানে থাকবেন- আর কেউ নয়। আপনার জন্য বাড়ির ভিতর থেকে বিছানা আনতে দিয়েছি।" ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলা মুজাদ্দিদে যমান ছিলেন। তা সত্তে¡ও তাঁর একজন উপযুক্ত মুরীদকে কিরূপ সম্মান দেখিয়েছেন তাঁর কথা থেকেই তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মিলে। এটিই প্রকৃত পীর মুরীদী।

মুরীদ পীরের যে প্রকার এ'তেকাদ রাখে পীরও তাকে সেই পরিমাণ হুকুম করেন। মরহুম হুজুর বলেনঃ একবার হযরত পীর ছাহেব কেবলা আমার একজন পীর ভাইকে বললেন- বাবা,

আপনাদের দেশীয় আমার অমুক মুরীদটি আমার কাছে দুই আনা পয়সা পায়, এ পয়সা ক'টি তাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন কি? উত্তরে সেই মুরীদ লোকটি বললেন- হুজুর, আমার বাড়ি তার বাড়ি হতে অনেক দূরে। হুজুর কেবলা তখন ফরমাইলেন- আচ্ছা, আপনি এই পয়সা ক'টি আমার বাবা নেছারুদ্দীনের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। আমি জানি সে যেভাবেই হোক এগুলো প্রাপকের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে।

ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) তাঁর স্বীয় মুরীদ মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কামালিয়াত সম্পর্কে শুধু অবগতই ছিলেননা, অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটি অপরের কাছে প্রকাশ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ সম্পর্কে ছোট্ট একটি ঘটনা উলে-খ করছিঃ

একবার ফুরফুরার হুজুর কেবলা মরহুম হুজুরকে কিছু টাকা দিয়ে বাজার থেকে কোন একটি জিনিস কিনে আনার নির্দেশ দিলেন। মরহুম হুজুর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে যখন খালি হাতে ফিরে এলেন ফুরফুরার হুজুর তখন অন্যদের নিয়ে বসেছিলেন। তাঁকে দেখেই তিনি মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "কি বাবা, আনতে পারনি?" মরহুম হুজুর কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। ফুরফুরার হুজুর সবই বুঝলেন। আসলে জেনেশুনে ইচ্ছা করেই তিনি তাঁকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন। বাজারে মেয়েলোক ছিল বিধায় মরহুম হুজুর অনেক চেষ্টা করেও সেই জিনিসটা কিনতে পারেননি। ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যমান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমার বাবা নেছারুদ্দীন তাকওয়া পরহেজগারীতে আমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।"

হুজুর (দঃ) সামনে সামনে আসছেন --------

পীরের মুরীদগণ সকলেই নিজ নিজ পীরের আদব রক্ষা করে থাকেন, কিন্তু হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা আদবের যেসকল সূ² নজীর স্থাপন করে গেছেন তা একান্তই বিরল। এজন্যই তদীয় পীরের নিকট হতে তিনিও বহু নেয়ামত লাভ করেছেন। যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন- তা নিচে উলে-খ করা হলোঃ

পীরে মরহুম শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) বলেন- হযরত ওয়ালেদ ছাহেব কেবলা একবার ভয়ানক বিমারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় ফুরফুরার হুজুর ওয়ালেদ ছাহেব কেবলাকে কলিকাতা হালদার লেনে গিয়ে তাঁর সাথে মোলাকাত করার জন্য তাকিদী চিঠি দেন। হযরত ওয়ালেদ ছাহেব বিমারী হতে উঠেই কালবিলম্ব না করে রওয়ানা হয়ে যান। সেই ছফরে আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হালদার লেনে হুজুরের সাথে মোলাকাত হয়। যথারীতি পীর মুরীদীর আদব ও মহব্বতের আদান-প্রদান হল। হযরত ওয়ালেদ ছাহেবকে বিশ্রাম করার জন্য একটি কামরার দিকে নির্দেশ করা হল। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন পীরজাদা হযরত মাওলানা আবদুল কাদের (মরহুম) ছাহেবের শয্যা পাতা রয়েছে। আদবের খাতিরেই ওয়ালেদ ছাহেব কেবলা সেই বিছানায় উপবেশন করেননি। একথা ফুরফুরা হুজুরের কর্ণপাত হল, তাঁদের মধ্যে পুনরায় যখন কথাবার্তা শুরু হল তখন ফুরফুরার হুজুর বললেন, "বাবা, লোক তিনটি কাজ দ্বারা কামালিয়াত লাভ করতে পারে- আদব, আমল এবং এলম। এর মধ্যে আদব হচ্ছে প্রধান।" কথাটি ওয়ালেদ ছাহেব কেবলার প্রতি লক্ষ্য রেখেই যে বলা হয়েছে তা সুস্পষ্টই বুঝা গেল। একটু পরে সহাস্যবদনে ওয়ালেদ ছাহেব কেবলাকে লক্ষ্য করে বললেন, "বাবা, হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর কতজন সাহাবা ছিলেন?" তিনি নিজেই বললেন, "প্রায় লক্ষাধিক সাহাবা ছিলেন, তন্মধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-এই চারিজন ছিলেন প্রধান। আবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন এই চারিজনের মধ্যে প্রধান। তাঁর সাথে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর যে বিশেষ নেছবত ছিল, বাবা, আপনার সাথেও আমার সেই নেছবত।" অতঃপর অন্যান্য কথোপকথন হল- কিন্তু কোন উলে-খযোগ্য কথা আলোচিত হয় নাই। এদ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হযরত ওয়ালেদ ছাহেব কেবলাকে এই নেয়ামত এনায়েত করার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

বস্তুতঃ পীরের কাছ হতে কোন মুরীদের এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর কোন স্বীকৃতি আর হতে পারেনা।

পুস্তক প্রণয়ন

সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অনৈসলামিক প্রথা, চালচলন অজ্ঞ মুসলমানদেরকে যখন ক্রমাগত গোমরাহীর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল সেই সময়ে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাবলীগের যে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন- ইসলামী পুস্তক প্রণয়ন নিঃসন্দেহে তারই একটি উলে-খযোগ্য অংশ বিশেষ। তিনি উপলব্ধি করলেন একদিকে ইসলামী শিক্ষার অভাব, অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব সমাজকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র ওয়াজ নসীহত, 'বাহাছ' ইত্যাদি দ্বারা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারেনা। তাই তাঁর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পুস্তক প্রণয়ন করে তিনি এদেশের মুসলিম সমাজের যে কি উপকার সাধন করেছিলেন এদেশের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে।

সমাজে বিদয়াতী ভণ্ড ফকিরদের প্রভাব যখন অত্যন্ত প্রকট সেই মুহূর্তে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাদের বিরুদ্ধে 'গঞ্জে হক' নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করে তাদের সঠিক পরিচয় জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এতে ফকিরদের শ্রেণী বিভাগ এবং খাঁটি ও ভণ্ড ফকিরদের বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

সুদ খাওয়া, বেপর্দেগী ইত্যাদি বিভিন্ন অনৈসলামিক বিষয়গুলো মরহুম পীর ছাহেবকে সদা সর্বদাই পীড়া দিত। তিনি তাঁর বিভিন্ন ওয়াজে, তা'লীমে এসব সম্পর্কে জনসাধারণকে সব সময়ই সতর্ক করে দিতেন। এগুলোর কুফল সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে যাতে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেজন্য "সমাজ উন্নতি" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করে এর হাজার হাজার কপি সমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী মরহুম ইয়াছিনুদ্দীন ছাহেব এবং মরহুম ফজলুর রহমান ওরফে মতি মিয়া ছাহেবদ্বয়ের সহযোগিতায় "সমাজ দর্পণ", "পীর মুরীদি" এবং আরও কতগুলো পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। সবগুলো পুস্তকেই তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদয়াত, বিজাতীয় ভাবধারা, অনৈসলামিক প্রথা ইত্যাদি তুলে ধরেন এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারা তিনি তার যুক্তি পেশ করেন।

পুস্তক প্রণয়নে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার শ্রেষ্ঠ অবদান হল "তরীকুল-ইসলাম"। ইহা একখানি বৃহৎ বাংলা ফিকাহ কিতাব। নামাজ, রোজা, পাক-নাপাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ের যাবতীয় মাসয়ালা সম্বলিত চৌদ্দ খণ্ডে এই অমূল্য কিতাবখানি রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য ইতিপূর্বে এরূপ কিতাব আর প্রণীত হয় নাই। এই কিতাবের সব চাইতে আকর্ষণীয় দিক হল প্রতিটি মাছলার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভিন্ন ফিকাহের কিতাবের দলীলাদি পেশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি মাসয়ালার মতভেদগুলো এবং হানাফী মাজহাব অনুসারে গ্রহণীয় মতগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। "তরীকুল-ইসলাম" পুস্তকে বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ফিকাহের কিতাব হতে সংগৃহীত সেগুলোর মধ্যে শরহে বেকায়া, হেদায়া, শামী, আলমগীরী, কাজীখান, বাহরোররায়েক, দুররুল মুখতার, গায়াতুল আওতার, তাহতাবী, হাশিয়ায় তাহতাবী, ফতহুল কাদীর, বজ্জাজিয়া, কবিরী, খোলাছা, মুনিয়া ইত্যাদি অন্যতম। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পুস্তকখানি রচনা করেন। জানা যায় এই বিতাব প্রণয়নের সময় বিভিন্ন ফিকাহের কিতাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনভাবে ডুবে থাকতেন যে, মনে হতো দুনিয়ার অন্য কিছুর প্রতি তাঁর আর কোন খেয়াল নেই। এমনকি সময় সময় তাঁর নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ত। অজু করে এসে পুনরায় তিনি কিতাবে মনোনিবেশ করতেন। অত্যন্ত সহজ বাংলা ভাষায় এই কিতাবখানি রচিত। "তরীকুল-ইসলাম" প্রতিটি বাঙ্গালী মুসলিম পরিবারের জন্য একটি অত্যাবশ্যক কিতাব।

“তা’লীমে মা’রেফাত” মরহুম পীর ছাহেব কেবলার প্রণীত আর একটি উলে-খযোগ্য কিতাব। তিনি নকশাবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া, কাদেরীয়া এবং মুহাম্মাদীয়া- চার তরীকাতেই কামেল ছিলেন এবং তাঁর মুরীদগণকে সেই অনুসারে তালকীন করতেন। তিনি অনুভব করলেন এ বিষয়ে একখানা কিতাব অপরিহার্য। তাই তিনি এই কিতাবখানি প্রণয়ন করেন। এ কিতাবে শুধুমাত্র চার তরীকার বিভিন্ন ছবকাদিই স্থান পায়নি। তরীকতের একটি প্রমাণ্য পুস্তক হিসেবেও এটি বিবেচিত। ইল্মে তাসাওফের স্থান কোথায়- বিভিন্ন প্রমাণ্য কিতাব থেকে তার মূল্যায়ন করে এই কিতাবে তার বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। ইলমে শরীয়তের ন্যায় ইলমে তাসাওফও শিক্ষা করা অবস্থাভেদে ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া, মুস্তাহাব- এ বিষয়টি তিনি এই কিতাবে কুরআন-হাদীস এবং বিভিন্ন প্রমাণ্য কিতাব থেকে বহু দলীলাদি উদ্‌ধৃত করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। যে সমস্ত আলেম ইলমে তাসাওফের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, এ কিতাবে তাদের মতকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এই পুস্তকে দুররুল মোখতার, মোছাল ামুস সবূত, তাওজীহ, শামী, গায়াতুল আওতার, এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, তাফসীরে রূহুল বয়ান, তাফসীরে মাজহারী, গওছে পাক (রঃ)-এর ছিররুল আছ্‌রার, জামেউল উসূল, মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী, মেরকাত, মাজহাবে হক, মেশকাতুল মাছাবীহ, জাদুত্তাকওয়া, খোলাছা প্রভৃতি কিতাব অবলম্বনে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ সন্নিবেশিত করেন।

পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা প্রথমে গ্রামে জুমার নামাজ পড়েননাই। পরে বিভিন্ন কিতাবাদি দেখার পর যখন জুমার নামাজ পড়া শুরু করেন তখন বেজুমাপন্থীদের কাছ হতে তাঁকে বহু রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি যখন দেখলেন বাহাছ-তর্ক করে কোন সমস্যার সমাধান হয় না, এতে শুধু সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মানুষের কাছে লিখিত দলীল পেশ করাই অধিকতর যুক্তিসংগত। তিনি ক্রমান্বয়ে ছয়খানা জুমা সম্পর্কিত পুস্তক প্রণয়ন করেন। এর সর্বপ্রথম পুস্তক হল ‘মাসায়েলে ছালাছা’ বা তিনটি প্রশ্ন। এটি উর্দ্দু ভাষায় লিখিত। তৎপর ‘দ্বিধা ভঞ্জন’, ‘আল-জুমা’, ‘জুমার সংক্ষিপ্ত দলীল’, ‘জুমার অকাট্য দলীল’ এবং ‘এজহারুল হক’ নামক পুস্তকসমূহ প্রণয়ন করেন। এ কিতাবগুলোতে জুমা সম্পর্কিত বহু তথ্য, গ্রামে জুমা ফরজ হওয়ার প্রমাণ, জুমার জন্য বাদশাহ, কাজী, শরীয়তের সংজ্ঞা অনুযায়ী শহর, বড় মসজিদের প্রমাণ, আখেরে জোহর ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ‘তরীকুল ইসলাম’ ‘তা’লীমে মা’রেফাত’ ইত্যাদি কিতাবের ন্যায় এসব কিতাবগুলোও বহু সংখ্যক ফিকাহ হাদীস ও তাফসীরের প্রামাণ্য কিতাবাদির দলীল দ্বারা সমৃদ্ধ। মরহুম মাওলানা কেরামত আলী ছাহেব এদেশে জুমা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তিনি কোন প্রামাণ্য কিতাব প্রণয়ন করে যাননি। বলতে গেলে মরহুম পীর ছাহেব কেবলাই সর্বপ্রথম এদেশে বাংলা ভাষায় জুমা সম্পর্কিত বিভিন্ন কিতাব প্রণয়ন করেন। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উক্ত কিতাবসমূহ বহু সংখ্যায় সমাজে প্রচার হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষও জুমা সম্পর্কে অনায়াসে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। বহু বছর পর আজ হয়ত এই সব কিতাবাদির প্রয়োজনীয়তা তেমনভাবে অনুভূত হয়না। কিন্তু তখনকার সময়ে এগুলোর অপরিহার্যতা সামান্য চিন্তা করলেই অনুধাবন করা যায়।

সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন প্রকার ছবি, অমুসলমানদের মেলা পার্বণ ইত্যাদি সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম জনসাধারণকে সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ‘মাসায়েলে আরবা’ নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। সমাজে এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের অবাধে চলাফেরা মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। এটি মুসলমানদের জন্য কত মারাত্মক সেটি অজ্ঞ জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরার জন্য কুরআন-হাদীস ফিকাহর দলীল সম্বলিত “নারী ও পর্দা” নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পর্দা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে উনিশটি অধ্যায়ে এই পুস্তকখানি বিভক্ত। এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা আকীদার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। ওয়াজ, তা'লীম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লোকজনকে তিনি আকীদার গুরুত্ব অনুধাবন করাতে চেষ্টা করতেন। ঈমানের পরই আকীদার প্রশ্ন আসে। রাসূলুল াহ (দঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদী ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ৭৩ দলের এক ভাগ নাজাত পাবে আর ৭২ ভাগ জাহান্নামে যাবে। শুধুমাত্র আকীদার বিভিন্নতার কারণেই মুসলমানদের মাঝে এতসব দলের সৃষ্টি হবে। আকীদা ঠিক না থাকলে আমাদের আমলের কোন মূল্য নেই। নিæের ছোট্ট একটি ঘটনা থেকেই এ কথার সত্যতা মিলে।

খারেজী দল একটি ভ্রান্ত আকীদার দল। খারেজী আবদুর রহমান ইবনে মোলজেম হযরত আলী (রাঃ) কে তৎকালীন সবচাইতে বড় মুশরেক বলে বিবেচনা করত। নাউজুবিল াহ মিন জালিক। অথচ তার বাহ্যিক আমল অত্যন্ত ভালো ছিল। শরীয়তের বিচারে তাকে যখন কতল করার হুকুম হল, তখন এজন্য সে কোন দুঃখ প্রকাশ করেনি। এমনকি যখন তার হাত-পা কাটা হচ্ছিল তখনও সে কোনরূপ দুঃখ করেনি- কিন্তু যেইমাত্র তার জিহŸা কাটার হুকুম হল সে কাঁদতে শুরু করল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল- যে জিহŸা দ্বারা আমি আল াহর জিকির করতাম সেটি কাটা হলে আমি সেই আমল করা থেকে বঞ্চিত হব।

লক্ষ্য করার বিষয় হযরত আলী (রাঃ)-এর মত বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুশরেক জেনেও শুধুমাত্র সে তার আমল দ্বারা নাজাত পাবে এমন ধারণা পোষণ করেছিল। এটি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। আমলের চাইতে আকীদার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার নির্দেশে বিভিন্ন বাতিল আকীদার বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে জনসমাজে পেশ করা হত। "মাজহাব ও তাকলীদ" নামে তিনি একটি কিতাব প্রণয়ন করেন। এ কিতাবে মাজহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন। বহু সংখ্যক দলীল প্রমাণ দ্বারা মাজহাব অনুসরণ করার অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছেন। তৃতীয় হিজরী হতে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীর মাজহাব অনুসরণকারী শ্রেষ্ঠ আলেমগণের যোগ্যতা ও পরিচয় পেশ করে মাজহাব সম্পর্কে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। এই কিতাবখানি প্রণয়ন করতে তার দীর্ঘদিন শ্রম স্বীকার করতে হয়। বর্তমান যুগে আজ যারা মাজহাবের তাকলীদকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং নিজেদের সপক্ষে নানা যুক্তি উত্থাপন করে তারা এই কিতাবখানি নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে অধ্যয়ন করলে অবশ্যই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আর একটি বিশেষ অবদান হল ফতোয়া সংকলন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক ফতোয়া সংকলন করে গিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ের মতভেদ ও বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান এই ফতোয়া পুস্তকে রয়েছে। এই ফতোয়া সমূহ "ফতোয়ায়ে ছিদ্দিকিয়া" নামে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। উলি-খিত কিতাব ছাড়াও তিনি ছোট-বড় আরও অনেকগুলো কিতাব সংকলন ও প্রণয়ন করে জনসমাজে প্রচার করে গিয়েছেন।

এই সকল পুস্তকের উপাদান সংগ্রহে, লেখায় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজে অনেকেই বিভিন্নভাবে মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে সহায়তা করেছেন। মুদ্রণকাজের ফান্ড গঠনের নিমিত্তে প্রথমে "ছিদ্দিকীয়া ফান্ড" নামে মুষ্টি চাউলের একটি ফান্ড খোলা হয়। পরে 'মুসলিম স্টোর' নামে একটি সমবায় গড়ে এর মাধ্যমে মুদ্রণ বিভাগের কাজ চালানো হয়। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজ তহবিল হতেও প্রায় সময়ই বহু অর্থ পুস্তক প্রকাশের জন্য দান করেছেন। এইভাবে ধীরে ধীরে পুস্তক প্রকাশনা চলতে থাকে। এই সব পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ টাকাও অন্য কোন কাজে ব্যয় হতনা। এর দ্বারা ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করে পুস্তক মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হতে লাগল। ক্রমান্বয়ে এটি মাদরাসা তহবিলের একটি নিজস্ব স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার প্রতিটি কাজই তাঁর নিঃস্বার্থ ত্যাগের স্বাক্ষর মিলে। এই সকল পুস্তকের আয় সঙ্গতভাবেই তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশনায় তার অপরিসীম শ্রম ও সময় ব্যয় হলেও সকল পুস্তক তিনি ছারছীনা

দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় ওয়াক্ফ করে গিয়েছেন। তিনি যে পুস্তক প্রণয়ন তাঁর নিজস্ব কোন আর্থিক সচ্ছলতার জন্য করেননি এবং অজ্ঞ সমাজকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়াই যে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল- তাঁর এই কাজ তারই সুস্পষ্ট নজির বহন করে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার পুস্তক প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছারছীনা থেকে আরও অনেকেই হেদায়াত ও সংস্কারমূলক বহু পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এই সব কিতাব তখনকার দিনে সমাজে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে কিরূপ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল সেটি যারা সমসাময়িক ইতিহাস জানেন তাদের কাছে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এই কাজ আলেম সমাজ তথা সকল শিক্ষিত লোকের জন্য আদর্শ হওয়া উচিত। যুগের চাহিদা অনুযায়ী হেদায়াত, শিক্ষা ও সংস্কারমূলক পুস্তক রচনা করে মুসলিম মিল াতকে সত্যিকার ইসলামের দিকে ধাবমান রাখা একান্তভাবে অপরিহার্য।

পত্রিকা প্রকাশনা

পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার প্রতিটি কাজেই একজন সূ²দর্শী সমাজ-সংস্কারকের দূরদর্শিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হত। সমাজের গতিধারা কোন্ মুখী, ভবিষ্যতে এর রূপ কি হবে, এতে ধর্মীয় পরিবেশ কিভাবে প্রভাবিত হবে- ইত্যাদি সম্যক উপলব্ধি করেই তিনি তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়নে তৎপর হতেন, এ কথাটি আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। "তাবলীগ" পত্রিকা প্রকাশনা তার সেই সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও উপলব্ধিরই এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

সমাজ আজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। পূর্বের তুলনায় বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব ছাড়াও প্রতিটি সমস্যার পরিধি ও ব্যাপকতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যদি আজ দেশে প্রকাশিত অথবা আমদানিকৃত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসমূহের দিকে দৃষ্টি দেই এবং সামান্য মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করি তাহলে দেখব এসবের অধিকাংশ লিখাই অনৈসলামিক ভাবভারায় প্রভাবিত। এইসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ধর্ম বিমুখতার যে মারাত্মক বীজ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাতে করে ধীরে ধীরে গোটা সমাজ কলুষিত হচ্ছে, যুব স¤প্রদায়ের মগজে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে দেশের ভবিষ্যত এক চরম অনিশ্চয়তার মাঝে দোল খাচ্ছে।

সমাজতন্ত্র আর কমিওনিজমের হোতারা সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ঘৃণ্য ভাবধারা জনসমক্ষে প্রকাশ করে সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে রয়েছে। বস্তুবাদ ও নাস্তিকতাভিত্তিক বিদেশী সাহিত্যের পর্যাপ্ত আমদানী ও প্রচার সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। এর ফলশ্র"তি হিসেবে দেশের যুব স¤প্রদায় ক্রমে ক্রমে অনৈসলামিক সমাজ-কাঠামোর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ইসলাম-বিবর্জিত জীবনাদর্শের বীজ স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসছে তাদের অন্তরে।

অপরদিকে ধর্মের নামে আহলে সুন্নাত অল-জামায়াতের আকীদাগুলো চিরতরে উচ্ছেদ করার হীন প্রচেষ্টায় মেতে রয়েছে বিভিন্ন বাতিলপন্থী দল। তারা আজ সংঘবদ্ধ। ধর্মের মুখোশধারী তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাদের মুখরোচক কথা আর মনগড়া ব্যাখ্যাসম্বলিত সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটিয়ে সমাজে বয়ে এনেছে এক চরম বিপর্যয়। বিদেশী অর্থে পুষ্ট তাদের সংগঠনগুলো বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে বাতেল আকীদার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দিয়েছে সমাজের সর্বস্তরে- বিভ্রান্ত হচ্ছে সমাজের সরলমনা মানুষ, শিকার হচ্ছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, মাদরাসার তালেবে ইল্্ম।

সমাজের এই সংকট-সন্ধিক্ষণে চলমান অনৈসলামিক ও বাতিল মতবাদকে প্রতিহত করতে হলে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়ে প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে- এর কোন বিকল্প নেই। এদিক দিয়ে বিচার করলে "তাবলীগ" পত্রিকা প্রকাশনা মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কত বড় দূরদর্শিতার পরিচায়ক সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

"তাবলীগ" পত্রিকার আবশ্যকতা হযরত পীর ছাহেব কেবলা কত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, তা নিæে দেয়া তাঁর বক্তব্য থেকেই পাঠকবর্গ অনুধাবন করবেনঃ ইসলামী তাবলীগ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই-বর্তমান যমানায় ইসলামী পত্রিকার সাহায্য ব্যতীত ইসলামী শিক্ষা ও সৌন্দর্যের ব্যাপক তাবলীগ এবং ভ্রান্ত বিদয়াতী মতবাদসমূহের প্রতিরোধ অসম্ভব। অথচ এই ধরনের পত্রিকা আমাদের সমাজে নিতান্তই বিরল। এই অভাব দূর করণার্থে আমি বিগত হজ্জযাত্রার প্রাক্কালে "তাবলীগ" পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই ধরনের ইসলামী পত্রিকা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সমাজের যথোপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে উহাদের প্রায় সবগুলিরই অবলুপ্তি ঘটিয়াছে। মনে রাখিবেন, শয়তানের তাবেদারগণ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে মিটাইয়া দেওয়ার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে। তাহাদের মোকাবিলা করিয়া ইসলামকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন ভাষায় বহু ইসলামী পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা আবশ্যক। আমি সকল সামর্থবান মুসলমানকে "তাবলীগ" পত্রিকার গ্রাহক হইতে এবং গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। কেননা গ্রাহকই পত্রিকার প্রাণ। আশা করি এই পত্রিকাটি যাহাতে সাপ্তাহিকে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পাক্ষিক "তাবলীগ" পত্রিকায় কুরআন শরীফের তাফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন মাছলা-মাছায়েল ছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খবরা-খবর, বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কিত বহু জ্ঞানগর্ভ লিখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি বস্তুতঃ জমিয়তে হিযবুল াহর একটি মুখপত্র। তাই বিভিন্ন সাংগঠনিক আলোচনাও এতে স্থান পায়। এই পত্রিকাটিতে একদিকে যেমন সরকারের কল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করা হয় অপরদিকে তেমনি ধর্মীয় নীতি-বিবর্জিত যে কোন উদ্যোগের গঠনমূলক সমালোচনাও করা হয়। বিভিন্ন সময়ে উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতিতে বিষয়টির সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে জন-সাধারণকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা এই পত্রিকাটির একটি উলে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী পত্রিকা প্রকাশনার জন্য মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আকুল আবেদন সেদিন হয়ত অনেকেই ততটা গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করতে পারেননি। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি বিবেকবান মানুষ নিঃসন্দেহে এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছেন। মরহুম পীর কেবলার আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে যদি বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও সামর্থবান মহল থেকে ইসলামী পত্র-পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, একমাত্র তখনই সমাজে অনৈসলামিক ও ভ্রান্ত লেখনীর বাস্তব প্রতিরোধ সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

রাজনীতির অংগনে পীর ছাহেব কেবলা

সর্বভারতীয় ওলামা সম্মেলনঃ

আজাদী আন্দোলনে অর্থাৎ পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভ‚মি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আলেম সমাজের মাঝে যে দুই মহান ব্যক্তিত্বের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁরা হলেন পশ্চিমাঞ্চলের হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এবং পূর্বাঞ্চলের মুজাদ্দিদে যমান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ফরফুরাভী (রঃ)। মুসলিম সমাজকে আত্মসচেতন করে তোলার জন্য তাঁরা সর্বতোভাবে

প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। উভয়েই মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন এবং কংগ্রেস সমর্থক ওলামায়ে হিন্দের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা 'পাকিস্তান দাবী'র পরিবেশ সৃষ্টি করতে কতটুকু সহায়ক হয়েছিল সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। দুঃখের বিষয় আজাদী লাভের পূর্বেই তারা দুজনই পরপারে চলে যান। ১৯৪০ সালে মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা জনাব এ.কে.ফজলুল হক ছাহেবের পেশকৃত পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয়। সেই থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার এবং অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। এ আন্দোলনের গতিধারা লক্ষ্য করলে ¯পষ্ট হয়ে উঠে যে পূর্বাঞ্চলে ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর অন্যতম প্রধান খলিফা ছারছীনার হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব (রঃ) ও ফুরফুরার তদানীন্তন গদ্দীনশীন পীর হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (রঃ) এবং পশ্চিমাঞ্চলে হযরত আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর ভাবশিষ্য হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর অকুন্ঠ সমর্থন পাকিস্তান অর্জনের দাবীকে সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৫ সালের কথা। আইন সভার সাধারণ নির্বাচন তখন আসন্নপ্রায়। পাক ভারতের মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে সেই নির্বাচনে। তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তারা একটি পৃথক জাতি। তখনকার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে সহজেই বুঝা যায, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ধোঁকাবাজী হতে নিরীহ মুসলমানদের সরিয়ে এনে সঠিক পথে পরিচালনা করে মুসলিম লীগের মাধ্যমে নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীকে জয়লাভ করানো মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। তাই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আলেমদের একটি বিরাট সম্মেলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। নির্বাচনের কয়েকমাস পূর্বে মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় মোহাম্মদ আলী পার্কে একটি বিরাট ওলামা-সম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশ হতে খ্যাতনামা আলেম ও পীর-মোর্শেদগণ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সম্মেলনে বাংলার প্রতিটি জিলা হতে অগণিত আলেম ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা জমইয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসামের পক্ষ থেকে মুসলিমলীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নিকট কতিপয় দাবী উত্থাপন করেন। মূলতঃ ফুরফুরা শরীফের হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী (রঃ) ঐ দাবীগুলো পেশ করেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, ইসলামের স্বার্থে সেইসব দাবী মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি মেনে না নিলে জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসাম ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর পরিচালকদের অনেকেরই আমল-আখলাক শরীয়ত পরিপন্থী, সুতরাং তাদের দ্বারা মুসলমানদের সত্যিকার কোন মঙ্গল আশা করা যায়না। তাই মুসলিম লীগের আদর্শ কার্যকর করার জন্য শরীয়ত-পাবন্দ ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনে জয়লাভ করাতে হবে। তাঁর দাবী গৃহীত না হলে তিনি সম্মেলনে যোগ দিবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। আসন্ন সম্মেলন এক সংকটময় অবস্থায় পতিত হল। আলেমদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ না হলে মুসলিমলীগ কর্তৃক আহূত উক্ত সম্মেলন সফল হবে না, যার ফলে মুসলিমলীগের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, একথা কারও অজানা ছিলনা। সেদিন যে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের একক প্রচেষ্টায় এই সংকটময় পরিস্থিতির নিরসন হয়েছিল তিনি হলেন ছারছীনার পীরে কামেল হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব (রঃ)। তিনি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বরিশাল হতে সদলে কলিকাতায় পৌঁছেছেন। তাঁকে নেজামে মাশায়েখের সভাপতি করা হয়েছিল এবং কাগজপত্রে তাঁর নাম সভাপতি হিসেবে পূর্বেই ঘোষিত হয়েছিল। এই অবস্থায় এক দিকে সম্মেলন বর্জন করা তাঁর পক্ষে যেমন অসুবিধা, অপরদিকে ফুরফুরার হযরত আবদুল হাই ছিদ্দীকী (রঃ)- এর দাবীকেও তিনি কোনক্রমেই উপেক্ষা করতে পারেন না। অনেক আলাপ-আলোচনার পর তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার জন্যই সেদিন সকলের মাঝে সমঝোতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলা সদলবলে সম্মেলনে যোগ দিলেন।

সম্মেলনে ওলামায়ে কেরাম সর্বতোভাবে মুসলিম লীগকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে হযরত মাওলানা আজাদ সোবহানী (রঃ), ফুরফুরা শরীফের হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী ছাহেব (রঃ) এবং ছারছীনার হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) বিভিন্ন

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেদিন ভারতের বিখ্যাত ওলামা ও মাশায়েখগণ উপস্থিত হয়ে মুসলিম ঐক্য-সংহতির প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের প্রভাব বাংলার পরবর্তী নির্বাচনের উপর কতটুকু কার্যকর হয়েছিল সেটি যারা জানেন তারাই শুধু অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। বলতে গেলে বাংলার দ্বিধাবিভক্ত নেতৃত্বের পর পর বিপরীতমুখী নীতি ও আদর্শের সংঘাতের মাঝে আলেমগণের এই সম্মেলন জনসাধারণকে সত্যিকার পথের সন্ধান দিয়েছিল। এর ফলে পাকিস্তান অর্জনের পথ সুগম হয়। বস্তুতঃ এই সম্মেলনের পরই বাংলার প্রায় প্রতিটি আলেম দ্বিধা-সংকোচ পরিত্যাগ করে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন।

সম্মেলনের পরেঃ

সম্মেলন শেষে হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বাড়িতে ফিরে আসেন এবং দেশের সকল মুসলমানকে পাকিস্তান অর্জনের জন্য মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহŸান জানান। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা দেখলেন সারা বাংলার মুসলমান নিজেদের অধিকার ও ভবিষ্যত স¤পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং মুসলিমলীগের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে তিনি লক্ষ্য করলেন, বাংলার অপ্রতিদ্বন্দী নেতা পাকিস্তানের প্রস্তাবক শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক মুসলিমলীগের বিরোধিতা করে কৃষক-প্রজাপার্টি নামে একটি নুতন দলের প্লাটফরমে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। জনাব ফজলুল হক সাহেবের সাথে হুজুর কেবলার স¤পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি যেমন ফজুলুল হক ছাহেবকে øেহ করতেন, তেমনি শেরে বাংলাও হুজুর কেবলাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাতেন। তখনকার প্রচলিত আইন সংশোধন করে কলিকাতার বাইরে ছারছীনাতে প্রথম টাইটেল মাদরাসার মঞ্জুরী জনাব ফজলুল হক সাহেবের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলা জনাব ফজলুল হক ছাহেবের সাথে তাঁর স¤পর্কের কথা চিন্তা করে অনুধাবন করলেন যে, আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনবোধে ব্যক্তি বিশেষকে বর্জন করতে হবে। জাতীয় স্বার্থ, সংহতি, মুসলিম জামায়াত- এ সবের সামনে কোন ব্যক্তি বিশেষকে স্থান দেয়া কিছুতেই সঙ্গত হবেনা। বস্তুতঃ তাঁর এই নীতি ও চরিত্র হতে সারা জীবন একবিন্দুও তিনি বিচ্যুত হন নাই। যাইহোক, সেই মুহূর্তে তাঁর সেই দৃঢ়তা, তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয় দেয়। তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সাহেব জাতীয় বৃহত্তম স্বার্থে কিছুতেই সমর্থন করেননি।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কখনও উগ্রপন্থী ছিলেননা। আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের মাঝে সবসময়ই আপোস-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই শেরে বাংলার তখনকার কার্যকলাপ সমর্থন না করলেও তাঁকে কীভাবে মুসলিমলীগে ফিরিয়ে আনা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন। তিনি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের মধ্যে বিরাজমান মতবিরোধ দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালেন। জনাব শেরে বাংলা তখন খুলনা জিলায় নির্বাচনী প্রচারে কার্যরত। সেই সময় হুজুর কেবলা নিজেদের মাঝে সকল বিরোধ মিটিয়ে ফেলার উপদেশ দিয়ে একটি পত্র লিখে তাঁর কাছে পাঠালেন। পত্রে হুজুর কেবলা শেরে বাংলাকে কায়েদে আজমের সাথে মতপার্থক্য দূর করে ফেলার উপায় নির্ধারণ ও মুসলিমলীগে যোগদানে তাঁর বাধা অপসারণে যে কোন প্রকার সহায়তা করতে রাজী আছেন বলে জানিয়ে তাঁকে মুসলিমলীগে ফিরে এসে মুসলিম মিল াতকে শক্তিশালী করার অনুরোধ জানান। শেরে বাংলা পত্র পড়ে উত্তর দিয়েছিলেন- "আমি হুজুর কেবলার অনুরোধ রক্ষা করবো, তবে ইলেকশনের আগে নয়, পরে"। জনাব শেরে বাংলার জবাবে মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলা দুঃখ পেয়েছিলেন কিনা বা তাঁর মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, জানা নেই, তবে শেরে বাংলার উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দু'টি কেন্দ্র হতেই বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন, তবে প্রদেশের অন্য সব জায়গায় মুসলিমলীগ শতকরা ৯৬ ভোটে জয়লাভ করে শেরে বাংলার পাকিস্তানবিরোধী কৃষক-প্রজা পার্টির অপমৃত্যু ঘটালো। পরিশেষে মুসলিমলীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবসে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর জনাব ফজুলুল হক ছাহেব পুনরায় মুসলিমলীগে যোগদান করেছিলেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও হুজুর কেবলাঃ

দেশের ছোট-বড় বহু রাজনৈতিক নেতা হুজুর কেবলার দরবারে এসে দোয়া এবং বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি সকলের সাথেই সদালাপ করতেন, তাদের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। বাংলাদেশের খ্যাতনামা নেতাদের মধ্যে জনাব এ.কে.ফজলুল হক, জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব তমিজউদ্দিন খান, জনাব আবুল ওয়াহাব খান প্রমুখ মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলার সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, মতবিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি সবার জন্য দোয়া করতেন এবং তাদেরকে শরীয়তের পাবন্দ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের খেদমত করার উপদেশ দিতেন।

মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে শরীয়তের তেমন পা-বন্দ ছিলেন না। এতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মনে বিরাট প্রশ্ন জাগত। মহরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। সভা-সমিতিতে তাদের জন্য আল াহ্র দরবারে দোয়া করতেন। তিনি বলতেন- জাতির চরিত্রে নেতৃবৃন্দের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। তাই তারা যদি শরীয়তের হুকুম-আহকামকে অমান্য করে চলে, তবে সমাজ বিকৃতভাবে গঠিত হতে থাকে। তাছাড়া শরীয়ত অমান্যকারী নেতাদেরকে সমর্থন করা আলেমদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এবং এদ্বারা জনসাধারণ বিভ্রান্ত হতে থাকে।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে শরীয়তবিরোধী কাজের জন্য দুঃখ করতেন, দোয়া করতেন, কিন্তু কখনও অবহেলা করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন না। এতে একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের উদারতার পরিচয় মিলে, অপরদিকে তেমনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আভাস পাওয়া যায়। শরীয়ত-লংঘনকারী নেতাদের নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দলকে কিরূপে সমর্থন করতে পারেন, মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলাকে প্রায়ই এরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। তিনি সহাস্যে এ প্রশ্নের জবাব দিতেন "আমাদের বিষয়-স¤পত্তি রক্ষার জন্য উকিল, ব্যারিস্টার ইত্যাদি নিযুক্ত করিয়া থাকি; কারণ, আইন-কানুন, তাঁহারা আমাদের চাইতে ভাল জানেন। এক্ষেত্রেও তদ্রƒপ, আমাদের নেতৃবৃন্দ জাতীয় দাবী-দাওয়া ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির নিকট হইতে আমাদের চাইতে ভালভাবে বুঝিয়া আনিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি এবং এ জন্যই তাঁহাদিগকে সামনে আগাইয়া দিয়াছি"। সুবহানাল াহ! কী সুন্দর যুক্তি! কী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি! বস্তুতঃ তাঁর এই মনমানসিকতা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুণই সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং নিঃসংকোচে তাঁর কাছে এসে দোয়া নিতেন এবং উপদেশ গ্রহণ করতেন। প্রকৃত হাদীর এটি একটি লক্ষণ বটে।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র নিকট হুজুর কেবলার পত্রঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মাঝে মাঝে পত্র লিখে নেতৃবৃন্দকে ইসলামী নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করার জন্য আহŸান জানাতেন। ১৯৪৬ সনের ১২ই মার্চ তারিখে জনাব কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে লিখিত তাঁর একটি পত্র পাঠ করলেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনা এবং পাকিস্তানকে তিনি কিভাবে দেখতে চেয়েছিলেন তার একটি সু¯পষ্ট আভাস মিলে। এই পত্রের কপি মরহুম লিয়াকত আলী খান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। পত্রটি নিচে তুলে ধরা হলোঃ

"... ... আপনি ভারতীয় মুসলিমলীগের কর্ণধার। প্রায় সমগ্র ভারতীয় মুসলমান আপনার নেতৃত্বে সমবেত হইয়াছে। আপনি পাকিস্তানের দাবী তুলিয়াছেন। উহা দশ কোটি মুসলমানের এক ভাবী আশার ইঙ্গিত দিতেছে। আমরা এই ভবিষ্যৎ আল াহর মেহেরবানীর সহিত যুক্ত দেখিব বলিয়া আশা করি।

আপনি স¤প্রতি বাংলাদেশ ছফর করিয়া গিয়াছেন এবং বাংলার অবস্থা অবশ্যই কিছু অবগত হইয়াছেন। আপনি বাংলাদেশের ছফরে কোনও কোনও বক্তৃতায় শরীয়তের এবং ইসলামের কথা উলে-খ করিয়াছেন। উহাতে আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিমলীগের লক্ষ্য, (অর্থাৎ পাকিস্তান) মুসলমানের দ্বীন ও ঈমানের শক্তিতেই হাছেল হইতে পারে। দ্বীন ও ঈমানের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া ব্যতীত মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান দাবী মুসলমানের আন্তরিক শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হইবেনা। প্রচার ও আন্দোলন দ্বারা কোনও জিনিসকে সর্বব্যাপী করিয়া তোলা যাইতে পারে, কিন্তু কোনও জিনিসকে বহাল ও কায়েম রাখিতে হইলে, উহাকে খাঁটি করিয়া তুলিতে হইলে উহার ভেজাল দূর করিতে হইবে, তবেই উহা স্থায়ী হইতে পারে।

পাকিস্তান যে সাধনার ইঙ্গিত দেয় উহা সহজ সাধনার জিনিস নহে। কাজেই উহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ কেবল প্রচারগত না হইয়া সম্বন্ধ হওয়া উচিত একান্ত আত্মিক ও মৌলিক। ইহা ব্যতীত পাকিস্তান অর্জনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারেনা। মানুষ যতক্ষণ কোনও জিনিসকে অন্তর দিয়া ভাল না বাসিতে পারে, ততক্ষণ উহা লাভ করিবার আন্তরিক আগ্রহ হয়না। উহার প্রমাণ মুসলিম লীগের বিগত পার্লামেন্টারী বোর্ডের নমিনেশনে দেখা গিয়াছে। যে সকল সদস্য আইনসভার সদস্য-পদ লাভের জন্য মনোনয়নপত্র পাননাই, তাঁহাদের অনেকেই বে-সামাল হইয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, পাকিস্তান দাবীর সঙ্গে সঙ্গে উহাতে মানুষের অন্তরের যোগ স্থাপন করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল, তাহা এখনো হয়নাই। উহা হইতেছে পাকিস্তানের ইসলামী রূপ। মুসলিম লীগ আজ যতখানি রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই পরিমাণ ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কারণে জনসাধারণ 'পাকিস্তান' শব্দ বার বার শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিলেও উহা তাহাদের কতখানি আপনার জিনিস, উহা শুধু তাহারা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ভিতর দিয়া ভাল বুঝিতে পারে না। তাহারা উহা বুঝিতে চাহে ধর্মনৈতিক উন্নতির স্বীকৃতির ভিতর দিয়া এবং উহা কার্যতঃ কিভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহাও কাজের ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে।

মুসলিম লীগের কার্যতালিকায় ইসলামী শরাহ-শরীয়তের উন্নতিবিধান করার কথা রহিয়াছে। ইহা আমরা জানি, এবং এই জন্যই মুসলিম লীগকে মুসলমানের রাজনৈতিক মুক্তির পন্থা এবং শরাহ-শরীয়তের খাদেম বলিয়া মনে করি, কিন্তু ইসলামী তাহযীব, তামাদ্দুন, আকায়েদ, আমল ও জাতীয় রীতি-নীতি, ইবাদৎ-বন্দেগী ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদি যাহা দ্বারা একজন মুসলমানকে ¯পষ্টতঃই মুসলমান বলিয়া চেনা যায় ও মুসলমান বলা যায় সেই বিষয় আপনাদের আগ্রহ থাকিতে হইবে, কার্যপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সর্বব্যাপী ঘোষণা দ্বারা একথা জনসাধারণের মনে বিশ্বাস করাইতে হইবে যে, পাকিস্তান শুধু একটি রাজনৈতিক শ্লোগানই নহে, ইহা দ্বীন-শরীয়তেরও বাহক। আজ বাংলার নির্বাচন-সংগ্রামের প্রাক্কালে আপনাকে একথা একান্ত ভাবেই স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, বাংলার ওলামা ও জনসাধারণ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে শুধু তাঁহাদের রাজনৈতিক কুশলতা দ্বারাই বিচার করিবেনা। উহার সহিত তাঁহাদের ইসলাম-প্রীতি এবং মুসলমানী আমলও দেখিতে চাহে। এই সঙ্গে আপনাকে ¯পষ্টভাবে একথাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, অখণ্ড হিন্দু রাজত্বের কবল হইতে আমাদের সর্বপ্রকার মুক্তির জন্য এই যে সংগ্রাম, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য হিন্দুয়ানী ও গায়র ইসলামী সর্বপ্রকার আমল ও আচরণ হইতে তওবা করিবার জন্য মুসলমানদিগকে মুসলিমলীগের কণ্ঠে আহবান করিতে হইবে। ছোট বড় সর্ব শ্রেণীর লীগ নেতৃবৃন্দকে এই আহবানের সামনে মাথা নত করিতে হইবে, তবেই আমরা মুসলিমলীগ স¤পর্কে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিতে সমর্থ হইব।

মুসলিম লীগের নির্বাচন-সংগ্রামকে ব্যর্থ করার জন্য আজ ইহার বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চলিতেছে, উহা বন্ধ করার জন্য উপরোক্ত মর্মে আপনার ঘোষণা একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

ইসলামী শরীয়তে আওরাতের পর্দা ফরজে আইন। ইহা সত্তে¡ও মুসলিম লীগের সভা-সমিতিতে নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা, গায়িকা, প্রভৃতির প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। মুসলিম লীগের সভা-সমিতির রিপোর্ট পাঠে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম লীগের মধ্যে শরীয়তের এই খেলাফ আচরণ কোনও ধর্মপ্রাণ মুসলমান দেখিতে চাহেনা, এবং তাহারা ইহা মুসলিম লীগের আদর্শের বিপরীত বলিয়া মনে করে। আপনি এই বিষয়েও শরীয়ত মোতাবেক ঘোষণা দ্বারা মুসলমানের দ্বিধা দূর করিবেন। মুসলিম লীগের আসন্ন নির্বাচনকে বিরুদ্ধবাদীদের নানা প্রকার প্রচারণার হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে আপনাকে অবশ্যই ইহা ঘোষণা করিতে হইবে। নতুবা নির্বাচন সংগ্রামে মুসলিম লীগকে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

আমি একান্ত ব্যক্তিগতভাবে এবং সতর্কতার সহিত আপনাকে এই পত্র দিলাম। আশা করি আপনি আমার এই পত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া নির্বাচনের পূর্বেই ইহার উত্তর দান করিবেন।

ইতি-
(স্বাঃ) নেছারুদ্দীন আহমদ
ছারছীনা।

বস্তুতঃ পাক ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের মধ্য হতে এমনি ভাবধারা উত্থাপন হওয়ার দরুণই কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বার বার ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের ওয়াদা করেছিলেন। এ কারণেই দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে কায়েদে আযম পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করার ওয়াদা সম্বলিত একটি বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন।

আইন পরিষদে সদস্য নির্বাচন প্রসঙ্গঃ

আমাদের দেশে সাধারণতঃ নির্বাচনের সময় প্রার্থীগণ মিথ্যা ওয়াদা দিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিতে চেষ্টা করে। মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলা এরূপ জানলে বড়ই দুঃখিত হতেন। তিনি এজন্য সভা সমিতিতে ও বিবৃত্তির মাধ্যমে ভোটার ও ভোটপ্রার্থী উভয়কে সতর্ক করে দিতেন এবং যথারীতি উপদেশ প্রদান করতেন। আইন সভায় নির্বাচন স¤পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলার একটি বিবৃতির অংশবিশেষ নিæে উদ্ধৃত হলোঃ

... এতদ্বারা সর্বসাধারণ মুসলমানকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মেম্বার-নির্বাচন আসন্নপ্রায়। এই ব্যাপারে কেহবা ব্যক্তিগতভাবে, কেহবা দল বিশেষের পক্ষ হইতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পুরাতন প্রার্থী ছাড়া বহু নুতন প্রার্থীও রহিয়াছেন। আমি সকলের জন্য নিরপেক্ষভাবে এই নসীহত করিতেছি।

এক একটি কেন্দ্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থী দাঁড়াইয়া নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রার্থীই নিজ মতলব হাছিলের জন্য ভোটারগণকে নানা উপায়ে চাপ দিয়া থাকেন। টাকা, পয়সা, স্তোতিবাক্য, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, মিথ্যা প্রচার ইত্যাদি বহু রকম ব্যবস্থাই ভোট আদায়ের জন্য করা হয়। মূর্খ জনসাধারণ এই সকল ফাঁদে পড়িয়া বহু স্থলে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিয়া নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া দেয়। ইহাতে খাঁটি সমাজ সেবক ও ন্যায়পরায়ণ লোকগণ অনেক স্থলে নির্বাচিত হইতে পারে না। ইহার ফলে সমাজ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া আইন পরিষদ পর্যন্ত সর্বত্র এই অভিযোগ পাওয়া যায়। নির্বাচন প্রার্থীগণের এই উপায়ে ভোটগ্রহণ এবং ভোটারগণের ভোটদান দুর্নীতিমূলক। আগামী নির্বাচনে এই সকল দুর্নীতি যাহাতে প্রশ্রয় না পায় তজ্জন্য প্রত্যেক সমাজপ্রাণ ব্যক্তিকে সচেষ্ট হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ভোটারগণকে আমি বিশেষ তাকীদের সহিত সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আপনারা আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে স্বার্থত্যাগী, সমাজহিতৈষী, ধর্মপরায়ণ ও শরীয়তের পাবন্দ দেখিয়া ভোট

দিবেন। যদি আপনারা প্রতারণায় ভুলিয়া, টাকা পয়সা লইয়া অথবা মিঠাই-মণ্ডা খাইয়া স্বার্থপর ও ধর্মদ্রোহী লোকদিগকে ভোট দিয়া নির্বাচন করেন তবে আপনারা নিজের ও সমাজের অনিষ্টের জন্য দায়ী হইবেন।

যাহারা আইন সভার সদস্য-পদ-প্রার্থী হইয়া আগামী নির্বাচনে দাঁড়াইতে চাহেন তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, জনসাধারণ যাহাদিগকে নিজেদের প্রতিনিধি বলিয়া বিশ্বাস করে এবং আইন সভায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক এবং যাহারা আল াহ ও রাসূলের নির্দেশ মতে নিঃস্বার্থভাবে কাওমের খেদমত করিতে সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন কেবল মাত্র তাহারাই এই পদ প্রার্থী হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত স্বার্থ, মান, মর্যাদা ও অর্থলাভের জন্য জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া কেহই যেন এই পদ গ্রহণ না করেন। অন্যথায় এইরূপ স্বার্থপরতার জন্যই কওমের সর্বনাশ সাধিত হইবে।

সমাজে দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি রহিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষিত ও আরবী শিক্ষিত। উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যেই নিঃস্বার্থ, যোগ্য ও প্রতিভাশালী লোক রহিয়াছেন। সমাজের সব ক্ষেত্রেই তাহারা মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছেন। বর্তমানেও আমাদের উভয় শ্রেণীর গণ-নেতার প্রয়োজন সব ক্ষেত্রেই রহিয়াছে। উভয় শ্রেণীর গণ-নেতার সহযোগিতাপূর্ণ ব্যবস্থার উপরই আমাদের সমাজের সর্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে। ইহারা একে অপরকে অবজ্ঞা করিলে অন্যায় ও ক্ষতি হইবে। সেই জন্য আমি চাই যে, আইনজ্ঞ, ধার্মিক এবং ইংরেজী শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের সহিত কিছু সংখ্যক আলেম আইন পরিষদে নির্বাচিত হইয়া প্রেরিত হউক। তাঁহারা শরীয়ত ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য পরিষদকে সাহায্য করিবেন। পার্লামেন্টারী বোর্ড অব ইলেক্শনকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, আলেমগণ যদি বিধিমত উপায়ে বোর্ডের মেম্বার হইতে না পারেন তবে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আলেমগণের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন রক্ষা করিতে হইবে, তাঁহাদের মনোনয়ন অনুসারে পরিষদে আলেম সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

তিনি মুসলিম লীগের নীতি ও আদর্শ পছন্দ করতেন বটে, কিন্তু উহা কার্যকরী করার দায়িত্ব আল াহর অনুগত নিঃস্বার্থ নেতাদের হাতে দিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ইচ্ছা করলে অনায়াসে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারতেন, কিন্তু এটি তাঁর অভিপ্রেত ছিলনা। আলেমগণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করলে রাজনীতির আবর্তে তাঁরা তাঁদের সত্যিকারের ইসলামী আখলাক অনেক সময় হারিয়ে ফেলেন এবং সমাজে হেদায়েতের কাজ ব্যাহত হয়। এজন্যই অধিকাংশ ছলফে ছানেহীনদের নীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর অনুসারী আলেমগণকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হতে যথাসম্ভব দূরে থাকার নির্দেশ দিতেন। সমাজে আল াহ-রাসূলের অনুগত নিঃস্বার্থ কতগুলো নেতা ও কর্মী তৈরি এবং তাঁদের হাতে সমাজ সেবার ভার অর্পণ করাই ছিল পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর রাজনৈতিক তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি সারাটি জীবন রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টাই চালিয়ে গেছেন এবং সেদিক দিয়ে তিনি দেশের বিরাট খেদমত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সিলেট রেফারেন্ডামঃ

মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীতে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাতে হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই চরম বিরোধিতা করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দুদের অখণ্ড ভারতের সমর্থনে কোন কোন বিশিষ্ট মুসলিম নেতাসহ আলেম সমাজের একাংশ একই প্লাটফরমে সমবেত হয়ে মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীর বিরোধিতা করেছিলেন, যার জন্য পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে মুসলমানদেরকে কতগুলো বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সিলেট রেফারেণ্ডাম তার অন্যতম। সিলেট জেলায় একদল কংগ্রেস-সমর্থিত আলেম- যারা অখণ্ড ভারতের সমর্থক ছিলেন তাদের বিশেষ প্রভাব থাকায় সেখানকার জনসাধারণকে সহজেই প্রতারণা করা সম্ভব হবে, এ

ধারণায় হিন্দুগণ গণভোট দাবী করে। তারা আশা করেছিল, কংগ্রেসী আলেমগণের সহায়তায় জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে সিলেট জিলাটি হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে। সিলেটের গণভোটের প্রাক্কালে সেখানকার মুসলমান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রায় দেয় কিনা, এ নিয়ে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে কংগ্রেস সমর্থিত আলেম এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পীরে মরহুম হযরত মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ ছাহেবের নেতৃত্বে সিলেট জিলায় একদল কর্মী প্রেরণ করেন। তাঁরা সেই এলাকায় দীর্ঘদিন পাকিস্তানের পক্ষে সভা-সমিতি করে প্রচারকার্য চালান। এতে সিলেট জিলার অধিকাংশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত কর্মীদলের যাবতীয় ব্যয়ভার মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁর প্রতিষ্ঠিত হেমায়েত ইসলাম তহবিল হতে বহন করেন।

ছারছীনায় ওলামা-সম্মেলনঃ

পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা রাজনীতিকে তাবলীগে দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাই একজন হাদী হিসাবে রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ তাঁর ধর্মীয় দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন। আলেম সমাজ সহ দেশের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বহুদিনের ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্জিত হল। অতঃপর পাকিস্তানের জনসাধারণ দেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় বিধানসমূহ কীভাবে রূপ লাভ করবে সেটি দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। এ ব্যাপারে সারা পাকিস্তানে ছারছীনার পীরে কামেল হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) সবচাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দেশের জন্য একটি ইসলামী রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে ছিল তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। তাঁর অগাধ ব্যক্তিত্ব, সমাজে ব্যাপক প্রভাব ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্বভাবতঃই তৌহীদী জনতা, বিশেষ করে ইসলামী সংগঠনগুলো তাঁরই পরবর্তী পদক্ষেপ এবং নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। পাকিস্তান অর্জনের মাত্র একপক্ষকাল পরেই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার আহবানে হেমায়েত ইসলামের উদ্যোগে ছারছীনায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান ওলামা-সম্মেলন দেশের প্রতিটি ধর্মপরায়ণ মুসলমানের প্রাণে যে আশার সঞ্চার করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি পাকিস্তানকে ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য কিরূপ আগ্রহী ছিলেন এই সম্মেলনের আহŸান তারই একটি সু¯পষ্ট স্বাক্ষর। প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ এবং একে ভিত্তি করেই বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

পাকিস্তান অর্জিত হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। আর ছারছীনায় পূর্ব-পাকিস্তান ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় একই বছর ২রা, ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর। [বস্তুতঃ পাকিস্তান অর্জন যখন অত্যাসন্ন তখন থেকেই বিশিষ্ট আলেমগণ মরহুম পীর ছাহেবের সাথে ভাবী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে পত্রালাপ শুরু করেছিলেন। তাই তাঁর আহŸানে পূর্ব পাকিস্তানের সকল জিলার বিশিষ্ট ও সাধারণ আলেম এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান, ক্রমাগত তিনদিন ব্যাপী সম্মেলন, অনুষ্ঠান, সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ একদিকে যেমন সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে, অপরদিকে সেদিন পূর্ব-পাকিস্তান বাসীদের প্রাণে পাকিস্তানের অনাগত ভবিষ্যতের একটি মোহনীয় চিত্র অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছিল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পূর্ব-পাকিস্তানের আলেমগণকে একটি বিরাট সম্মেলনের মাধ্যমে একত্রিত করে তাঁদের দাবীকে সর্বোচ্চ করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানে ইসলামী জনতা ও আলেমগণ কিরূপ শাসনতন্ত্র চান তা এই সম্মেলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মহলে জানানোর প্রয়াস পান।]

সময়টি ছিল বর্ষাকাল। আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। সবকিছু উপেক্ষা করে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কর্ম তৎপরতার মধ্য দিয়ে সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দকে সমবেত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল এখানে তারই খানিকটা আভাস দেয়া হবে। বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকার

মাধ্যমে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। সাধারণভাবে আমন্ত্রণ দেয়া ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পত্রের মাধ্যমে, এমনকি টেলিগ্রাম করেও বহু সংখ্যক আলেম-ওলামা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তন্মধ্যে ফুরফুরা শরীফের মরহুম হযরত মাওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী, মরহুম হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী, পীর ছাহেব, মনারখী শরীফ (নোয়াখালী), মরহুম হযরত মাওলানা আবদুর রহমান দানাপুরী, মরহুম হযরত মাওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানী, মরহুম হযরত মাওলানা আতহার আলী, মরহুম হযরত মাওলানা শামসুল হক, মরহুম ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল াহ, মরহুম হযরত মাওলানা আবদুল খালেক, তদানীন্তন গণপরিষদের সদস্য মরহুম মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা আবুল আলা মওদুদী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে, এই সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর নেতা ও আলেমের সহযোগিতায় নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করার প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং উহা গ্রহণ করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ রাখা।

নেতৃস্থানীয় আলেম ও দেশ-দরদী সকলেই এরূপ একটি সম্মেলনের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করায় চতুর্দিক হতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার মহান প্রচেষ্টার মোবারকবাদ জ্ঞাপন সম্বলিত বহু চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম এসে জমা হতে লাগল। এই সম্মেলন পরিচালনার জন্য একটি অভ্যর্থনা-কমিটি গঠিত হয়। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) নিজেই এই অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলে পীরে মরহুম সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আনুমানিক তিন হাজারের অধিক আলেম ওলামাসহ ত্রিশ সহস্রাধিক লোক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ২রা ও ৩রা তারিখে ওলামা সম্মেলন এবং ৪ঠা তারিখে পূর্ব-পাকিস্তান আরবী ছাত্র-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। দেশের প্রতিটি আরবী মাদরাসা হতে বহু সংখ্যক ছাত্র-প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ওলামা-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার সুবিখ্যাত আলেম ও রাজনীতিবিদ মরহুম হাকিম মাওলানা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী ছাহেব। ছাত্র-সম্মেলনের পূর্ব-নির্ধারিত সভাপতি মরহুম হযরত মাওলানা জাফর আহম্মদ থানবী ছাহেবের ওজর বশতঃ সম্মেলনে যোগদান করতে না পারায় তদস্থলে বিহারের স্বনামধন্য আলেম মরহুম মাওলানা ছহুল ওসমানী ছাহেব সভাপতিত্ব করেন।

সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাকে ইসলামী জীবনযাত্রার কী পরিমাণ অনুকূল করে তোলা যায়, উক্ত সম্মেলনে সেটিই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু। দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসনাধীনে মৃতপ্রায় ইসলামী তামাদ্দুনকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলার এক সক্রিয় মনোভাব এই সম্মেলনের ভিতর দিয়ে পরিব্যক্ত হয়েছিল। সেদিন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সকল জিলা হতে অসংখ্য আলেম ওলামার সাগ্রহ যোগদান, সভামঞ্চে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ বক্তৃতা দান, পরিশেষে পাকিস্তানে ইসলামের মূল বিষয়গুলো যাতে সর্বাবস্থায় সংরক্ষিত ও অক্ষুণœ থাকে সেটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'মাহকামায় কাজা' নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা স¤পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং উক্ত বিষয়ে একটি পরিকল্পনার খসড়া সম্মেলনকর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি দ্বারা আলেমগণের তখনকার কর্তব্য স¤পর্কে সজাগ দৃষ্টি ও আগ্রহী মনোভাবের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। সেদিন স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, আলেমগণের সমবেত প্রচেষ্টা কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে সকল দিক দিয়ে ইসলামী জীবনযাত্রার অনুকূল করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনের বিশাল কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ একটি বিশেষ উলে-খযোগ্য দিক। এদেশে ইসলামী অনুশাসন প্রবর্তন সম্ভব নয়- এরূপ যাদের ধারণা, অথবা পরিবেশ সৃষ্টি না করে রাতারাতি যারা এ দেশে খোলাফায়ে রাশেদীনের হুকুমত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান- তিনি এই উভয় দলেরই বিরোধী ছিলেন। রাজনীতিকে এড়িয়ে নয়, রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গন থেকে বাইরে এনে নয়, ছলফে ছালেহীনের অনুসৃত নীতির

অনুসরণ করে সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তনে পরিবেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেটিই ছিল তাঁর চিন্তা। গদী দখলের মোহে নয়, বৈষয়িক কোন স্বার্থসিদ্ধিতে নয়, সমাজের একজন হাদী হিসাবে ইছলাহে হুকুমতের মাধ্যমে দেশ ও সমাজকে ইসলামী ছাঁচে রূপ দেয়ার জন্য জীবনভর তিনি সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। রাজনীতিতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বাস্তবধর্মী; কখনও আবেগতাড়িত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত তিনি নেননি। যে কোন ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের মোকাবেলায় কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সাথে তিনি কোনদিন কোন আপোষ করেননি। এটি তাঁর চরিত্রের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

হুজুর কেবলার কাশ্‌ফ্‌-কারামত

মরহুম হুজুরের কতিপয় কারামতঃ

- কাফিল উদ্দীন নামে হুজুরের এক ভক্ত মুরীদ জমিতে ধান রোপণকালে শত্র“কর্তৃক আক্রান্ত হন। শত্র“ তাকে হত্যা করার সংকল্প করে। আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে তিনি চাকু দ্বারা আঘাত করেন। এতে সে ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। তিনি মরহুম পীর ছাহেবের কাছে এসে সকল ঘটনা ব্যক্ত করলেন, হুজুর ঘটনাটি শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন- “কাফিল উদ্দীন, কোর্টে সত্য কথা বলতে পারবে?” তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন বটে কিন্তু পরে উকিল- মোক্তারের পরামর্শে তার সেই স্বীকারোক্তি শিথিল হয়ে গেল। কোর্টে দোষ স্বীকার করবেন না বলেই তিনি মনস্থির করলেন।

যথারীতি কোর্টে হাজির হলেন। তিনি তখন কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। হাকিম জিজ্ঞাসামাত্র মিথ্যা বানিয়ে কিভাবে উত্তর দিবেন উকিলদের সেই পরামর্শগুলোই বার বার তিনি স্মরণ করছিলেন। এমনি সময় সহসা কানে তিনি হযরত পীর ছাহেব কেবলার সুস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলেন- “কাফিল উদ্দীন, সত্য বল।” মুহূর্তে তার দেহমন কেঁপে উঠল। এরূপ অদৃশ্য আওয়াজে তার মিথ্যা বলার ইচ্ছা এবং শক্তি স¤পূর্ণ লোপ পেয়ে গেলো। অতঃপর হাকীম যখন জিজ্ঞাসা করলেন- “তুমি দোষী না নির্দোষ” তিনি উত্তর করলেন- “জান বাঁচানোর জন্যই আমি আঘাত করেছি- এতে সে খুন হয়ে গেছে।” তার দোষ স্বীকারে পক্ষের উকিলগণ একেবারে নিরাশ হয়ে গেল- এবং বিপক্ষের সবাই উল-সিত হয়ে পড়ল। অতঃপর হাকীমের রায় বের হল। তিনি মন্তব্য করলেন- ‘আসামী খুন স্বীকারে বিপদ জেনেও সত্য বলেছে- তাই সে আত্মরক্ষার জন্য আঘাত করেছে তার এ কথাও মিথ্যা মনে করার কোন হেতু নেই। সুতরাং সে এই খুনের দায় হতে অব্যাহিত পেতে পারে।’ তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন।

- জনাব সুলাইমান সাহেব এম এ হুজুর কেবলার একজন মুরীদ ছিলেন। তিনি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। একবার নিজ বাড়িতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশ কিছুদিন ঔষধ সেবনের পরও তার রোগের কিছুমাত্র উপশম হলনা। তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, সবাই তার জীবনের আশা পরিত্যাগ করল। এমনি অবস্থায় জনৈক পীর ভাই-এর পরামর্শে তার এক আত্মীয় তার এই চরম অসুস্থতার কথা হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার গোচরীভ‚ত করল। হুজুর বার্তাবাহককে কোন চিন্তা না করে বাড়ি চলে যেতে আদেশ দিলেন। ঠিক ঐ দিনই জনাব সুলায়মান সাহেব অনেকটা অজ্ঞান অবস্থায় তন্দ্রার ঘোরে দেখতে পেলেন কয়েকজন ফেরেশতা নিয়ে হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) আকাশ পথে ছুটে আসছেন এবং তার বাড়ির নিকটবর্তী হলে হুজুর কেবলা বললেন- এইখানে। তারপর মনে হল কে যেন তাকে ঔষধ খাওয়ালেন। তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। তখন থেকেই তিনি সুস্থতাবোধ শুরু করলেন এবং আল াহ্র রহমতে অল্পদিনের মধ্যেই সেরে উঠলেন।

- একবার ময়মনসিংহ জিলার ত্রিশাল সিনিয়র মাদরাসার নিকট কতক লোক বিরাট গানের আসরের আয়োজন করল। মাদরাসা-কর্তৃপক্ষ ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে সেটি বন্ধ

করার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন কাজ হলনা। ছারছীনা দরবারের খলীফা ত্রিশালের মাওলানা আবদুছ ছালাম ছাহেব তখন ছারছীনা মাদরাসার ছাত্র। তার মারফত মাদরাসার কর্তৃপক্ষ সমস্ত ঘটনা পত্রযোগে মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে জানালেন। হুজুর সবকিছু জেনে বললেন- "গানের কর্তৃপক্ষের হেদায়তের ভার আল াহ্ পাকের উপর সোপর্দ করলাম।" এ ব্যাপারে হাত তুলে তিনি দোয়াও করলেন। এদিকে নির্দিষ্ট তারিখে গানের কর্তৃপক্ষ ও গায়কগণ উপস্থিত হল। গান শোনার জন্য বহু লোকের সমাগম। সবাই উৎসুক-উদগ্রীব। হঠাৎ করে অলৌকিকভাবে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। গায়কগণ বেশ ঘটা করে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গানের আসর শুরু করবে মাত্র, এমনি সময় হঠাৎ করে গানের সরদার দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান মাটিতে পড়ে গেল এবং সাথে সাথে তার মৃত্যু হল। আসরের অন্য একজন গায়কও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় সমস্ত লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে স্থান থেকে দৌঁড়িয়ে পলায়ন করল। দ্বিতীয় লোকটিও কয়দিন পর মারা যায়। হারাম কাজে সরদার হওয়ার কারণে দেশীয় কোন আলেম সরদারের দাফন-কাফন বা জানাযা নামাজ পড়েন নাই। মৃত ব্যক্তিকে অগত্যা মাটিতে পুতে রাখা হয়। অনুরূপ ঘটনা মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনে বহু ঘটেছে।

· নোয়াখালী জিলার জনাব ক্বারী শামছুল হক ছাহেব বলেন- "বশিকপুরের জনাব মাওলানা হাশমতউল াহ ছাহেবের বাড়িতে একটি মাহফিলের আঞ্জাম করা হয়। বাদ মাগরিব জিকির তালীমের পর একজন মাওলানা ছাহেবকে ওয়াজ করতে বলা হয়। ওয়াজ আরম্ভের পর আমি মোরাবাকায় ছিলাম। এই অবস্থায় দেখিলাম হুজুর আসিয়া বলিতেছেন- মাজলিস ত নাপাক- কুরআন হাদীসের বয়ান বন্ধ করিয়া আগে মজলিস পাক করিয়া লও। হুজুর আমায় একখানা শলার পিছা দিয়া বলিলেন- মজলিস ঝাড় দিয়া লও। মোরাকাবার অবস্থায়ই আমি তখন দেখিতে পাইলাম- এক কোণে বসিয়া কে যেন বিড়ি খাইতেছে এবং মাঝখানে একটি সাদা শুকর বসিয়া আছে। আমি মোরাকাবা ছাড়িয়া ওয়াজ বন্ধ করিয়া বলিলাম- ঐ কোণে কে বিড়ি খাইতেছে উঠ- মধ্যখানে সুদখোর কে আছ বাহির হইয়া যাও। দুইজনই উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সহ সকল শরীয়তবিরোধী লোকজন তখন তওবা করিল।"

· তিনি আরও বলেন- "উক্ত মাহফিলে দাড়ি মুণ্ডনকারী একজন হাজী সাহেবও ছিলেন- তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলাবলি করিলেন- এমনকি আমাকে জব্দ করার জন্য আমার সাথে 'বাহাছ' করার দিন-তারিখ ধার্য করিলেন। আমার সাথে অনেক আলেম ওলামা ছিলেন- তাঁহারাও প্রস্তুত হইলেন। দুই পক্ষই মারামারি করার জন্য লাঠি সংগ্রহ করিল। ইহাতে আমি বিচলিত হইয়া পড়িলাম। রাতে অজীফা পড়িয়া আল াহ্র কাছে কান্নাকাটি করিলাম। স্বপ্নে দেখি, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা আমাকে বলিতেছেন- বাবা, বাহাছের ব্যাপারে তুমি ভয় পাইয়াছ কেন? চিন্তা করিওনা- বাহাছ হইবেনা। যে লোক এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে সে আজ সারা রাত পাগলের মত ঘুরিতেছে এবং তোমার নিকট আসিতেছে- তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিও। অতঃপর ঘটনা অনুরূপই ঘটিয়াছিল।"

· জনাব কাজী শামসুল হক ছাহেবের কাছ হতে জানা আরও একটি ঘটনা। একবার মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কোন এক মাহফিলে উপস্থিত আছেন। এমন সময় নিকটবর্তী এক বাড়িতে আগুন ধরে যায়। সবাই দৌড়াদৌড়ি করতে চাইলে হুজুর বললেন, ব্যস্ত হবেন না- আল্লাহ রহম করবেন। সাথে সাথে আগুন নিবে যায়। ওয়াজ আরম্ভ হলে হঠাৎ করে বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়। এতে সবাই ছুটাছুটি শুরু করলে হুজুর এবারও বললেন- বাবারা, শান্ত হয়ে বসুন, আল াহ্ রহম করবেন। হুজুরের নির্দেশ অমান্য করে যারা মাহফিল ত্যাগ করে চলে যায়, পরে জানা যায়, বৃষ্টিতে তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। অথচ মাহফিলে অথবা এর আশে পাশে কোনরূপ ঝড় বৃষ্টি হয়নি। এ ঘটনায় স্থানীয় মানুষজন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

· জনাব মুতাজিদুর রহমান ছাহেব হুজুরের একজন মুরীদ ছিলেন। তিনি সরকারী চাকুরী করতেন। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন এবং পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকায় তার বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি লেখা থেকেই নিæের ঘটনাটি বর্ণনা করা হলোঃ

মুতাজিদুর রহমান ছাহেব তখন যুবক বয়সের। হুজুরের মুরীদ হননি। তিনি একবার হুজুরের সাথে দেখা করার জন্য ছারছীনায় আসেন। কাজ সেরে যাওয়ার এজাজত চাইলেন- নৌকা দিয়ে বরিশাল গিয়ে সেখান থেকে লঞ্চে ঢাকা যাবেন। হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) রাজী হলেন না। ঢাকায় জরুরী কাজ আছে- বরিশাল থেকে সেই লঞ্চে না গেলে তার কাজের অনেক অসুবিধা হবে- ইত্যাদি বলা সত্তে¡ও হুজুর তাকে যেতে বিশেষভাবে বারণ করলেন- অগত্যা তাকে থাকতে হল। কিছুক্ষণ পর হুজুরের সাথে আবার দেখা হলে হুজুর বললেন- বাবা, আপনি যাননি ত? হুজুরকে অনেকটা আশ্বস্ত মনে হলো। শুধু তাই নয়- বার বার লোক মারফত সংবাদ দেয়া হল- ঢাকা থেকে যে মেহমান এসেছে তিনি যেন না যান। মুতাজিদুর রহমান ছাহেব শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলেন- মুরীদ হলাম না, টুপি পড়া, দাড়ি রাখা ইত্যাদি কোন কিছুর ওয়াদা করলাম না- অথচ আমার যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে পীর ছাহেবের এত ওজর-আপত্তি, এত উৎকণ্ঠা কেন? যাই হোক, হঠাৎ করে শেষ রাত্রের দিকে তিনি শুনলেন- সেদিনই কিছুক্ষণ পর একটি লঞ্চ ছারছীনা হয়ে বরিশাল যাবে- হুজুরের এক আত্মীয় সেই লঞ্চে যাবেন। তার সাথে বরিশাল যাওয়ার জন্য লোক মারফত মুতাজিদুর রহমান ছাহেব এজাজত চাইলে হুজুর সাথে সাথে রাজী হয়ে যান। তিনি বরিশাল এসে লঞ্চযোগে ঢাকা রওয়ানা হলেন। লঞ্চে বসে তিনি চিন্তা করছিলেন- "কতলোক, পীর ছাহেবের কত মুরীদ নৌকা যোগে ছারছীনা থেকে বরিশাল যাতায়াত করেছে- তাদেরকে বাধা দেননা- আমাকে বাধা দেওয়ার কারণ কি? আমি যদি গতকাল নৌকায় আসতাম তাহলেও ত এই একই লঞ্চে ঢাকায় যেতাম।" একটু পরই লোকমুখে জানতে পেলেন আগেরদিন বরিশালে ভীষণ ঝড় হয়েছিল- তাতে জলোচ্ছ¡াসের মত হয়ে বরিশাল টাউনে পর্যন্ত পানি উঠেছিল এবং নদীতে বহু নৌকা ডুবে গিয়েছিল। মুতাজিদুর রহমান ছাহেব হিসেব করে দেখলেন- তিনি যদি আগেরদিন ছারছীনা থেকে নৌকায় রওয়ানা হতেন তাহলে প্রবল ঝড়ের সময় তিনি নদীর ঠিক মাঝখানে থাকতেন। আল াহই জানেন- তার কি অবস্থা হত। মুহূর্তের মধ্যে তার মনের সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল।

- মুজাজিদুর রহমান ছাহেবের লিখা থেকে আরও একটি ছোট্ট ঘটনা উলে-খ করছি। তখন তিনি হুজুরের মুরীদ। হুজুর তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একবার ছারছীনা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হুজুর বললেন "ছারছীনায় আবার আসবেন।" তিনি উত্তর করলেন- না হুজুর, আসা খুব অসুবিধা। আমার অফিসার অত্যন্ত কড়া মেজাজের, ছুটি চাইলে ভীষণ বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। হঠাৎ করে হুজুরের শান্ত মুখখানি পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন- 'কোথাকার অফিসার?- তাকে বলে দিবেন আমার নাম।' মুতাজিদুর রহমান ছাহেব বলেন- 'আমি অবাক হয়ে গেলাম ঢাকায় এসে দেখি সেই বদমেজাজী, কড়া অফিসারটি আর সে অবস্থায় নেই। সে একবারে শান্ত হয়ে গেছে। ছুটি চাইলেও কোনদিন কোন প্রশ্ন করেনি।' প্রশ্ন হলো- ছারছীনায় বসে হুজুর ধমক দিলেন- কি ভাবে সেই ধমক ঢাকায় এসে কড়া অফিসারটির বুকে এসে লাগল যাতে করে রাতারাতি চিরদিনের মত সে একেবারে শান্ত হয়ে গেল?

- খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও অনেক ঘটনার মধ্যে হুজুরের কারামত লক্ষ্য করা যেতো। কোন এলাকায় হুজুর হয়ত মাহফিল করেছেন, মাহফিলের পর হুজুরকে খানা দেয়া হয়েছে কিন্তু লোকমা হাতে নিয়েই তিনি বলেছেন- 'এ খানা খাওয়া যাবেনা- খানা নিজেই আমাকে খেতে নিষেধ করছে। খানার মালিককে ডাক।' খোঁজ খবর নেওয়ার পর সত্যিই দেখা যেতো- হয় মালিকের মাল হারাম অথবা তার বাড়িতে শরীয়তের কোন আমল নেই। হুজুর তখন সকলকে তওবা পড়াতেন- পরে তাঁর নিজস্ব বুঝমতে কখনও কখনও তাদের খাবার খেতেন অথবা কখনও খানার উপযুক্ত মূল্য মালিককে দিয়ে পরে খাবার খেতেন। অবশ্য এমনও হয়েছে নিজের খাদেমকে দিয়ে পাক করিয়ে সেই খাবার খেয়েছেন। এই ঘটনাগুলো আমাদের কাছে সামান্য ব্যাপার মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলোর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তাঁর তাকওয়া, পরহেজগারীর স্বাক্ষর মিলে অপরদিকে আল াহ্র এইসব প্রিয় বান্দাদের মনে কোন বিষয় বা জিনিসের প্রকৃত অবস্থা কত সহজভাবে প্রতিফলিত হতে পারে তা উপলব্ধি করা

যায়। সাধারণ মানুষ যেমন ফুলের গন্ধ থেকে বিভিন্ন ফুল আলাদা করতে পারে, গন্ধ থেকে সেটি ভালো না খারাপ বুঝতে পারে, ঠিক তেমনি আল াহ্র রহমতে ওলী আল াহগণ সত্য-মিথ্যা, হারাম-হালালের গন্ধ বুঝতে পেরে তাদের মাঝে সূ² তফাৎও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন।

· একবার হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)- এর জনৈক মুরীদ বাড়ি থেকে ছারছীনায় এলে হুজুর তাকে বাড়ির কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানালেন তার এলাকায় বাবুই পাখীর খুব উপদ্রব। ফসলাদি নষ্ট করে দিচ্ছে। শুনে হুজুর বললেন- "আমার কথা বলো- চলে যাবে।" এ কথা শুনে হুজুরের সেই মুরীদ সেইদিনই বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন। বাড়ি পৌঁছতে তার রাত হয়ে গেল। গিয়েই তিনি উচচস্বরে বললেন, ও বাবুই পাখিরা, শোন- ছারছীনার পীর ছাহেব কেবলা তোমাদের এখান থেকে চলে যেতে বলেছেন। পরদিন সকালবেলায় সকলে অবাক হয়ে দেখল- এলাকায় কোন বাবুই পাখির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এসব ঘটনা বাস্তবিকই সাধারণ বুদ্ধির আওতায় পড়েনা। তবে ওলী-আল াহ্দের জীবনে এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই দেখা যায়। আসলে যে ব্যক্তি পুরোপুরি আল াহ্র বাধ্য, সারা সৃষ্ট জীব তার বাধ্য হয়ে যায়। একবার হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ) নদীর ধারে বসেছিলেন। কতগুলো লোক তাঁর কাছে এসে বলল- হুজুর, বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে এই দরবেশী জীবনে আপনি কি পেলেন? তিনি বললেন- "কি পেয়েছি দেখ"- এই বলে একটি সূঁই পানিতে ফেলে দিলেন এবং নদীর মাছদের উদ্দেশ্য করে বললেন- 'সূঁইটি নিয়ে আস।' সাথে সাথে অনেকগুলো মাছ স্বর্ণের সূঁই মুখে নিয়ে হাজির হল। হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ) বললেন- 'আমার সূঁইটি নিয়ে এস।' তখন একটি মাছ মুখে করে তাঁর সেই সূঁইটি নিয়ে হাজির হল। তখন তিনি বললেন- যখন আমার বাদশাহী ছিল- তখন কেবল মানুষ আমার কথা শুনত, এখন আল াহর রহমতে আল াহ্র সকল সৃষ্ট জীবই আমার কথা শোনে।"

· হযরত মাওলানা ওয়ালী উল াহ ছাহেবের (পীর ছাহেব, মৌকরা) প্রথম মুরীদ হওয়ার ঘটনাটি নিম্নে বর্ণিত হল। তিনি বলেন- "হযরত পীর ছাহেব (রঃ)-এর তালাশে আমি চাঁদপুর যাই। সেখানে শুনতে পাইলাম যে পীর ছাহেব কেবলা ইব্রাহীমপুর ঘাটের নিকটে গাজীপুরে সভা করিতেছেন। সেখানে যাইয়া দেখি মাগরিবের পর সভা শুরু হইয়াছে। হুজুর মঞ্চে বসিয়া ওয়াজ করিতেছেন, লক্ষ জনতার শেষ ভাগে আমি বসিয়া সকলের সাথে তওবা করিলাম এবং রাতের অন্ধকারে বয়াত হইলাম। এতে আমার মনে তৃপ্তি পাইলাম না। পরদিন নদীতে লঞ্চে উঠিয়া বলিলাম- হুজুর, আমি আপনার নিকট মুরীদ হইতে আসিয়াছি। হুজুর কেবলা বলিলেন- বাবা, তুমিত গতকল্যই বয়াত হইয়াছ। আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। জীবনে ইতিপূর্বে তাঁহার সঙ্গে আমার কোন দেখা হয় নাই- তিনি রাতে অন্ধকারে কিভাবে চিনিলেন? আমি বলিলাম- হুজুর, আমি আপনার পবিত্র হাত ধরে বয়াত হইতে চাই। তিনি বলিলেন, বাবা আর লাগিবেনা।"

· জনাব মৌলভী নূরুদ্দীন আহমদ ছাহেবের লিখা সীরাতে নেছারিয়া থেকে একটি ঘটনা উলে-খ করছি। তিনি বলেন- "বরিশালের কোন থানা এলাকায় আমরা পীর ছাহেবের সাথে একটি মাহফিলে গিয়াছি। মাগরিবের নামাজ শেষ হইয়াছে, পীর ছাহেব একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। এমন সময় এক ব্যক্তি সবেগে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং পীর ছাহেবের পা জড়াইয়া ধরিল। আমরা উক্ত ব্যক্তির এরূপ কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম, পরে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে বলিতে লাগিল- হুজুর আমাকে জাতি সাপে দংশন করিয়াছিল। এমন স্থানে দংশন করিয়াছিল যে সেখানে কাহারও কোনরূপ সাহায্য পাওয়ার মত লোকজন নিকটে ছিলনা। আমি একান্ত নিরুপায় হইয়া চিৎকার দিয়া বলিলাম- খোদা, আমাকে বাঁচাও, আমি তোমার ওলী ছারছীনার হযরত পীর ছাহেব (রঃ) কে একটি টাকা দিব। হুজুর, আমি বাঁচিয়া গিয়াছি; আমার বাঁচার কোনই ভরসা ছিলনা। হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা মনে নাই। প্রায় সহস্রখানেক লোকের মোকাবেলা বাদ মাগরিব এই ঘটিনাটি ঘটিয়াছিল।

· নেছারাবাদ থানাধীন স্বরূপকাঠী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্জ জনাব মতিউর রহমান শিকদার ছাহেব বলেন, এক ব্যক্তি সুন্দরবনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। তখন একটি বাঘ তাকে আক্রমণ করতে আসে। সে নিরুপায় হয়ে চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন- খোদা, ছারছীনার পীর ছাহেবের অসীলায় তুমি আমাকে বাঁচাও। সাথে সাথে সে দেখতে পায় হঠাৎ কোথা থেকে একটি কেতলি এসে বাঘের সামনে ওঠানামা করতেছিল, এ অবস্থা দেখে বাঘটি ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হুজুরের কাছে এসে সেই ব্যক্তি যখন এই ঘটনা ব্যক্ত করছিল তখন হুজুরের নিজের কেতলিটি কাছেই ছিল। হঠাৎ ঐ ব্যক্তি সেটি দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলেছিল - হুজুর, আমি সেদিন এই কেতলিটিই সেখানে দেখেছিলাম। এই ঘটনার সাথে হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর অনুরূপ একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। কোন এক দুর্বৃত্ত একজন মেয়েলোককে একাকী অবস্থায় পেয়ে তাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। মেয়েলোকটি হুজুরের কথা স্মরণ করার সাথে সাথেই দেখতে পেলো একটি বদনা এসে সেই দুর্বৃত্ত লোকটিকে আঘাত করল এবং সাথে সাথে সে প্রাণ ত্যাগ করল। হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) যেখানে বসে ওজু করছিলেন সেখান থেকে ঘটনাস্থল অনেক দূর।

· জনাব নূরে এলাহী ছাহেব হুজুরের একজন বিশিষ্ট মুরীদ। মুরীদ হওয়ার প্রথম পর্যায়ে তিনি অনেক সময় বনে জঙ্গলে কাটাতেন। একদিন একটি জঙ্গলের ভিতর তিনি বসে আছেন- এমন সময় প্রকাণ্ড এক বাঘ সেখানে উপস্থিত হলো। বাঘ যেইমাত্র তার উপর লাফিয়ে পড়বে- সেই মুহূর্তে তিনি বললেন- "আমাকে খেতে চাস? আয়, খেয়ে যা- আমি ছারছীনার পীর ছাহেবের মুরীদ।" তার এই কথা বলার সাথে সাথে বাঘটি লেজ গুটিয়ে উল্টোদিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

· জনাব কছিম উদ্দীন ছাহেব হুজুরের একজন ভক্ত মুরীদ ছিলেন। তাঁর বাড়ি হুজুরের বাড়ির সন্নিকটে- নদীর ওপারে। হযরত পীর ছাহেব কেবলার ইন্তেকালের পর তিনি প্রায় প্রতিদিনই ছারছীনায় আসতেন। প্রতিদিনই এসে এবং যাওয়ার সময় হুজুরের মাজার শরীফ যিয়ারত করতেন। একদিন ভুলবশতঃ যিয়ারত না করেই বাড়ি চলে যাচ্ছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর গলার স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলেন- "ও মিয়া, আমাকে না বলে আজ ফিরে যাও কোথায়?" তিনি অনুতপ্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মাজার শরীফে এসে কান্নাকাটি করেন এবং যিয়ারত করে পরে বাড়ি যান।

· একবার মাহফিলে এক ব্যক্তি হুজুরকে দেয়ার নিয়তে কিছু টাকা সংগে নিয়ে এসেছিলেন। হঠাৎ করে সে টাকা চুরি হয়ে যায়। তিনি তখন কান্নাকাটি শুরু করেন এবং হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেন। একথা হুজুরের কানে গেল। তখন হুজুর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং সকলকে মসজিদে প্রবেশ করার হুকুম দিলেন। সবাই মসজিদে গিয়ে ঢুকল। তখন পীর ছাহেব কেবলা বললেন- এখন আপনারা সবাই বেরিয়ে আসুন। হুজুরের নির্দেশ মত সবাই বের হয়ে আসল, শুধুমাত্র একটি লোক বের হতে পারল না। সে বার বার দরজার কাছে আসে, আবার ভিতরে ফিরে যায়। হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- "বাবা, টাকা তুমি নিয়েছ?" সে উত্তর করল- জী হুজুর, আমি নিয়েছি, আমি মাফ চাই।

· মঠবাড়িয়া এলাকার একজন লোক হুজুরের কাছে এসে দোয়া চাইলেন। পরে তিনি লোকটিকে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে নসীহত করেন এবং বলেন যে, 'তামাক বিড়ি খেয়োনো। হুক্কা, বিড়ি মুখে দিলে তোমার পেটে আগুন জ্বলবে।' সে হুজুরের কথা মত বিড়ি না খাওয়ার ওয়াদা করল। বাড়ি যেয়ে সেই ওয়াদা ভঙ্গ করে পুনরায় তামাক খেতে আরম্ভ করল। সাথে সাথে পেটে অসহ্য ব্যথা আরম্ভ হল; কিছুতেই সে ব্যথা দূর হয়না। তখন সে বাধ্য হয়ে নিজের ত্র"টির জন্য আল াহ্র দরবারে তওবা করল এবং হুজুরের কাছে এল। হুজুর দোয়া করলেন এবং পানি পড়ে দিলেন, তখন সে ভাল হয়ে উঠল।

· একজন লোক হুজুর কেবলার দরবারে পানি পড়াতে নিয়ে আসল। হুজুর কেবলা তাকে দরবারের মুফতী মরহুম আবদুল মজিদ ছাহেবের নিকট যেতে বললেন। নির্দেশক্রমে

সে মুফতী ছাহেবের কাছ থেকে পানি পড়ায়ে আনল। তবে তার মন তৃপ্ত হ'লনা- তাই উক্ত পানি হুজুরের কাছে নিয়ে ফুঁক দেওয়ার আবেদন জানাল। হুজুর পানিতে ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে পানি জমাট বেঁধে আঠাযুক্ত হয়ে গেল। লোকটি তখন বলল- হুজুর এ কি হল? হুজুর বললেন- তা তুমি জান। বাবা, আমার কথা ত তুমি বিশ্বাস করলেনা, তাই এই অবস্থা। যাহোক, লোকটি নতুন পানি এনে হুজুরের নির্দেশ মত পড়িয়ে নিল।

· একজন লোক হুজুরের কাছে এসে দোয়ার আরজ করল। সে দাড়ি কাটত ও মাথায় ঝুটি রাখত। হুজুর বললেন- দোয়া করার আগে তুমি ওয়াদা করবে দাড়ি কাটবে না এবং ঝুটি কেটে ফেলবে। লোকটি ওয়াদা করলে হুজুর কেবলা দোয়া করলেন এবং তার মকসুদ পূর্ণ হল। তবে লোকটি ওয়াদা ভঙ্গ করে পুনরায় আগের মত দাড়ি এবং ঝুটি রাখা শুরু করল। আল াহ্র তরফ থেকে তার উপর বিপদ নেমে এলো। লোকটির চুল ও দাড়ি-মোছ পড়ে যেতে লাগল। বহু টাকা পয়সা খরচ করেও কোন লাভ হ'লনা। পরে তার এক বন্ধু হুজুরের কাছে ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে হুজুরের কাছে এসে মাফ চেয়ে তওবা করল। আল াহ্র ফজলে হুজুরের দো'য়ার বরকতে পুনরায় তার দাড়ি-মোছ, চুল গজাতে লাগল।

· একদিন হুজুর ছফর সাথীদের নিয়ে নৌকায় বিশ্রাম করছিলেন। নৌকাটি নঙ্গর করা ছিল। রাতে একদল ডাকাত নঙ্গর তুলে তাদের সুবিধামত স্থানে নিয়ে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে নৌকায় উঠে এলো। আল াহ্ তাঁর ওলীর জানমাল নিজেই হেফাজত করেন। ডাকাতি করা ত দূরের কথা, তারা ফজর পর্যন্ত জ্ঞানহীন অবস্থায় স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে রইল। ফজরের আজানের পর হুজুর ডাকাতদলকে লক্ষ্য করে বললেন- 'বাবারা, আপনারা নামাজ পড়বেন না?' তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল- 'হুজুর হুকুম দিলে পড়ব।' হুজুর বললেন- 'যান, ওজু করে নামাজ পড়েন।' হুজুরের কথায় তারা যেন শরীরের সজীবতা ফিরে পেলো। তারা ওজু করে হুজুরের সাথে নামাজ আদায় করল। নামাজের পর হুজর তাদেরকে তৌবা করায়ে কিছু জিকির ও শরীয়তের তা'লীম দিয়ে বিদায় দিলেন। কী বিচিত্র! ওলীর হাতে পড়ে ডাকাতের দল সূফীর দলে পরিণত হল।

· সন্তোষপুরেরহযরত মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন (রঃ) মরহুম পীর ছাহেব কেবলার একজন বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। একবার তিনি ছারছীনার হুজুর কেবলার সাথে মাগরিবের নামাজের পর জিকিরের মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাঁকে ডেকে বললেন- তোমার কাপড় চোপড় নিয়ে আস। কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে মুছলেহ উদ্দীন ছাহেব হুজুর কেবলার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর পিছনে পিছনে হাটতে লাগলেন। হুজুর কেবলা নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে একটি মাঝিকে ডাকলেন। মাঝি এলে তিনি মুছলেহ উদ্দীন ছাহেবকে বললেন- নৌকায় উঠ। কোন কথা না বলে মাওলানা ছাহেব নৌকায় উঠলেন। অতঃপর হুজুর কেবলা মাঝিকে বললেন- ঐ যে একটি আলো দেখা যায়, মাওলানা সাহেবকে সেখানে নামিয়ে দিবে। আনুমানিক এক ঘন্টা নৌকা চালানোর পর মাঝি মরহুম মুছলেহ উদ্দীন ছাহেবকে বলল- এসে গেছি, নামেন। তিনি নেমে হাটতে লাগলেন। তাঁর কাছে মনে হলো- আশে পাশের গাছপালা বাড়িঘর সব তাঁর চেনা চেনা। তিনি বাড়ি পৌঁছে গেছেন। আর দেখলেন হুজুর কেবলা যে আলোর দিকে ঈঙ্গিত করেছিলেন সেটি তাঁদের বাহির বাড়ির দহলিজের আলো। তিনি তখন অবাক হয়ে চিন্তা করলেন- ছারছীনা থেকে তার বাড়ি নৌকায় দুই দিনের পথ, অথচ কিভাবে এক ঘন্টায় পৌঁছে গেলেন! যাই হোক- বাড়ির ভিতরে যেয়ে দেখতে পেলেন- তাঁর মা বিশেষভাবে অসুস্থ। তাঁকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন- বাবা মুছলেহ উদ্দীন তুমি এসেছ। আজ আছরের পর তোমাকে দেখার জন্য আল াহ্র কাছে দোয়া করেছি। তিনি তখন বুঝতে পেলেন গোটা ঘটনাটিই আল াহ্ পাক হুজুর কেবলার মাধ্যমে ঘটিয়েছেন।

· একবার হযরত মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন (রঃ) ছারছীনায় ছিলেন। বাড়ি থেকে বড় ভাই-এর চিঠি পেলেন- 'নদীর পাড় ভেঙ্গে বাড়ির কাছে এসে পড়েছে, বাবাজানের কবর ভেঙ্গে যেতে পারে, তাই শেষবারের মত কবরটি দেখতে চাইলে এসো।' হুজুর কেবলার কাছে এই কথা

ব্যক্ত করলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, পরে তিনি বললেন- এজন্য বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন নেই- তোমার বাবাজানের কবর ভাঙ্গবেনা, খিজির (আঃ) আমায় বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে নদীর পাড় আর ভাঙ্গেনি এবং কবরটিও নষ্ট হয়নি।

- হযরত মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন (রঃ)-এর আর একটি ঘটনা। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তখন ইন্তেকাল করেছেন। একদিন মাওলানা ছাহেব কোন মাহফিলে যাচ্ছিলেন। পথে নামাজের জন্য একটি মসজিদে প্রবেশ করলেন। প্রথম কাতারে জায়নামাজ বিছানোর সাথে সাথে তিনি আবার সেটি গুটিয়ে নিলেন। এবং ইমাম ছাহেব সহ সকলকে মসজিদের পশ্চিম দিকের অর্ধেক খালি রেখে নামাজ পড়তে বললেন। তাঁর কথা সবাই মেনে নিল। নামাজ শেষে সবাই তাঁকে সামনের জায়গা ছেড়ে দেয়ার কারণ জিজ্ঞাস করল। তখন তিনি বললেন- এই মসজিদের জমি যারা ওয়াক্ফ্ করে দিয়েছে তাদেরকে ডাকুন। তাঁরা এলে মাওলানা ছাহেব জিজ্ঞাস করলেন মসজিদের এই জমি সত্যি সত্যি তাদের কিনা এবং সেটি তারা ওয়াক্ফ্ করেছে কিনা। তারা তখন জানাল- এই জমি তাদের বাব-চাচার ছিল- পূর্বের অংশ বাবার এবং পশ্চিমের অংশ চাচার। বাবার অংশ ওয়াক্ফ্ করা হয়েছে, কিন্তু চাচা তার অংশ ওয়াক্ফ্ করবে করবে বলেও করেননি এবং ওয়াকফ না করেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তখন মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন (রঃ)-কে সবাই জিজ্ঞাসা করল- মসজিদের সেই অংশ ওয়াক্ফ্ করা হয় নাই সেটি আপনি কিভাবে আঁচ করলেন? তিনি তখন বললেন- আমি যেইমাত্র জায়নামাজ রেখেছি তখনই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম- মুছলেহ উদ্দীন, মসজিদের এই পশ্চিমদিকের অংশটুকু ওয়াক্ফ্ করা সম্পত্তি নয়। এখানে নামাজ পড়না- পূর্ব দিকের অংশে গিয়ে নামাজ পড়।

- একবার মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সমুদ্রে জাহাজে ছিলেন, হঠাৎ করে ঝড় শুরু হলে জাহাজটি দুলতে লাগল। জাহাজে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এমনি সময় দেখা গেল হুজুর কেবলা যে কামরায় ছিলেন সেটির জানালা দিয়ে সমুদ্রে থেকে একজন লোক উঠে এলেন এবং কিছু কথা বলে সেখান দিয়েই নেমে গেলেন। পরে জানা গিয়েছিল উক্ত লোকটি ছিলেন হযরত খিজির (আঃ)। ঝড়ে জাহাজের কোন ক্ষতি হবেনা সেটি হুজুর কেবলাকে জানানোর জন্যই তিনি সমুদ্রে থেকে উঠে এসেছিলেন।

- একবার মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পালকিতে চড়ে ছফরে যাচ্ছিলেন। পথে একস্থানে লোকজন তাঁকে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করল। জানা গেল উক্ত এলাকায় কলেরায় বহু লোক মারা যাচ্ছে। দোয়া করতে গিয়ে হঠাৎ হুজুর কেবলা বলে উঠলেন- "মিয়ারা, দোয়াতো কবুল হয়না। নিশ্চয়ই এই এলাকায় কোন বড় পাপের কাজ সংঘটিত হইতেছে।" একথা শুনে সবাই খোঁজ খবর নেয়ার পর জানা গেল, ঐ এলাকায় একজনের বাড়িতে কলের গান করা হয়। হুজুর কেবলা তাকে ডেকে এনে সবাইকে তওবা পড়ালেন। মনে হলো শোঁ শোঁ শব্দ করে কি যেন ঐ এলাকা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। পরে তিনি রওনা হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি পালকি থামাতে বললেন। পরে তিনি একটি গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন- এখনও তুমি যাওনি? এই কথা বলে এলাকার লোকজনকে কলের গানের যন্ত্রটি তাঁর কাছে আনার হুকুম দিলেন। যন্ত্রটি আনার পর সেটি ভেঙ্গে ফেলা হলো। সাথে সাথে গাছটিতে বিরাট শব্দ করে কি যেন বেরিয়ে গেল। অতঃপর হুজুর কেবলা রওনা দিলেন। এরপর ঐ এলাকায় কলেরার আর কোন প্রাদুর্ভাব ছিলনা।

কাশ্ফঃ

হযরত পীর ছাহেব কেবলা যে পর্যায়ের ওলী ছিলেন, তার পক্ষে কাশ্ফ ও এলহাম হওয়া বিচিত্র কিছুই নয়। তবে তিনি নিজেকে খুব গোপন রাখতেন বলে সাধারণের পক্ষে তাঁর কাশ্ফের হালত অবগত হওয়া সম্ভব ছিলনা। তবুও মাঝে মাঝে কিছু কিছু হালত তাঁর অনিচ্ছা সত্তে¡ও প্রকাশ হয়ে পড়ত। উৎসাহী পাঠকের জন্য তারই কয়েকটি ঘটনা উলে-খ করছিঃ

হযরত পীর ছাহেব কেবলার ভক্তদের অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে যে তাদের মনে হয়ত কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য রয়েছে, অথচ হুজুরকে বলার সাহস পাননি- এমন অবস্থায় হুজুরের কাছে গেলে তিনি কথা প্রসঙ্গে বা ওয়াজের মধ্যে উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করে দিতেন। হুজুরকে মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন হতনা।

- হযরত মাওলানা ওয়ালী উল াহ ছাহেব (পীর ছাহেব, মৌকরা) বলেনঃ "একবার আমি দরবারে বসিয়া চিন্তা করিতেছি যে এত চেষ্টা, এত জিকির, এত জিহাদ করি কিন্তু দিলটাত পরিষ্কার হয়না। হঠাৎ পীর ছাহেব কেবলা নিজের একটি জামা মোবারক (যার মধ্যে দাগ ছিল) সাবান সহ আমার হাতে দিয়া বলিলেন- যাও, এই দাগটা তোমাকে এখনই উঠাইয়া আনিতে হইবে। তখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, হুজুরের নিকট আমার মনের অবস্থা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আমি পুকুরের ঘাটে যাইয়া শত চেষ্টা করিয়াও দাগ উঠাইতে পারিলাম না। দরবারে যখন আসিলাম হুজুর কেবলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন- কি বাবা, দাগ উঠাইতে পারিলে না? পরোক্ষভাবে বুঝাইয়া দিলেন গুনাহ করার দরুন দিল যেভাবে শক্ত হইয়া গিয়াছে, উহা ঠিক করিতে সময়ের দরকার।"

- হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান ছাহেব (কায়েদ ছাহেব হুজুর) বলেনঃ "ফুরফুরা ও ছারছীনার ছেলছেলার বুজুর্গানে দ্বীন সাধারণতঃ মামুলী লেবাছ পরিধান করেন, পক্ষান্তরে জৌনপুরী ছেলছেলার বুজুর্গানে দ্বীন শান শওকতের লেবাছ পরিধান করেন। যেহেতু আমি নিজেও মামুলী লেবাছ পড়িয়া থাকি- সেজন্য জৌনপুরী ছেলছেলার বুজুর্গানে দ্বীনের লেবাছ সম্পর্কে আমি মনে মনে একটু খারাপ ধারণা পোষণ করিতাম। এই বিষয় আমি পীর ছাহেবের খেদমতে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ঠিক করিলাম কিন্তু কোনরূপ বেয়াদবী হয় কিনা এই সম্ভাবনায় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। হঠাৎ একদিন পীর ছাহেব কেবলা নসীহত প্রসঙ্গে ফরমাইলেন- কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে, ছেড়া-ফাড়া লেবাছ পরিধান করার মধ্যেই ফকিরী সীমাবদ্ধ, আর শান শওকতের লেবাছ পরিধান করা বুজুর্গীর খেলাপ। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কোনটাই বুজুর্গীর আলামত নহে। যদি কেহ ফকিরী জাহির করার উদ্দেশ্যে ছেড়া-ফাড়া কাপড় পরিধান করে, তবে ইহাতে কোনই ছওয়াব হইবে না বরং গুনাহ হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ ইসলামের ও এলেমের শান জাহের করার উদ্দেশ্যে শান শওকতের লেবাছ পরিধান করে, তবে ইহাতে কোনরূপ গুনাহ না হইয়া নেকী হইবে। মোটকথা নিয়ত অনুযায়ী মামুলী লেবাছ ও শান শওকতের লেবাছ উভয় দ্বারাই ছওয়াব হাছিল হইতে পারে। অবশ্য সকল অবস্থায়ই খেয়াল রাখতে হইবে যেন কাজটি শরীয়তের গণ্ডীর বাহিরে না যায়।"

- ছারছীনা মাদরাসার মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবদুল লতীফ ছাহেবের মনে আরও অনেকের মত একটি বিশেষ প্রশ্নের উদ্রেক হলঃ হযরত পীর ছাহেব কেবলার বড় ছাহেবজাদাকে 'শাহ ছাহেব' বলে কেন ডাকা হয় এবং হুজুর নিজেই বা কেন তাকে 'শাহ ছাহেব' বলে ডাকেন? এ সম্বন্ধে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করার নিয়তে তিনি দরবারে গিয়ে বসলেন, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে হযরত পীর ছাহেব কেবলা নিজেই এরশাদ করলেন- 'ফুরফুরা শরীফের আমার পীর মরহুম একবার ছারছীনা আসিয়াছিলেন। তখন মুহাম্মাদ ছালেহ খুব ছোট। পীর ছাহেব কেবলা মুহাম্মাদ ছালেহকে গলায় তসবীহ পড়িয়া আমাদেরকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন- আমি তাহাকে 'শাহ ছাহেব' খেতাব দিলাম। আপনারা সকলে তাহাকে 'শাহ ছাহেব' বলিয়া ডাকিবেন। হুজুর কেবলার আদেশ রক্ষার নিয়তে আমরা সেই হইতে মুহাম্মাদ ছালেহকে 'শাহ ছাহেব' বলিয়া ডাকিয়া থাকি।' যাহোক প্রশ্ন করার পূর্বেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে মুহাদ্দিস ছাহেব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন।

- ফরিদপুরের মরহুম মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেব বলেছিলেন- একবার আমি বাড়ি হতে নিয়ত করলাম যে, হুজুরের দরবারে যেয়ে এমন একটি কাজ করতে চাই যেটি আমার মন (নফস) চায়না। ছারছীনায় গিয়ে দেখতে পেলাম হুজুর কেবলা কিছু লোককে নসীহত করছেন। আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর হুজুর কেবলা আমায় বললেন- বাবা, এই

প্রাঙ্গনটি ঝাড়– দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন কি? আমি উত্তর দিলাম, "জী হুজুর, পারি।" এই বলে কাজ শুরু করলাম।

· উক্ত মাওলানা ছাহেব আরও বলেনঃ আমি একদিন বসে বসে ভাবলাম- বাড়িতে কিছু বাগ-বাগিচা করব। পরক্ষণেই মনে হল বাগ-বাগিচা করা দুনিয়ার শামিল কি-না। ভাবলাম, বিষয়টি হুজুরের কাছে জিজ্ঞাসা করব। একদিন এশার নামাজের পর হুজুরের খেদমতে ছিলাম এবং মনে মনে উক্ত কথা হুজুরকে বলব বলে চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ হুজুর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন- বাবা, বাড়িতে নারিকেল- সুপারির বাগ-বাগিচা করুন।

· একজন লোক পীর ছাহেব কেবলার কাছে মুরীদ হওয়ার পর হুজুরের বাড়িতে দালান কোঠা দেখে তার মনে পীর ছাহেব কেবলা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন, পীর ছাহেব দুনিয়াদার পীর। ঠিক সেই দিনই জোহরের বাদ পীর ছাহেব কেবলা সকলকে বসতে বলে ওয়াজ শুরু করলেন। উক্ত ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিল। নসীহত প্রসঙ্গে হুজুর কেবলা নিæের একটি কেচ্ছা বর্ণনা করলেনঃ

একদেশে এক ধনী ওলী আল াহ ছিলেন এবং নিকটেই একজন গরীব দরবেশ বাস করতেন। গরীব দরবেশের মনে উক্ত ধনী ওলী সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলো। যাহা হোক, একদিন গরীব দরবেশ উক্ত ধনী লোকের বাড়িতে মেহমান হলেন এবং একত্রে নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর গরীব দরবেশ ধনী ব্যক্তিকে বললেন- ভাই আমি এবার হজ্জে যাওয়ার এরাদা করেছি। তদুত্তরে ধনী দরবেশ বললেন, আচ্ছা ভাই চলুন আমিও যাই। এখনই রওনা হই। উভয়ে রওনা হলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই গরীব দরবেশ বললেন, ভাই- আপনার মসজিদে আমার বদনাটি ফেলে এসেছি, একটু অপেক্ষা করুন, আমি সেটি নিয়ে আসি। শুনে ধনী দরবেশ বললেন- ভাই আপনিতো আমাকে দুনিয়াদার মনে করছেন, অথচ আমি আমার ধন দৌলত, দালানকোঠা, স্ত্রী-পুত্র সবকিছু পরিত্যাগ করে চলে এসেছি, এমনকি বাড়ির মধ্যে পর্যন্ত যাই নাই। আর আপনি সামান্য একটি বদনার মহব্বত ত্যাগ করতে পারলেন না। এখন আপনিই বিচার করুন- প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়াদার কে? আপনি? না আমি? গরীব দরবেশ তার ভুল বুঝতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে তওবা করল। যাহোক, এই কেচ্ছা বলার সাথে সাথে হুজুরের নতুন মুরীদের মন থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

· হযরত পীর ছাহেব কেবলার দরবারে কে কোন্ নিয়তে আসত তিনি অনেক সময় বুঝতে পারতেন। হুজুরের কাছে থেকে বিদেশী মেহমান যারা তরীকা শিক্ষার জন্য আসতেন তাদের জন্য তিনি এন্তেজাম করতেন। তাদের খানা পাক হওয়ার পর বাবুর্চি 'খানেওয়ালা হাজির হউন' বলে ডাক দিতেন। হুজুর কেবলা প্রায়ই সেদিকে নজর রাখতেন। মাঝে মাঝে তিনি কতক লোককে ডেকে বলতেন- 'বাবারা, কি জন্য এসেছেন?' কেউ বলত মামলায় পড়ে এসেছি, আবার কেউ বলত বিপদে পড়ে এসেছি- ইত্যাদি। হুজুর তখন বলতেন- 'এই খানা শুধু তাদের জন্য, যারা আল াহ রাসূলের মহব্বত অর্জনে তরীকা শিক্ষার জন্য এসেছে। আপনারা হোটেলে গিয়া খান। পয়সা না থাকলে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান- কিন্তু আমার নিয়তের বিপরীত করবেন না- আপনাদের ক্ষতি হবে।' তাঁর কাশ্ফ এত বেশি ছিল যে, যারা দুনিয়ার খেয়ালে আসত তাদেরকে তিনি অতি সহজেই চিনতে পেরে আলাদা করে ফেলতেন।

· মরহুম পীর ছাহেবের সময়ের তুলনায় ছারছীনা দরবারের পরিসর বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দালান কোঠা, জায়গা-জমি, বিভিন্ন পরিকল্প ইত্যাদি খেয়াল করলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়- কি ছিল, কি হয়েছে! আল্লাহর রহমতে এর বি তৃতি দিন দিন অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। কিন্তু এমনটি যে হবে, তা আহলে-কাশ্ফ ওলী হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহঃ) অন্তরচোখে নিশ্চয়ই তার একটি প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই একদিন দরবার শরীফে দাঁড়িয়ে অনেকটা নিজে নিজেই উক্তি করেছিলেন- "এখানে আর কত কী যে হবে!" আজ ছারছীনা দরবারের দিকে

তাকালে বুঝা যায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এই উক্তিটি তাঁর উচ্চ পর্যায়ের কাশ্‌ফ হওয়ার কিরূপ সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে।

আগেই বলা হয়েছে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবন কাশ্‌ফ-কারামতে ভরা। সবগুলো উলে-খ করা একদিকে যেমন এ পুস্তকে সম্ভব নয়, অন্যদিকে এর প্রয়োজনও নেই। তিনি আমাদের জন্য যে জীবনাদর্শ রেখে গেছেন সেটি সঠিকভাবে পরিবেশন করাই হল এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য। মনে রাখতে হবে, তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ আমাদের আদর্শ, কাশ্‌ফ-কারামত আমাদের আদর্শ নয়। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজেই বলেছেন, কাশ্‌ফ-কারামত না হওয়া একটি তরীকা, কারণ এতে অনেকের মনে গর্ব আসে, যেটি আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়াতেই বিঘœ ঘটায়, তরীকার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। তাই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কাশ্‌ফ-কারামত আমাদেরকে কাশ্‌ফ-কারামতের দিকে ধাবিত করুক, এটি আমাদের অভিলাষ নয়, বরং সেগুলো আমাদের অন্তরে বিরাজমান হুজুর কেবলার আদর্শ ব্যক্তিত্বের ছবিটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলুক, তাঁর জীবন দর্শনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিক- যাতে করে তাঁর জীবনাদর্শকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করে আমরা সার্থক জীবন গড়ে তুলতে পারি - এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে মহান আল াহ্র দরবারে এই হোক আমাদের আন্তরিক মুনাজাত।

হুজুর কেবলার কামালিয়াত

মরহুম হুজুরের কাশফ-কারামত অধ্যায়ে উলে-খ করা হয়েছিল যে যদিও ওলীদের কাশফ-কারামত সত্য এবং এগুলো তাঁদের কামালিয়াতের চিহ্ন কিন্তু এসব সংঘটিত হওয়া কামালিয়াতের শর্ত নহে। প্রকৃত পক্ষে জীবনের সকল কাজে যে যত বেশি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর অনুকরণ করে সে ততবেশী কামেল। এটিই কামালিয়াতের প্রকৃত মাপকাঠি। মরহুম হুজুরের জীবন চরিত পাঠ করে পাঠকগণই বিচার করবেন তিনি কতটুকু কামেল ছিলেন। তবুও উৎসাহী পাঠকদের জন্য এ অধ্যায়ে গুটিকতক ঘটনা বর্ণিত হল, যেগুলো তাঁর কামালিয়াতের স্বাক্ষর বহন করে।

প্রথমেই নোয়াখালীর জনাব ক্বারী শামছুল হক ছাহেবের একটি স্বপ্নের ঘটনা তার নিজস্ব লেখা থেকে তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন- বাংলা ১৩৩৫ বা ১৩৩৬ সালের কথা- আমি বিক্রমপুর এক মসজিদে ইমামতি করি, ছেলেপেলে পড়াই। রমজান মাসের ২৭ শে শবে কদর রাত্রে নামাজ পড়ে বাড়ি এসেছি। হঠাৎ আমার মনে আক্ষেপ হলো- রাসূল (দঃ)-এর পথ কি ভাবে পাব? ঐ সময় ফুরফুরার পীর ছাহেব (রঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ), মাওলানা রূহুল আমীন ছাহেব (রঃ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রা আসে- এমতাবস্থায় আমি স্বপ্নে হযরত নবী করীম (দঃ) কে দেখিতে পাই। তিনি বলেন ‘বাবা, তুমি আল াহ্ এবং আমার পথ খুঁজিতেছ? তুমি কি জান না এ জমানার মুজাদ্দিদ ও কুতুবুল আলম হলেন ছারছীনার মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ? উম্মতে মুহাম্মদির কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য তাকে এবং তার বড় ছেলে মাওলানা আবু জা’ফর মোহাম্মদ ছালেহ কে অর্পণ করা হয়েছে। তুমি তাদের খেদমতে যাও, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে’। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়ি। কি করা যায় তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হইল নিকটবর্তী গ্রামে ফুরফুরার পীর ছাহেব (রঃ)-এর আহলে কাশ্‌ফ ওয়ালা একজন খলিফা আছেন। পরদিন ফজর নামাজের পর আমি তাঁর খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলেন- ‘বাবা কারী ছাহেব আসিয়াছেন? আপনার ত খোশ খবর আছে, ভিতরে আসুন’। আমি ভিতরে গেলে তিনি বলেন, ‘হুজুর পাক (দঃ) আপনাকে স্বপ্নে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। ছারছীনার পীর ছাহেব এ জমানার মুজাদ্দিদ- হাদীয়ে যমান। তাঁর খেদমতে গেলে আপনার মনের আশা পূর্ণ হইবে’।

মালাবার নিবাসী সৈয়দ আব্দুল মজিদ ছাহেব হুজুরের মুরীদ ছিলেন। তিনি দেশে বসেই চিন্তা করতেন আল াহ্ রাসূলের পথ- তথা ছিরাতুল মুস্তাকিমের পথ পাওয়ার সহজ পথ কি হবে? একদিন তিনি হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখলেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাকে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন- তিনিই হলেন বর্তমান জমানায় ছিরাতুল মুস্তাকিমের পথ পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অসীলা। জানা যায় স্বপ্নে জনাব মজিদ ছাহেবকে লাইট ফোকাস করে মালাবার থেকে ছারছীনার পথ পর্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশিত পথেই তিনি ছারছীনায় আসেন। কিছুদিন তিনি হুজুর কেবলার সাথে অবস্থান করে তরীকার তা'লীম নেন। পরে তিনি বর্ণনা করেছেন আমি তিন মাস ছারছীনায় ছিলাম, এই সময়ের মধ্যেই আমার ত্রিশ বার হযরত নবী করীম (দঃ) এর সাথে যিয়ারত নসীব হয়।

নোয়াখালীর জনাব কারী শামছুল হক ছাহেবের লেখা থেকে আরও একটি ঘটনার উলে-খ করছি- বিক্রমপুরে ইমাম উদ্দিন চাষী নামে এক ব্যক্তি একসময় ডাকাতের সর্দার ছিলেন। হঠাৎ করে তার য²া বিমার হওয়ায় তিনি ডাকাতি পেশা ছেড়ে দিলেন। অনুতপ্ত হয়ে অতীতের কৃত কাজের জন্য আল াহ্র কাছে সব সময় কান্নাকাটি করতেন। তিনি রীতিমত দরুদ শরীফ আমল করা শুরু করলেন। একবার তিনি কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। তখন একদিন স্বপ্নে তিনি হযরত নবী করীম (দঃ)-এর দর্শন পান। হুজুর (দঃ) তাকে বললেন- 'ছারছীনার পীর ছাহেব কুতুবুজ্জামান- কামেল ব্যক্তি- তিনি বর্তমানে চাঁদনীচকের (ম্যাডার্ন স্ট্রীট) মসজিদে অবস্থান করছেন। তুমি তার কাছে গিয়ে দোয়া চাও- তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে'। পরদিন ইমাম উদ্দিন ছাহেব উক্ত চাঁদনীর মসজিদে গেলেন এবং হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে দেখতে পেলেন। তিনি হুজুরকে দেখা মাত্রই দৌড়িয়ে গিয়ে তাঁর পা মোবারক জড়িয়ে ধরেন এবং সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে এলে হুজুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- বাবা, তোমার কি হয়েছে? আমাকে দেখে অজ্ঞান হলে কেন? তিনি সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। অতঃপর অজ্ঞান হওয়ার কারণ বলেন- হুজুর, গত রাত্রে আমি হুজুরে পোর নূর (দঃ) কে যে ছূরত এবং যে পোষাকে দেখতে পেয়েছিলাম, আপনাকে আজ হুবহু ঠিক সেই একই ছূরত এবং একই পোষাকে দেখতে পেয়েছি। এতে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নাই- তাই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। হুজুর কেবলা তখন তার জন্য দোয়া করলেন।

শায়খুল হাদীস আল্লামা নিয়াজ মাখদুম আল খোতানী (রঃ) ছিলেন বাংলা-পাকভারত উপমহাদেশে এক যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ। তিনি চীনা তুর্কীস্থানে এক বিখ্যাত শায়খ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানকার মাদরাসায় তিনি দ্বীনী ইলম শিক্ষালাভ করেন। ঐ সময় কমিউনিজমের আগ্রাসন থেকে ইসলাম ও মাতৃভ‚মি রক্ষার জন্য তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। মুসলমানদের মাঝে অনৈক্যের কারণে কমিউনিজমের বিপ্লব সফল হয়। জিহাদের ময়দান থেকে চিরদিনের জন্য দেশ, আত্মীয়স্বজন সকল কিছুর মায়া পরিত্যাগ করে বহুকষ্টে ভারতে হিজরত করেন। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেটি বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর নিজের জবানীতে বলা কিছু কথা তুলে ধরে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফিরে আসতে চাইঃ ".....গুলি ছুড়ছে কমিউনিষ্ট সৈন্যরা আমাকে নিশানা করে। আমি ঘোড়া ছুটালাম যত দ্রুত বেগে সম্ভব। এ ভাবে বিরামহীন দুদিন ছুটে অবশেষে তিব্বতের নিকট একটি নদীর তীরে পৌঁছলাম। নদী কিভাবে পার হব তাই ভাবনায় পড়ে গেলাম। ওদিকে দুদিনের ক্লান্তি। ঘোড়া থেকে নেমে একটু বিশ্রাম নিতে নদীর তীরে বসলাম। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম- একজন দীর্ঘকায় দাড়ি পাকা বৃদ্ধ, সাদা পাগড়ী ও জুব্বা পরিহিত নূরানী চেহারার এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে বলছেন 'নদী পার হয়ে ভারতে আস, তোমার কোন ভয় নাই'। আমি জাগ্রত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। এ কার নির্দেশ? কাকে দেখলাম স্বপ্নে তন্দ্রামগ্ন হয়ে? নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন ওলী হবেন স্বপ্নে দেখা মানুষটি। তাঁর এ নির্দেশ মান্য করা উচিত। দেরী করা সংগত নয় মোটেই। এভাবে ভাবতে ভাবতে নদী পার হওয়ার ভয় আমার অন্তর থেকে দূরীভ‚ত হয়ে গেল। আমি ঝাঁপ দিলাম নদী বক্ষে। মুহূর্তে সাঁতরিয়ে পার

হলাম নদী। এরপর হিমালয়ের দুর্গম পথ পার হয়ে দেওবন্দে পৌঁছলাম। সেখানে আল-কুরআন, আল-হাদীস ও ইলমে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ শেষ করে ১৯৪৫ সনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছারছীনা শরীফের পীর ওলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন (রহঃ)-এর আহবানে তথায় ইলমে হাদীসের দরস দান করতে আগমন করলাম। ছারছীনা শরীফের পীর, মাদরাসা ও দরবারের সকলে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ছারছীনায় এসে আমি যখন প্রথম মরহুম পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন (রহঃ) কে দেখলাম তখন আমি বিস্ময়াভিভ‚ত হলাম। কি আশ্চর্য! আমি তো এই ব্যক্তিকেই নদীর তীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনিই তো আমাকে বলেছিলেন, 'নদী পার হয়ে ভারতে আস, তোমার কোন ভয় নাই'। আমার কানে আজও আমি সেই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে পড়ে গেল নদীর তীরের সকল স্মৃতি। আমি মরহুম পীর নেছারুদ্দীন (রহঃ)-এর মর্যাদা ও উচ্চাসন আঁচ করতে পারলাম"।

একবার হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ফুরফুরা শরীফ গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে মুজাদ্দিদে যমান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) ব্যস্তত্রস্ত্র হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। একজন মুরীদকে এইভাবে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে আনাটা অনেকের মনেই খটকার উদ্রেক করল। মুজাদ্দিদে যমান এটি জানতে পেরে বললেন- বাবারা, আমি নেছারুদ্দীনকে অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে যাইনি- আমি দেখতে পেলাম বাবা নেছারুদ্দীনের সামনে স্বয়ং হযরত নবীয়ে পাক (দঃ) হেঁটে হেঁটে দরবার শরীফে ঢুকছেন। হুজুর (দঃ) কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যই আমি সেইভাবে এগিয়ে গিয়েছিলাম। সুবহানাল াহ!

বার্মার জনৈক ব্যক্তি মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর একজন খাদেম ছিলেন। একবার মদীনা শরীফ থেকে বার্মা যাওয়ার পথে তিনি বাংলাদেশ আসেন। সেই সময় ছারছীনায় মাহফিল চলছিল। একথা জানতে পেরে তিনি মাহফিলে শরীক হওয়ার জন্য ছারছীনায় এলেন। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সাথে তার কোন পরিচয় ছিলনা। তিনি ইতিপূর্বে কখনও বাংলাদেশে আসেননি। যাই হোক, ছারছীনায় এসে হুজুর কেবলার সাথে দেখা করতে গেলেন। দেখার সাথে সাথে মনে হলো তার মাঝে কেমন যেন এক বিচলিত ভাব। তিনি বললেন এই মাহফিলে সকলের সামনে আমাকে একটু কথা বলতে দিন। হুজুর কেবলার অনুমতি নিয়ে তিনি কথা বলতে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই বললেন- এই যে শায়েখ, তাঁর সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। তবে আজ দেখা মাত্রই আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। এই চেহারা আমার কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। আমি বহু বছর যাবৎ মদীনার মসজিদের খাদেম। আমি আপনাদের কাছে কছম করে বলছি- ইনি সেই ব্যক্তি যাকে প্রতি বৃহস্পতিবার এশার নামাজের পর আমি মদীনার সেই মসজিদে বসে থাকতে দেখি। সুবহানাল্লাহ !

ফজলে নাঈম মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, বাড়ি পেশোয়ার। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক নদীতে বহু লোক গোসল করছে, এমতাবস্থায় একটি তক্তার উপর বসে হাওয়ায় ভর করে হযরত রাসূল পাক (দঃ) এসেছেন এবং ছারছীনার পীর ছাহেব কেবলা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এই স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (দঃ) পীর ছাহেব কেবলার নিকট তাকে মুরীদ হতে ইশারা করায় তিনি টাকা পয়সা খরচ করে হুজুরের দরবারে এসে তাওয়াজ্জুহ লাভ করেন।

বরিশাল জেলার বাউফল থানার বীরপাশা নিবাসী জনাব মৌলভী সূফী আবু ছালেহ নূর মোহাম্মদ ছাহেব (ছারছীনা মাদরাসার বাংলা মাস্টার) বলেনঃ আমি একবার হুজুর কেবলার বাড়ির মসজিদে হুজুরের সঙ্গে মোরাকাবায় বসেছিলাম। মোরাকাবার হালতে ফানাফির রাসূলের ছবক মশ্‌ক করছিলাম। সেদিন হুজুরের তরফ হতে অসহ্য ফায়েজ অনুভব হচ্ছিল- মোরাকাবার হালতে আমার ছায়ের হচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে ঊর্ধজগতে ছায়ের হতে থাকে। আরশে মোয়াল ার সম্মুখভাগের উপরে অতি উজ্জ্বল আরবী হরফে 'লা ইলাহা ইল াল াহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)' লেখা দেখতে পেলাম। আরশে মোয়াল াহ হতে একটি নূরের রজ্জু পৃথিবী পর্যন্ত লম্বিত দেখা গেল। এই রজ্জুর মধ্য বরাবর হযরত নবী করীম (দঃ) ধরে

বসেছিলেন এবং নিম্নের শেষ প্রান্তে ছারছীনার হযরত পীর ছাহেব কেবলাকে দু'হাতে ধরে বসে থাকতে দেখতে পেলাম।

একবার ইছালে ছওয়াব মাহফিলের পর পীর ছাহেব কেবলার একজন মুরীদ স্টীমারে উঠলেন। স্টীমারের যাত্রীদের মধ্যে হুজুর কেবলা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। একজন উচ্চশিক্ষিত কর্মচারী বললেন, আমার একটি ঘটনা শুনুন। আমি একদিন কোথায় মুরীদ হবো এই ধারণা করে রাত্রে এস্তেখারার নিয়াতে শুয়ে রইলাম। তখন স্বপ্নযোগে দেখলাম যে, হযরত খিজির (আঃ) এসে আমাকে বলছেন, বর্তমান যমানায় ছারছীনার পীর ছাহেব একজন বিশ্ববিখ্যাত পীর।

পূর্বের ত্রিপুরা জেলার মাওলানা আবদুল জব্বার ছাহেব বলেন যে, হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) আমাকে স্বপ্নযোগে বলেন যে, তুমি ছারছীনার পীর ছাহেবের নিকট মুরীদ হও। তিনি বর্তমানে যমানার শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল এবং একজন মুজাদ্দীদের কাজ করছেন।

কামরূপের শাহ সুলতান গিয়াস উদ্দিনের দরবারের খাদেম মৌলবী কেরামত আলী ছাহেব বলেনঃ তিনি বর্তমান যমানার সর্বশ্রেষ্ঠ ওলীর খোঁজে আজমীর শরীফ চলে যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর স্বপ্নযোগে দেখেন যে, হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) তাকে বলছেন- তুমি ছারছীনা চলে যাও, তুমি যেই তবকার ওলী তালাশ করছ, বর্তমান যমানায় সেই তবকার ওলী ছারছীনার পীর ছাহেব।

নোয়াখালীর জনৈক আলেম অভাব অনটনে বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একদিন রাত্রে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর খেদমতে নিজের অভাব অভিযোগ পেশ করেন। হুজুর (দঃ) বলেন "ছারছীনার নেছারুদ্দীন আহমদ নামে আমার এক প্রিয় সন্তান আছে- তুমি তার কাছে তোমার কথা জানাও- তিনি তোমাকে মদদ করবেন"। উক্ত মাওলানা ছাহেব পত্রযোগে খাবের বিবরণ মরহুম হুজুরকে জানালে তিনি অতি সত্তর পাঁচশত টাকা তার নামে পাঠিয়ে দেন।

জনৈক মাওলানা ছাহেব হুজুরের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে মনে নিজেকে হুজুরের সমপর্যায়ের বলে ধারণা করতেন। উক্ত মাওলানা ছাহেব একদিন স্বপ্নে দেখতে পান- তিনি মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সাথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। সেখান থেকে একটি সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখতে পেলেন ঐ সিঁড়ি বেয়ে স্বয়ং হুজুরে পাক (দঃ) তাদের দিকে নেমে আসছেন। কাছে এসে মাওলানা ছাহেবকে কোন কিছু না বলে মরহুম পীর ছাহেবকে কোলে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। এতে মাওলানা ছাহেব নিজের ভুল বুঝতে পেলেন এবং হযরত নবী করীম (দঃ)-এর কাছে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার উচ্চ মরতবা উপলব্ধি করলেন।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে দাফন করার পর হুজুরের জনৈক ভক্ত মুরীদ মোরাকাবায় বসে দেখতে পেলেন দুজন অল্প বয়সী সুদর্শন ফেরেশতা ছওয়াল-জওয়াবের জন্য তাঁর কবরে এসে হাজির হয়েছেন। সাথে সাথে হযরত নবী করীম (দঃ) এসে হাজির। ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন- হিসাব নিকাশের প্রয়োজন নেই- নেছারুদ্দিন আমার আওলাদের মধ্যে গণ্য।

মরহুম পীর ছাহেবের খলিফা সূফী ফজলুর রহমান ছাহেব বলেন যে- তিনি একদিন মোরাকাবা অবস্থায় দেখতে পেলেন নবী করীম (দঃ) তাশরীফ এনেছেন। হুজুর (দঃ) তাঁর মোবারক হাতের পাঁচটি আংগুল সূফী ছাহেবের সামনে প্রসারিত করে বললেন- এর এক একটি ছারছীনার পীর ছাহেবের এক একটি বিরাট নেক কাজের দিকে ইঙ্গিত করছে, যেগুলোর বদৌলতে তিনি সিদ্দীকে আকবরের দরজা লাভ করেছেন। তার পর হুজুর পাক (দঃ) সূফি ছাহেবের কাছে এক এক করে উক্ত নেক কাজসমূহের বর্ণনা তুলে ধরলেনঃ বিভিন্ন মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী, দেশের গরীব লোকদের সাহায্য

সহায়তা- তাদের জন্য রিলিফ ফান্ড গঠন, মক্কা শরীফের গরীব-মিসকিনদের সাহায্যের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা, বিভিন্ন ধারায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারণের যুগোপযোগী কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী জেহাদ করা এবং কঠোর রিয়াজত, মোজাহেদা এবং ইবাদত। যমানায় কোন ওলী আল াহ্ হযরত সিদ্দীকে আকবরের দরজা হাছিল করতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর ভবিষ্যৎ বাণী উদ্বৃত করা হলো। হাদীস শরীফে আছে- একদা সাহাবায়ে কেরাম হযরত নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল াহ (দঃ), এই যমানার পর কোন উম্মত সাহাবাদের মত মর্তবা লাভ করবে কিনা। হুজুর (দঃ) বললেন, "হাঁ"। সাহাবাগণ তখন প্রশ্ন করলেন- 'তারা কি আপনার দর্শন লাভ করবেন'? হুজুর (দঃ) উত্তর দিলেন- 'না, তারা আমায় দেখবেনা, বরং তারা এমন যমানায় বাস করবে যখন ঈমান রক্ষা করা এমন কঠিন হবে, যেরূপ হাতের মুঠার মধ্যে কয়লা রাখা কঠিন। এতদসত্তে¡ও তারা আমার সুন্নতের উপর পুরোপুরি কায়েম থাকবে'। অন্য এক হাদীসে আছে- হুজুর (দঃ) ফরমায়েছেন- আমার উম্মতের উপর এমন কঠিন যমানা উপস্থিত হবে যে, তখন যারা ঈমানের উপর কায়েম থাকতে পারবে, তারা সিদ্দীকে আকবরের মর্তবা লাভ করবে।

উৎসাহী পাঠকের জন্য বর্ণিত উপরের ঘটনাসমূহ মরহুম হুজুরের কামালিয়াতের স্বাক্ষর, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি কথা পুনরায় বলছি- এগুলোর মধ্য দিয়া তাঁর কামালিয়াত প্রতিষ্ঠিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাহলে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত করা হবে। নবী চরিত্র অনুকরণে তাঁর জীবনচরিতখানিই তাঁর কামালিয়াতের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। এই জীবনচরিতখানি সামনে রেখে বর্তমানের এই কঠিন যমানায় বাতেল আকীদা পোষণকারী, ফাসেক বদকারদের সকল ঠাট্টা বিদ্রƒপ, অন্যায়-অত্যাচার উপেক্ষা করে আমরা যেন সুন্নতের উপর কায়েম থাকি এবং হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিদ্দীকে আকবরের মর্যাদা লাভ করি, মহান আল াহ্র কাছে এই হোক্ আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

মরহুম হুজুরের কামালিয়াত অধ্যায় শেষ করার আগে ছারছীনা দরবার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ২/১ টি ছোট্ট ঘটনা তুরে ধরতে চাই।

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা একদিন খাবে দেখেন- হযরত নবী করীম (দঃ) ছারছীনা দরবার শরীফ থেকে দূর দিয়ে হাঁটাচলা করছেন, ভিতরে আসছেন না। এতে তিনি অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। খাবের তাৎপর্য বুঝার জন্য তিনি ফুরফুরা শরীফ চলে গেলেন। সব শুনে মুজাদ্দিদে যমান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) বললেন- অত্যন্ত খোশ খবর। হযরত নবীয়ে পাক (দঃ) যে সব জায়গায় হাঁটাচলা করেছেন সে সবই ভবিষ্যতে ছারছীনা দরবারের অংশ হয়ে যাবে। সুবহানাল াহ!

পূর্বেও উলে-খ করা হয়েছে, ছারছীনায় ইছালে ছওয়াব মাহফিলে বহু আম্বিয়া, আওলিয়াদের রূহ মোবারক হাজির হয়- অনেকেই বিভিন্ন ভাবে এটা প্রত্যক্ষ করেছেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা প্রথম যখন মাদরাসার কাজ শুরু করেন, তখন কেউ কেউ দেখেছেন- খোলাফায়ে রাশেদীনসহ স্বয়ং হযরত নবী করীম (দঃ) ছারছীনায় উপস্থিত হয়ে মাদরাসার ভবিষ্যত কার্যক্রম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করছেন।

হযরত মাওলানা ইউনুস (রঃ) (চাঁদপুরী হুজুর) ছারছীনা মাদরাসার একজন মোদাররিস ছিলেন। ছারছীনায় একদিন তাড়াতাড়ি পথ চলার সময় পথে দাঁড়ানো একটি কুকুরের গায়ে তাঁর পা লেগেছিল। সেদিন রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখেন- সেই কুকুরটি তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং হঠাৎ করে কুকুরের যবান খুলে যায়। কুকুরটি তাকে বল্ল- মাওলানা, আমার গায়ে পা লাগিয়েছ কেন? এই পাক দরবারে তুমি যেজন্য আছ, আমিও সেজন্যই আছি।

এরূপ আরও অনেক ঘটনা রয়েছে। এই ঘটনাগুলো কে কি ভাবে গ্রহণ করবেন জানিনা। এগুলো সকলের বিশ্বাস করতে হবে- এ দাবীও আমি করিনা। এখানে শুধুমাত্র যে কথাটি

বলতে চাই সেটি হল ওলী আল াহ্গণ যেখানে অবস্থান করেন, যে পথে গমন করেন, সেখানে আল াহ্র রহমত বর্ষিত হয়। তাঁদের কামালিয়াতের জন্য সে স্থানগুলোরও মর্তবা বেড়ে যায়। এটি খুবই স্বাভাবিক। বাশার হাফী মদীনা শরীফে বহু সাহাবী (রাঃ), বিশেষ করে হায়াতে নবী হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-এর পবিত্র রওজা শরীফ রয়েছে বলেই মদীনার মর্তবা অনেক অনেক বেশি। হযরত নবী করীম (দঃ) মদীনার মাটিতে হেঁটেছেন- একথা মনে করে হযরত ইমাম মালেক (রঃ) জীবনে কখনও এ পবিত্র মাটিতে জুতা পায়ে হাঁটেন নাই।

হুজুর কেবলার তাওয়াজ্জুহ ও বাতেনী হেদায়েত

দেশে আজ মাদরাসা মক্তব আগের চাইতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলেম ওলামার সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে। সাথে সাথে ওয়াজ-নসীহত, তা'লীম-এসবেরও ব্যাপক প্রসার হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি সেই তুলনায় সমাজে সত্যিকার ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠে নাই। এর বহুমুখী কারণ রয়েছে। সে গুলোর ব্যাখ্য বিশ্লেষণ এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে এ প্রেক্ষিতে যে সূ² বিষয়টি এখানে উলে-খ করতে চাই সেটি হল ওয়াজ নসীহত, তা'লীম ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করা বহুলাংশে নির্ভর করে হাদীর নিজস্ব গুণাবলীর উপর, বিশেষ করে তার আধ্যাত্মিক শক্তির উপর। যার আধ্যাত্মিক শক্তি যত বেশি অপরের উপর তাঁর কথা আর উপদেশের প্রভাব তত বেশি পড়বে। এই আধ্যাত্মিক শক্তির বলে অপরের অন্তরে যে প্রভাব ফেলা হয় সাধারণ ভাবে তাকেই তাওয়াজ্জুহ বলে। এ সম্পর্কে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা ফরমায়েছেনঃ আগুনের কুণ্ডলির কাছে বসলে শরীরে গরম অনুভ,ত হয় এবং পানির ক,পের কাছে বসলে ঠাণ্ডা লাগে। প্রকৃত প্রস্তাবে আগুন ও পানি শরীরে লাগেনা, উহাদের প্রভাব বা ফায়েজ আসে মাত্র। ঠিক তদ্রƒপ ওলী আল াহ্গণের ছোহবতে আসলে তাদের অন্তর হতে আল াহ্ তায়ালার ফায়েজ আসে এবং ধীরে ধীরে দেহের অভ্যন্তরস্থ সূ² লতিফা এবং মৌলিক উপদানগুলোতে আল াহ্র জিকির জারী হতে থাকে। ফলে মানুষের বিচ্ছিন্ন মনকে আল াহ্র দিকে নিবিষ্ট করার ক্ষমতা জন্মে। এটিই তাওয়াজ্জুহ দানের মূল লক্ষ্য।

মূলতঃ তাওয়াজ্জুর আদান প্রদান দ্বারাই পীর মুরীদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুরীদের অন্তরে তাওয়াজ্জুহ দানের ক্ষমতা দ্বারাই পীরের আধ্যাত্মিক শক্তি নিরূপণ করা হয়। যিনি যত বেশি কামেল হবেন তার আধ্যাত্মিক বিচ্ছুরণের ক্ষমতাও তত বেশি হবে- তত সহজে মুরীদের কলবে প্রভাব পৌঁছাতে সমর্থ হবেন। আজকাল সমাজে বহু ভ,ঁইফোঁড় পীরের জন্ম হয়েছে। শরীয়ত অথবা সুন্নতের কোন অনুশীলন তাদের মাঝে নেই। অথচ বিভিন্ন তদবীরের মাধ্যমে বিভিন্ন ভেলকিবাজী দেখিয়ে মানুষকে তারা বশ করে। সাধারণ মানুষ এমনকি বহু শিক্ষিত লোকও এই সব ভণ্ড পীরের হাতে বয়াত হয়ে অনেক সময় নিজেদের ঈমান নষ্ট করে ফেলে। তাদের ধারণা পীর ছাহেব অত্যন্ত কামেল এবং তাওয়াজ্জুহ দানের ক্ষমতা তার অধিক। অথচ সত্যিকারের তাওয়াজ্জুহ প্রদানের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা আগ্রহী লোকদিগকে বয়াত করতেন এবং তাদেরকে তাওয়াজ্জুহ দিতেন। তাঁর জীবনের অজস্র কাজের মধ্যে এটি একটি প্রধান কাজ ছিল। কোন আগন্তুক তাঁর কাছে এলে তাকে মুরীদ করার পর তার পেশা কি, অবসর কি পরিমাণ থাকে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি চার তরীকতেই কামেল ছিলেন। তবে মুরীদের অবস্থা বুঝে সেই হিসাবে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন তরীকার তা'লীম দিতেন। তিনি বিভিন্ন কাজ ও কথাবার্তার ভিতরে, বহু জনতা ও কোলাহলের মাঝেও তাদেরকে এক পার্শ্বে বসিয়ে তাওয়াজ্জুহ দান করতেন। জানা যায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মাছলা-মাছায়েল আলোচনা, ফতোয়া প্রদান, নবাগত লোকদের সাথে কথাবার্তা, ঝাড় ফুঁকদান, দোয়া করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাজে লিপ্ত থেকেও সমভাবে সকলকে তাওয়াজ্জুহ দিতে সক্ষম ছিলেন। তা ছাড়া একই হালকায়

একই বৈঠকে আলেম ও সাধারণ লোক, নুতন ও পুরাতন বিভিন্ন তরীকার বিভিন্ন ছবকে থাকা লোকজনদের একই সময়ে তিনি তাওয়াজ্জুহ দিতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা আলেম মুরীদদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু মাত্র কিতাবী এলম হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয় বরং আধ্যাত্মিক গুণাবলী অর্জনের সাথে উহা প্রয়োগ করার কৌশল এবং বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এ জন্যই আলেমগণকে নিজের সাথে রেখে নিয়মিত তাওয়াজ্জুহ প্রদান করে তিনি বহু আলেমের চরিত্র গঠন করেছেন এবং তরীকার উচ্চ স্তরে পৌঁছায়ে তাদেরকে হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত করে রেখে গেছেন।

আল্লাহ পাক অলীয়ে কামেলদেরকে এমন শক্তি দান করেন যে তারা লোকজনকে ওয়াজ নসীহত ও জাহেরী তাওয়াজ্জুহ দ্বারা যেমন হেদায়েত করে থাকেন তেমনি দূর থেকেও বাতেনী ভাবে রূহানী তাওয়াজ্জুহ দ্বারা স্বপ্নে, মোরাকাবায় কিংবা জাগ্রত অবস্থায় তাদেরকে সতর্ক করে পাপ থেকে ফিরায়ে রাখেন। স্থ‚ল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কাছে এটি হয়ত একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু আওলিয়া কেরামদের জীবনে এরূপ বহু ঘটনার উলে-খ রয়েছে। তাদের বাতেনী তাওয়াজ্জুহর বরকতে কত হাজার হাজার পাপী পাপ পথ থেকে সরে এসে সত্য পথে আশ্রয় নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। উপমহাদেশের সর্বজনমান্য অদ্বিতীয় আলেম হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী(রঃ)- এর জনৈক মুরীদের ছোট্ট একটি ঘটনা নিম্নে উলে-খ করা হলোঃ

জনৈক ব্যক্তি হযরত দেহলবী (রঃ)-এর হাতে বয়াত হওয়ার পর তিনি তাকে কতিপয় নসীহত করলেন। ইতিপূর্বে লোকটি ছিল মদাসক্ত। সে দেহলবী (রঃ) -এর কাছে বলল, 'হুজুর, আমি মদ পান করি, এটি ত্যাগ করা ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। হযরত দেহলবী (রঃ) বললেন- 'ঠিক আছে, তবে আমার উপস্থিতিতে কখনও মদ স্পর্শ করোনা।' লোকটি রাজী হলো। সে ভাবলো, এটি আর এমন কি কথা? হুজুরের অবর্তমানে যখন মদ পান করার এজাজত রয়েছে, তখন ত মূলতঃ কোন বাধাই নেই। লোকটি বাড়ি ফিরে গেল এবং যথানিয়মে সাথীদের সাথে মদখানায় হাজির হল। সকলের সাথে সেও গ্লাসে মদ ঢাল্ল, গ্লাসটি হাতে নিল- তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া হল না। কিন্তু যেইমাত্র মদের গ্লাসটি তার মুখ স্পর্শ করবে, ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখতে পেল তার মুর্শিদে কামেল স্বয়ং হযরত দেহলবী (রঃ) গ্লাসের উপরে বসে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তার কাছে মনে হল তিনি যেন বলছেন- তোমার সে প্রতিজ্ঞা কি তোমার মনে আছে- আমার উপস্থিতিতে তুমি কখনও মদ স্পর্শ করবেনা? লোকটি হতভম্ব হয়ে গেলো। আপনা আপনিই তার হাত নিচে নেমে এলো। সে ভয় পেল সত্যি কিন্তু মদের নিশা তার স¤পূর্ণ কাটলো না। সে ভাবল ছোট্ট গ্লাসে করে সামান্য মদ পান করেই আজকের মত চলে যাবে। কিন্তু সেই ছোট্ট গ্লাসটিও যেই মুখের কাছে ধরেছে, অমনি ঠিক আগের মতই সে দেখতে পেল এবারও হযরত দেহলবী (রঃ) গ্লাসের উপর বসে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। এবারও মদ পান করা তার সম্ভব হল না। এমনিভাবে যতবার যে ভাবেই সে মদ পান করতে চেষ্টা করল তত বারই সে হযরত দেহলবী (রঃ) কে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখতে পেলো। অবশেষে তার মদের নিশা স¤পূর্ণ কেটে গেল- মদের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি তার আর রইল না। চিরদিনের জন্য মদের আড্ডা পরিত্যাগ করে হযরত দেহলবী (রঃ) এর কাছে এসে তওবা করল- প্রতিজ্ঞা করল সে জীবনে আর কখনও মদ স্পর্শ করবে না। সুবহানাল াহ্!

সত্যিকারের আওলিয়া কেরামদের বাতেনী তাওয়াজ্জুহ দ্বারা এমনিভাবেই অসংখ্য পাপী তাপী পথের সন্ধান পায়। পাঠকদের উৎসাহ নিরসনের জন্য হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনে বাতেনী তাওয়াজ্জুহ দ্বারা হেদায়েতের অসংখ্য ঘটনার মাত্র কয়েকটি নিæে উলে-খ করা হলোঃ

ছারছীনার কোন এক ইছালে ছওয়াব মাহফিলের শেষ দিন। মুছাফির খানার দ্বিতলে খলিফা, মোয়ালে-ম এবং বিশিষ্ট আলেমগণের সাথে হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার খাছ

অধিবেশন চলছে। এমনি সময় হুজুরের অনুমতি নিয়া একজন জীর্ণ-শীর্ণ রুগ্ন ব্যক্তি কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজের পরিচয় দিতেই সকলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল, কারণ তিনি ছিলেন একজন বিশেষ আলেম ও বক্তা। তার চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও কান্তিময়। লোকটি রোরুদ্যমান অবস্থায় কথা বলতে শুরু করলেন এবং ক্রমশঃ উচ্চ স্বরে চিৎকার ও রোদন করতে করতে বলতে লাগলেন- "হুজুর, আমি আপনার সহিত বড়ই বেয়াদবী করিয়াছিলাম এবং আপনার হুকুমের নাফরমানী করিয়াছিলাম। সেইজন্য আপনি আমাকে প্রহার করিয়াছেন, যার ফলে আমি আজ কঠিন মূত্র-মেহ রোগে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেছি। আপনি আমায় মাফ করুন"। মাওলানা সাহেবের কথার সংক্ষিপ্ত মর্ম হলো এই যে, শরীয়তের কোন বিশেষ হুকুম সম্পর্কে তিনি মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি পীর ছাহেব কেবলার বিরুদ্ধে কিছু অপপ্রচারও করেছেন, এমনকি সময়ে সময়ে তার উদ্দেশ্যে ঠাট্টা বিদ্রƒপও করেছেন। কিছুদিন পর তিনি স্বপ্ন যোগে দেখতে পান যে, পীর ছাহেব কেবলা তাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেছেন এবং তাঁর কাছে আসার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। মাওলানা সাহেব এর পর একটু সতর্ক হলেন বটে, কিন্তু নিজের মত পরিবর্তনও করলেন না, পীর ছাহেব কেবলার কাছেও আর আসলেন না। এরপর একদিন স্বপ্নে তিনি দেখতে পান, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাকে নিজ পাদুকা দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করছেন। ঘুম ভাঙ্গলে তিনি সারা শরীরে ব্যথা অনুভব করলেন, এমনকি বিছানা থেকে উঠতেও অপারগ হলেন। সেই থেকেই মাওলানা সাহেবের এই অসুস্থতা। এই ঘটনা বর্ণনা করে তিনি সজোরে রোদন করতে লাগলেন। উপস্থিত প্রায় শ তিনেক লোক সবাই তার সাথে রোদন করতে শুরু করল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা অত্যন্ত ধীর স্থির অবস্থায় তাকে তওবা পড়ালেন এবং বয়াত করালেন, পরে প্রাথমিক ছবকাদি দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

আসামের জনৈক ব্যক্তি হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কাছে এসে বয়াত হন। কিছুদিন তরীকা শিক্ষার পর হুজুর কেবলার এজাজত লয়ে স্বদেশে গমন করেন। লোকটির তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল। পীর ছাহেব কেবলা তাকে তামাক খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার হুকুম করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করলেও পরে সঙ্গদোষে পুনরায় তামাক খাওয়া শুরু করেন। একদিন স্বপ্নে দেখতে পেলেন- তিনি হুক্কা নিয়া তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পিছন দিক হতে এসে হুক্কা ধরে ফেলেন এবং অত্যন্ত বিরক্ত সহকারে তাকে তামাক পরিত্যাগ করার হুকুম দিচ্ছেন। লোকটি অত্যন্ত ভীত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং তওবা করে তামাক খাওয়া স¤পূর্ণভাবে ছেড়ে দেন।

মৌলভী মুতাজিদুর রহমান নামে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার একজন ইংরেজী শিক্ষিত মুরীদ ছিলেন। তাবলীগ পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিজের লিখা থেকেই তার জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা এখানে বর্ণনা করছি। হযরত পীর ছাহেব কেবলা শেষ বারের মত ঢাকা থেকে যখন ছারছীনা যান এটি সেই সময়কার ঘটনা। তিনি মুতাজিদুর রহমান সাহেবকে কাছে ডেকে বললেন- আপনি 'নফি এছবাত' জিকির করবেন। তিনি সম্মত হলেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তখন বললেন- আপনি জিকির করেন কিনা আমি কিন্তু জানতে পারব। তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'হুজুর আপনি থাকবেন ছারছীনায়, আর আমি থাকব ঢাকায়, আপনি কী করে দেখবেন, কী করে জানবেন'? মরহুম পীর ছাহেব কেবলা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'কি পারবনা'? মুতাজিদুর রহমান সাহেব বলেন- তাঁর ভাব ভঙ্গি আর বলার ধরন থেকে আমার পরিষ্কার মনে হয়েছিল এটি জানা তাঁর জন্য কিছুই নয়, একটি অতি সাধারণ ব্যাপার মাত্র। যাই হোক সেটিই ছিল দুজনার শেষ সাক্ষাৎ। হয়ত সে জন্যই তিনি মুরীদকে তাঁর শেষ হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ইন্তেকাল হল। আর এদিকে ধীরে ধীরে মুতাজিদুর রহমান সাহেব জিকিরে গাফলতি শুরু করলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যখনই তিনি জিকির করতে বসেন তখনই বড় বড় দুটো চোখ নিয়ে কে যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেন। হুজুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মাদ ছালেহ ছাহেবকে এ ঘটনা জানালে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন-

আব্বা আপনাকে ভালবাসেন। মুতাজিদুর রহমান সাহেব বলেন- এরপর আমার অন্তরাত্মাই যেন আমায় বলে দিল- এ চোখ আর কারও নয়, এ চোখ মরহুম হুজুরের। ইন্তেকালের পূর্বে ওলীয়ে কামেল যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন ইন্তেকালের পরও তিনি খোঁজ নিচ্ছেন তাঁর মুরীদ কি করছে, কি অবস্থায় আছে, তাঁর দেয়া নির্দেশ কতটুকু পালন করছে।

ওলী আল াহ্গণের প্রতিটি কাজই অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মানুষকে পত্র যোগেও তাওয়াজ্জুহ দিতেন। বহুদূরে অবস্থিত ব্যক্তি হুজুর কেবলার কাছে পত্রযোগে নিজ অবস্থা লিখে জানাত। তিনি তাদেরকে পত্র মারফতই মুরীদ করতেন। ছবক লিখে পাঠিয়ে দিতেন। তারা সেখানে বসেই ফায়েজ অনুভব করত।

স্ত্রীলোকদেরকে আড়ালে রেখে তিনি মুরীদ করতেন এবং তাওয়াজ্জুহ দিতেন। ছোট হোক, বড় হোক হুজুর কেবলার কাছে গায়র মোহাররম কোন মেয়ে লোকের আসার কোন এজাজত ছিল না। খাঁটি পর্দা রক্ষা করে তিনি মেয়ে লোকদের মুরীদ করতেন এবং সাধারণতঃ স্বামীর মাধ্যমে তা'লীম তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করার নির্দেশ দিতেন।

রোগ- শোক, বালা-মুসিবত বিভিন্ন কারণে লোকজন মরহুম পীর ছাহেব কেবলার কাছে দোয়ার আরজ করত। তিনি দোয়া করতেন- মাঝে মাঝে দোয়ার মাধ্যমেও তাদেরকে তাওয়াজ্জুহ দিতেন- তারা হুজুরের আশেক হয়ে যেতো। অনেক সময় যদি দেখা যেতো দোয়া প্রার্থীদের মাঝে শরীয়তের কোন ত্র"টি আছে- যেমন নামাজ না পড়া, দাড়ি মুণ্ডান ইত্যাদি, তবে তিনি বলতেন- আপনারা শরীয়ত মোতাবেক চললে দোয়া করব, তা ছাড়া আমার পক্ষে দোয়া করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ সময় দেখা যেতো তাদের ত্র"টি ধরার সাথে সাথে হুজুর কেবলার ফায়েজে নিজ ত্র"টি বুঝতে পেরে তাঁরা তার নসীহত মেনে নিত। এমনিভাবে বিভিন্ন পন্থায় তিনি মানুষকে তাওয়াজ্জুহ দিয়ে হেদায়েত করতেন।

জানা যায় প্রথম অবস্থায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা যখন তাওয়াজ্জুহ দিতেন, তখন উহা মুরীদের পক্ষে ধারণ করা কঠিন হয়ে যেতো। অনেকে চিৎকার করে বেসামাল হয়ে পড়ত। একদিন তদীয় মুর্শিদ ফুরফুরা শরীফের মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সম্মুখে এমন অবস্থা সংঘটিত হলে তিনি তাকে মৃদু তাওয়াজ্জুহ দানের নির্দেশ দেন। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাওয়াজ্জুহ দানের ফলেই মজলিস বিচলিত হয়ে উঠত। সমগ্র মজলিস জুড়ে একটি রোল উত্থিত হত। কেউ চিৎকার করে বেসামাল হয়ে পড়লে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তা প্রশমিত করে দিতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার তাওয়াজ্জুহর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল সে সম্পর্কে বহু ঘটনা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলঃ

আব্দুল মোমেন নামক মাদরাসার একজন ছাত্র ছিল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার হাতে বয়াত হয়ে সে অধিক পরিমাণে ওজীকা মোরাকাবায় লিপ্ত থাকত। ধীরে ধীরে তার মাঝে পরিবর্তন দেখা দিল। তার চাল-চলন, কথা বার্তায়, কাজকর্মে কিছুটা অস্বাভাবিক ভাব পরিলক্ষিত হত। একদিন রাত্রে মাদরাসার ছাদ হতে লাফিয়ে নিচে পড়ে এবং ছুটাছুটি শুরু করে। তার অবস্থা দেখে তাকে কিছু দিনের জন্য বাড়িতে পাঠানোর বন্দোবস্ত হল। কিন্তু পথিমধ্যে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ভেসে ভেসে সুন্দর বন চলে যায়। সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসলেও সে বেশিদিন থাকতনা, তাড়াতাড়ি সেই জঙ্গলেই চলে যেতো। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেছিল- লোকালয়ে থাকা আমার সম্ভব নয়, কারণ এখানে লোকেরা আল াহ্র নাফরমানী করে- এটি আমি সহ্য করতে পারি না। মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আব্দুল মোমেন অনেক উঁচু দরজায় পৌঁছেছে। আবদুল গনি নামক একব্যক্তি তাওয়াজ্জুহর ফলে দীর্ঘদিন মজজুব অবস্থায় প্রাপ্ত হয়েছিল।

পূর্বেলে-খিত হাদীস বিশারদ আল্ খোতানী (রঃ) যখন ছারছীনায় এলেন, তখন মরহুম পীর ছাহেব কেবলা লক্ষ্য করলেন- তাঁর টুপি, জামা ঠিক সুন্নতী নয়। হুজুর ভাবলেন- হাদীস

পড়াবেন, অথচ লেবাসে- পোশাকে হুবুহু সুন্নতী আমল না থাকলে কেমন হবে? তাই তিনি একদিন খোতানী হুজুরকে বললেন- আজ মাগরীবের পর জিকিরের হালকায় উপস্থিত থাকবেন। নির্দেশ মত খোতানী হুজুর হালকায় বসলেন। হালকা শেষ হওয়ার পর হুজুর প্রশ্ন করলেন, 'খোতানী ছাব, কুচ মালুম হুয়া'? উত্তর দিলেন, "জ্বি না"। হুজুর তখন তাঁকে এশার নামাজের পর তাঁর কামরায় আসার নির্দেশ দিলেন। যথা সময়ে খোতানী হুজুর সেখানে হাজির হলেন। হুজুর কেবলা বললেন- চক্ষু বন্ধ করে বসুন। মাওলানা কাশেম ছাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন- একটু পরই দেখি খোতানী হুজুর ছটফট করছেন এবং মেঝেতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। অবস্থা দেখে মাওলানা ছাহেব খোতানী হুজুরকে ধরতে চাইলে হুজুর ইশারায় মানা করলেন। কিছুক্ষণ পর খোতানী হুজুর বসলেন, কিন্তু মনে হ'ল তখনও তিনি কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ, চোখে মুখে অভ,তপূর্ব বিশেষ এক উপলব্ধির স্পষ্ট প্রতিফলন। হুজুর কেবলার নির্দেশ পেয়ে নীরবে আপন কক্ষে চলে এলেন। এরপর থেকে খোতানী হুজুরের মাঝে লেবাস- পোশাকসহ কোন বিষয়েই সুন্নতের সামান্য খেলাফ কেউ কোন দিন লক্ষ্য করেনি। সে দিন কি হয়েছিল জানিনা। তবে সেটি যে মরহুম হুজুরের তাওয়াজ্জুর প্রভাব কোন সন্দেহ নেই।

কুরআন পাকে উলে-খ রয়েছে আসমান ও জমিনের সকল জিনিসই আল াহ্র তসবীহ পাঠ করে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার তাওয়াজ্জুহর বরকতে বহু লোক এমন উচ্চ দরজা হাছিল করেছেন যে, গাছ পালা, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস যে আল াহ্ তায়ালার জিকির করছে তারা সেটি নিজ কানে শুনতে পান। বিভিন্ন সময় মোরাকাবায় হালতে এবং স্বপ্নযোগে বহুবার রাসূলে পাক (দঃ)-এর যিয়ারত নসীব হয়েছে।

মরহুম হুজুরের এক ভক্ত মুরীদ একবার জজবার হালতে এসে হুজুরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেনঃ হুজুর আমার সুলতানুল আজকার জারী করে দিন। হুজুর বললেন পরে। মুরীদ বললঃ ''না হুজুর এখন'' হুজুর বললেনঃ ''এখনও সময় হয়নি পরে।'' মুরীদ নাছোড় হয়ে পুনরায় বলল ''না হুজুর এখনই দিতে হবে'' হুজুর তখন বললেন ''ঠিক আছে যাও'' সাথে সাথে তার সুলতানুল আজকার জারী হয়ে গেল। হঠাৎ করে লোকটির পায়খানার বেগ হ'ল। কিন্তু পায়খানায় গিয়ে কাজ সারার জন্য যেই বসেছে, সে স্পষ্ট শুনতে পেলো- নিচে পায়খানার 'কীট' থেকে আল্লাহর জিকির ভেসে আসছে। ভয় পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অন্য পায়খানায় গেল, সেখানেও একই অবস্থা। শেষে একটু দূরে জঙ্গলের ভিতর গেল। সেখানেও সে শুনতে পেল - গাছপালার মাঝে আল াহ্র জিকির চলছে। দৌঁড়িয়ে সে নদীতে গেল, সেখানেও পানির ভিতর থেকে সে জিকিরের স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল। স্বাভাবিকভাবেই তার তখন 'বেহাল' অবস্থা, পাগল-প্রায় হয়ে পড়েছে। অন্যদের কাছে তার কথা বলায় সকলে মিলে তাকে মরহুম হুজুরের কাছে নিয়ে গেল। হুজুর কেবলা তার দিকে তাকিয়ে বললেন-যাও, কাজ সেরে আস। সে চলে গেল। এরপর অস্বাভাবিক কোন কিছু আর ঘটেনি।

জনাব সূফী ফজলুর রহমান ছাহেব বলেন, আমি মুরীদ হওয়ার পর হুজুর কেবলার অসীলায় লতিফার প্রথম ছবক হতে আরম্ভ করে ক্রমাগত দশটি লতিফা অতিক্রম করে যখন 'সুলতানুল আজকার' এর ছবক নিলাম, তখন আমার প্রতিটি লতিফা হতে জিকির জারী হয়ে প্রত্যেক লোমক,প হতে 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' জিকির জারী হতে লাগল। আমি নিজ কানে পরিষ্কার শুনতে পেতাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি এতটুকু অনুভব করতে পারতাম যে, আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু 'আল্লাহ্', 'আল্লাহ্' জিকির করছে। তিনি আরও বলেন - একবার হুজুর কেবলার বাড়ির মসজিদে মোরাকাবার অবস্থায় ছিলাম। সেই সময় নবী করীম (দঃ)-এর সাথে আমার জিয়ারত হল। আমি হুজুর (দঃ)-এর চেহারার দিকে লক্ষ্য করে তাঁর চেহারা মোবারকের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে গেলাম। সূফী ছাহেব বলেন- কোন কোন সময় আমার এমন অবস্থা (হাল) হয়েছে যে আল্লাহর রহমতে হুজুর কেবলার তাওয়াজ্জুহর বরকতে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খেয়াল করে মোরাকাবাসহ মাত্র তিনবার দরূদ শরীফ পড়া মাত্রই তাঁর জিয়ারত নসীব হয়ে যেত।

হুজুর কেবলার দরবারের মুফতি মরহুম আব্দুল মজিদ ছাহেব বলেছেন- আমি একদিন এশরাকের নামাজ পড়ে হুজুর কেবলার বাড়ির মসজিদে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় স্বপ্নে দেখি- রাসূলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে তাশরীফ এনেছেন এবং আমাকে এরশাদ করলেন, 'আর কত ঘুমাবে? আল্লাহর জিকির কর'। একথা শুনামাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। চারিদিকে চেয়ে দেখি, মসজিদে অন্য কেউ নেই, কেবল মাত্র হযরত পীর ছাহেব কেবলা একা মোরাকাবায় বসে রয়েছেন।

চাঁদপুরের আবদুল গনী জওহারী ছাহেব বলেন তিনি হুজুর কেবলার নির্দেশ অনুযায়ী ছাইফুল্লাহর ছবক মশ্‌ক করতে থাকায় স্বপ্নযোগে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে আসছেন। তখন তিনি মহব্বতের সাথে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর কদম মোবারকে চুম্বন করেন; রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাকে একটি তলোয়ার দিয়ে যান; সময় সময় দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে ঘোড়ার উপর সওয়ার করিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, আমি ফজরের নামাজের বাদ যিয়ারতের নিয়তে দরূদ শরীফ পড়ার সময় রাসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তরীকার পীরানে পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ), মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রঃ)-এর সাথে যিয়ারত হত।

হুজুর কেবলার তাওয়াজ্জুহ'র বরকতে কোন কোন পীর ভাইয়ের মৃত্যুর পরেও তার ক্বলবে জিকির জারী পাওয়া যেতো। মলফুজাতে নেছারিয়া কেতাবে উল্লেখ আছে যে, বন্দে আলী মিয়া হুজুরের এক গরীব মুরীদ ছিলেন, মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁর কবর ভেঙ্গে গেল। তাঁর কন্যা কবরের নিকট যেয়ে দেখতে পেল তার পিতার খেজাব দেয়া দাড়ি ও সমস্ত শরীর অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এতদ্দর্শনে সে তার মায়ের কাছে গিয়ে সকল ব্যাপার খুলে বলল। মাতা কন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে কবরের নিকট গেলেন এবং কন্যার বর্ণনানুযায়ী বন্দে আলী মিয়াকে অবিকৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি স্বীয় কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন, মা! তোমার ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমি তোমার বাবার কবরের মধ্যে নেমে তাঁর দাড়ি এখনও শক্ত আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখ। কন্যাটি তার মায়ের আদেশানুযায়ী কবরে নামল এবং দাড়ি ধরে টেনে তার মাতাকে বলল, মা! বাবাজানের দাড়ি এখনও শক্ত আছে। এতদশ্রবণে মাতা তার কন্যাকে বলল, মা! তোমার বাবার বুকে হাত দিয়ে দেখ। কন্যাটি মাতার কথানুযায়ী তার পিতার বুকে হাত দিয়ে উত্তর দিল, মা! বাবাজানের বুক এখন পর্যন্ত গরম আছে এবং উহার মধ্যে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় টক্‌ক্‌ শব্দ হইতেছে। দেখুন! জিকিরের কি ফজীলত ও বুজুর্গী।

সত্যবাদিতা ঃ

মিথ্যার সাথে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কখনও আপোষ করেননি। যারা মনে করে মিথ্যা কথা না বললে কার্য সিদ্ধি হয় না, তাদের মন মানসিকতার উপর তাঁর শত ধিক্কার। তাই কতক হিন্দু প্রতিবেশী মিথ্যা মামলা দায়ের করে যখন তাঁর জমি দখল করার চক্রান্ত করেছিল এবং পক্ষীয় উকীলগণ কোর্টে মিথ্যা বলার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তিনি রাজী হননি। অর্থাৎ 'সত্য মানুষকে মুক্তি দান করে এবং মিথ্যা তাকে ধ্বংস করে'- যার মনে হুজুর (দঃ)-এর এই উক্তি মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে চিরজাগ্রত, তাঁর পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কি করে সম্ভব? তাই সত্য কথা বললে তাঁর বিরাট সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্তে¡ও হাকীমের কাছে তিনি অকপটে সত্য কথা বলেছিলেন। কী সত্যাশ্রয়ী যুবক! আল াহ্ পাক যাকে নবীর নমুনা, মুহিয়ে সুন্নাত বানাবেন- তাঁর চরিত্র ত এমনিভাবেই গড়ে উঠতে হবে।

তাবলীগ ও হেদায়েত ঃ

হযরত নবী করীম (দঃ) বিদায় হজ্জের দিন লক্ষ জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- আমি কি আমার উপর (তাবলীগী) দায়িত্ব যথাযথা পালন করেছি? সকলে উত্তর দিয়েছিল হাঁ। হুজুর (দঃ)-এর উম্মতের উপরও তাবলীগী দায়িত্ব অপরিসীম। তাই মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এই দায়িত্ব পালনের জন্য হুজুর পাক (দঃ) -এর আদর্শের অনুকরণে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী গ্রহণ

করেছিলেন। তিনি আল াহ্র কাছে দোয়া করেছিলেন- "হে খোদা, যদি রীতিমত তাবলীগের দায়িত্ব পালন করা আমার দ্বারা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমি আর দুনিয়ায় থাকিতে চাইনা"।

আল্লাহর খলীল সাইয়েদনা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর যে দোয়ার ফসল স্বয়ং হুজুর (দঃ), তাতে রাসূলের যে কাজসমূহ বর্ণিত আছে সেটি হলোঃ 'যিনি আপনার আয়াতসমূহ (বিধান) তাদের নিকট তিলাওয়াত করে শোনাবেন, তাদেরকে আপনার আসমানী কিতাব (কুরআন মজীদ) এবং হিকমত (ব্যবহারিক জ্ঞান অর্থাৎ সুন্নাত তরীকা) শিক্ষা দিবেন এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করে দিবেন।' পবিত্র কুরআনের এই বাণীকে সামনে রেখেই কিশোর হাদী হযরত নেছারুদ্দীন (রহঃ) সমাজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ইলমে জাহেরের তা'লীম, ইলমে বাতেন বা আত্মশুদ্ধির তা'লীম, ওয়াজ ও তাজকীর, তাছ্নীফ, তানজীম, রাজনীতি ইত্যাদি কর্মপন্থা সম্বলিত তাবলীগে দ্বীনের একটি পূর্ণাংগ কর্মসূচী প্রণয়ন করে সেটি বাস্তবায়নের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করলেন।

ইলমে জাহেরের তালীমের জন্য দক্ষিণ বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা হাজার হাজার মক্তব, মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আলো। তালীমে দ্বীনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীগণ যাতে আমলী ও আখলাকী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত নামে একটি আদর্শ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। দেশের অন্যান্য মাদরাসাগুলোও যাতে এই আদর্শে পরিচালিত হয়ে সুন্নতে নববীর পুনরুজ্জীবনে অবদান রাখতে পারে সেজন্য "এহ্ইয়ায়ে সুন্নাত" তহবিল নামে একটি ফান্ড গঠন করে সুন্নাত তরীকার পূর্ণ আমলকারী মাদরাসাসমূহকে সাহায্য করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করে যান।

তাবলীগে দ্বীনের জন্য তিনি ইছলাহে নফসকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি বলতেনঃ অন্ধ লোক যেমন অপরকে পথ দেখাতে পারেনা তদ্রƒপ হেদায়েত-চক্ষুহীন ব্যক্তিও অপর কাওকে হেদায়েত করতে পারে না। ইল্মে তাসাওফ তথা আত্মশুদ্ধির জ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় দেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অগণিত জাকেরীন তৈরী হয়েছে, কত পথহারা মানুষ এই তা'লীমের বরকতে নবী চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে গেছে।

পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সারাটি জীবন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি বিদেশে গিয়েও তিনি ওয়াজ-নসীহত করতেন এবং সলফে সালেহীনদের আদর্শ মোতাবেক বিভিন্ন মাহফিলের আয়োজন করতেন। সেখানে কুরআন শরীফ, ছহীহ ও প্রামাণ্য হাদীস এবং সাহাবী ও ওলী আল্লাহদের জীবনেতিহাস অবলম্বন করেই আলোচনা চলত; কোনরূপ শের্ক, বিদয়াতের প্রশ্রয় তিনি দিতেন না। মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া, ইসলামী শিক্ষা, তথা সুন্নতের পুনর্জাগরণ ও প্রসারণ ঘটানোই ছিল তাঁর ওয়াজ-নসীহত ও মাহফিল আয়োজনের একমাত্র লক্ষ্য।

শিক্ষা বিস্তারে দূরদর্শিতা ঃ

ফুরফুরা শরীফের হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) বলতেনঃ ধর্মীয় শিক্ষার পাশে মুসলমানদেরকে বিজ্ঞান, কারিগরী, ডাক্তারী ইত্যাদি বৈষয়িক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে, নইলে জাতি হিসেবে তারা কখনও বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবেনা। তাঁর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে মরহুম হুজুরের চরিত্রেও অনুরূপ চিন্তাধারা ও মনমানসিকতার বিকাশ ঘটেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান ছাহেব মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর পিতার সাথে মরহুম হুজুরের দোয়া নিতে এলে তিনি বললেন- আল্লাহর ফজলে মাদরাসায় লোকজন পড়াশুনা করতে এগিয়ে আসছে। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন- এখানেও একদল আল্লাহর সৈনিক তৈরী করতে হবে। সুবহানাল্লাহ ! ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে মুসলমানদেরকে সর্ববিষয়ে শিক্ষিত করে

উন্নত জাতি হিসেবে দাঁড় করানোর তাঁর যে গভীর অনুভ‚তি এবং মহান আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে তার তুলনা কোথায়? মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর অভিপ্রায়ই ছিল তাঁর উম্মতগণ সর্ববিষয়ে সকলের চাইতে উন্নত থাকবে।

কিতাব প্রণয়ন ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা অনুধাবন করলেন দ্বীনের হেফাজত ও প্রসারণের জন্য লেখনীয় প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই তিনি বিভিন্ন দ্বীনি কিতাবাদী লিখে ইসলামী শিক্ষায় প্রচারণার পথ সুগম করলেন। একথা বলা মোটেই বাহুল্য হবে না, বাংলা ভাষায় কিতাবাদিসহ বিভিন্ন ইসলামী পুস্তক প্রণয়ন করে বাংলাভাষী মুসলমানদের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রচারণায় তিনি এক নবযুগের সঞ্চার করেন। দিনের পর দিন রাত জেগে জেগে কিতাব লিখতে গিয়ে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ত, সেটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পুনরায় কলম হাতে নেয়ার সেই দৃশ্যটি যখনই স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে তখনই 'লেখকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতেও পবিত্র', হুজুর (দঃ)-এর এই হাদীসটির কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়। আল্লাহর দ্বীন সমাজে প্রচার করার কী অদম্য স্পৃহা!

পত্রিকা প্রকাশনা ঃ

হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করলে কেউ বিস্মিত না হয়ে পারে না। বিভিন্ন সময়ে জন-সমাজে কুরআন হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পরিবেশন এবং সময়ের পরিবর্তনে বিভিন্ন দ্বীনী সমস্যার মোকাবেলায় গঠনমূলক, জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরায় ইসলামী পত্রিকার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই তিনি 'তাবলীগ' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারণের জন্য তরীকার তা'লীম এবং ওয়াজ নসীহতের পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা- এ দুটো বাহন যে শক্তিশালী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সংগঠন ও রাজনীতিঃ

সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত নবী করীম (দঃ) কে কত ত্যাগ স্বীকার, কত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তায়েফবাসীদের অত্যাচারে তাঁর পবিত্র দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে, ওহুদের যুদ্ধে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা হুজুর (দঃ)-এর সেই সংগ্রামী আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাইত তাঁকে দেখতে পাই অরাজনৈতিক সংগঠন 'হিযবুল ◌াহ'র আমীর হিসেবে, 'ওলামায়ে ইসলাম'- এর সভাপতি হিসেবে, তাঁকে দেখতে পাই ওলামায়ে হিন্দের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান আজাদীর জেহাদে বলিষ্ঠ একজন মুজাহিদ ও সিপাহছালার হিসেবে।

পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্ত-বৃন্দসহ যে সংগ্রামী ভ‚মিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাতে পাকিস্তান অর্জনে তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। বস্তুতঃ পাক ভারত উপমহাদেশে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, যার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী (রঃ) বালাকোটের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সেই বালাকোটি চেতনারই এক উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ছিলেন।

শোষণমুক্ত সমাজ গঠন ঃ

শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুদী লেন দেন, অন্যায়ভাবে অপরের সম্পত্তি কুক্ষিগত করা, ইত্যাদি ইসলামী বিধানমতে হারাম ও অবৈধ- এ কথা প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রয়োজনবোধে ঐ সব অন্যায় কাজে লিপ্ত লোকদেরকে সমাজচ্যুত করারও ব্যবস্থা করেন। সমাজে এর বিরাট প্রভাব

পড়ে। শত শত ঋণগ্রস্ত শুধু সুদের অর্থ প্রদান থেকেই মুক্ত হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে আসল টাকা ফেরত দেয়া হতেও মার্জনা লাভ করে। সরকারী ঋণ-সালিসী বোর্ড গঠনের বহু পূর্বেই হুজুর কেবলা ঋণভাবে বিপর্যস্ত গরীব জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেন সেগুলো ১৪০০ বছর আগে সমাজে অর্থগৃধু শোষকের বিরুদ্ধে হুজুর (দঃ)-এর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

খেদমতে খাল্ক ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল খেদমতে খালক। "সৃষ্টির সেবাই হচ্ছে তরীকার মূল উদ্দেশ্য"- হুজুরের এই উক্তি "আর্ত অসহায় গরীবলোকদের মাঝে আল াহ্কে খোঁজ"- রাসূলুল াহ (দঃ)-এর এই কথারই প্রতিধ্বনি নয় কি? মাদরাসায় অধ্যয়নরত গরীব ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত লিল াহ বোর্ডিং, ছারছীনায় এসে বিনা খরচে থেকে লোকজন যাতে তরীকা শিক্ষার সুযোগ পায় সেই উদ্দেশ্যে তৈরী মুসাফিরখানা, গরীব বাঙ্গালী হাজীদের জন্য মদীনা শরীফে প্রতিষ্ঠিত মুসাফিরখানা, নওমুসলিমদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদত্ত হাঁস-মুরগী, ভেড়া-বকরী ইত্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে গঠিত "হেমায়েতে ইসলাম ফান্ড"- এই সব প্রতিষ্ঠান মরহুম হুজুরের মানবতার সাক্ষী হিসেবে চির ভাস্কর হয়ে থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। বিভিন্ন উপায়ে অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করতেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল গরীব প্রতিবেশীদের লিষ্ট করে দান-খয়রাত করা, গোপনে দান করা, কন্যাদায়গ্রস্থদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, ঋণগ্রস্থদের ঋণমুক্ত করা, বিধবা, অনাথ আর এতিমদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা- ইত্যাদি বিষয়সমূহ মরহুম পীর ছাহেব কেবলা দৈনন্দিন অজীফার মত তাঁর অবশ্য করণীয় কাজগুলোর মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম (দঃ) একবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে বলেছিলেন, "হে আয়েশা, তরকারীতে বেশি করে পানি দাও"। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলুল াহ (দঃ), তবে তো স্বাদ কম হবে"। তখন হুজুর (দঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, "কিন্তু সবাইকে তো শরীক করা যাবে"। এই কথার সাথে তাঁর এক আদর্শ উম্মত মানব দরদী মরহুম হুজুরের সেই কথাটির কি অপূর্ব মিল রয়েছে- চলো, এই দুর্যোগের দিনে সবাইকে নিয়ে ঈদ করি, ঈদের জন্য সমস্ত বাড়তি খরচ গরীব-দুঃখীদের মাঝে আমরা বিলিয়ে দিই।

বিধর্মীদের সাথে ব্যবহার ঃ

ইসলাম কখনও পরধর্মের উপর আঘাত সমর্থন করে না। মদীনা শরীফে গিয়ে বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে মিলে-মিশে থাকার জন্য রাসূলুল াহ (দঃ) একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। "মূর্তিপূজাকে ঘৃণা কর, কিন্তু মূর্তিপূজকের সাথে কলহ করো না, সদ্ভাব রেখো"- এটিই ইসলামের শিক্ষা। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মূর্তির দিকে তাকাতেও ভয় পেতেন কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দুদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং বিপদে-আপদে, সাহায্য- সান্ত্বনা প্রদানে সব সময় তিনি এগিয়ে যেতেন। তারাও হুজুরকে তাদের একজন দরদী অভিভাবক হিসেবে জ্ঞান করত। হুজুর (দঃ)-এর দরবারে খ্রীস্টান, ইয়াহুদী ইত্যাদি বিধর্মীরা এসে তাঁর অমায়িক ব্যবহারে যেরূপ মুগ্ধ হয়ে যেতো, অনুরূপ একটি চিত্রই ফুটে উঠে মরহুম হুজুরের দরবারে। জনৈক হিন্দু অফিসারের সেই ঘটনাটি আবার তুলে ধরছি- তিনি হুজুরের কাছে এসে মাথা নত করে প্রণাম করলে হুজুর যখন বললেন, 'আল াহ্ ছাড়া এ মাথা কারও কাছে নোয়ানো যায়না', তখন হুজুরের ব্যবহারে মুগ্ধ আপ্লুত অফিসারটি ভক্তির আতিশয্যে বলে উঠেছিলেন- আপনার মত মহান ব্যক্তিত্বের সামনে যে মাথা নোয়ানো যায়না- সে মাথা না থাকাই ভালো। যদিও হুজুর এ ধরনের আচরণের প্রতিবাদ করতেন এবং এতে বিরক্ত হতেন।

মেহমানদারী ঃ

হুজুর পাক (দঃ) বলেনঃ তোমাদের উপর মেহমানদের হক রয়েছে। মেহমানের সাথে ফেরেশতা গমন করে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মেহমানদের ব্যাপারে বিশেষ সর্তক ছিলেন। তাদের সকলের খাওয়া শেষ না হলে তিনি কোন দিন আহার করেননি। মুসাফিরখানায় খাওয়া শেষ হওয়ার পর কোন মেহমান আসলে প্রথমে তিনি অন্দর মহলে যেতেন। সেখানে কোন ব্যবস্থা না হলে হোটেল থেকে কিনে খাওয়ার জন্য তিনি তাকে পয়সা দিয়ে দিতেন, এর পর নিজের খাবার খেতেন।

চরিত্রের কতগুলো মূল উপাদানঃ

ক্ষমাঃ

হযরত নবী করীম (দঃ)-এর জীবন ক্ষমার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর বহন করে। মনে পড়ে তায়েফবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত হওয়ার পরও তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিলনা। বরং এত অত্যাচারের পরেও তাদেরকে শুধু ক্ষমাই করেননি, তাদের হেদায়েতের জন্য আল াহ্ পাকের কাছে দোয়া করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন কাফেররা যখন ভয়ে জড়সড় হয়ে গিয়েছিল তখন হুজুর (দঃ) বলেছিলেনঃ শোন, ভয় নেই, তোমাদের সকল অত্যাচার ভুলে গিয়ে আমি তোমাদের মাফ করে দিলাম।

মলফুজাতে নেছারিয়ায় উলে-খ আছে- কতক জাহেল লোক জনৈক বুজুর্গ লোককে অত্যাচার করত কিন্তু তিনি সাথে সাথে মাফ করে দিতেন। একজন লোক জিজ্ঞাসা করল, হুজুর, তারা অত্যাচার করে আর আপনি সাথে সাথে মাফ করে দেন, এর কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, মাফ চাওয়ার পূর্বে মাফ করে দেয়া বিশেষ ছওয়াবের কাজ। এরা অনুতপ্ত হয়ে যদি মাফ চায় আর আমি মাফ করি তাহলে আমার ছওয়াব কমে যাবে। তাই তারা যেন মাফ চাওয়ার সময় না পায় সেজন্যই আমি সাথে সাথে মাফ করে দেই। সুবহানাল াহ!

বাস্তবিকই নবী রাসূল এবং ওলী আল্লাহদের চরিত্রে ক্ষমা গুণটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের জীবনের ক্ষমাজনিত ঘটনাগুলো আমাদেরকে অবাক না করে পারেনা।

মরহুম হুজুরের চরিত্রেও ক্ষমা ছিল একটি বিশেষ গুণ। পরম শত্র“কেও তিনি বিনা দ্বিধায় ক্ষমা করে দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেনঃ হযরত নবী করীম (দঃ) দু'টি জিনিস নিয়ে এসেছিলেন। এই দু'টি জিনিসের মাধ্যমেই তিনি মানুষকে হেদায়েত করেছিলেন। প্রথমটি হল তাবলীগ অর্থাৎ ধর্ম প্রচার আর দ্বিতীয়টি হল ক্ষমা। হযরত (দঃ)-এর উম্মত হিসেবে এই দু'টি গুণ আমাদের অর্জন করতে হবে।

হুজুর কেবলা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী, পরম শত্রু, এমনকি সাধারণ চোরকে পর্যন্ত কি ভাবে ক্ষমা করেছেন সে সম্পর্কে দু'একটি ঘটনা উলে-খ করছিঃ

- প্রথমে যখন তিনি হেদায়েতের কাজ শুরু করেন, তখন থেকেই লোকজন তাঁর কথাবার্তা এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল। এতে কিছু কিছু আলেম সমাজে তাদের একচেটিয়া প্রভাব কিছুটা ব্যহত হওয়ার আশঙ্কায় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা চালাতে থাকেন। এমনকি সভা সমিতিতে ও বিভিন্ন ধরনের পুস্তকের মাধ্যমে হুজুরের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় মিথ্যা রটনা করতেও তারা কুণ্ঠিত হন নাই। হুজুর সব জেনেও কোনদিন এর প্রতিবাদ করেননি। ভক্তদেরকে মাঝে মাঝে বলতেন, "আমার নিন্দাকারীকে জানাইয়া দিও যে, তিনি আমার দোস্ত, কারণ অযথা নিন্দাবাদের মাধ্যমে তাহার নেকীসমূহ তিনি আমাকে দান করিয়াছেন"।

- হুজুর কেবলার দেশীয় একজন লোক হুজুরের নামে জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটাত। একজন মুরীদ হুজুরের কাছে কেঁদে কেঁদে সব বর্ণনা করায় হুজুর বললেনঃ বাবা দুঃখ করো

না, আমি লোকটিকে মাফ করে দিয়েছি। তুমি তাকে সংবাদ দিও আমার কাছে আসার জন্য। আমার আরও বড় বড় দোষ আছে, যা সে জানেনা, সে আসলে আমি তাকে লিখে দিব।

- একবার হুজুর কেবলার এক মুরীদ হুজুরকে এসে বললো- অমুক আলেম সাহেব সভা-সমিতিতে আপনার গীবৎ করে, কুৎসা গায়। হুজুর বললেন, "বাবা, মাওলানা সাহেব কি শেকায়েত করেন বলুন ত"। বার বার বলার পর উক্ত মুরীদ হুজুরের কাছে সব কিছু ব্যক্ত করলেন। তখন হুজুর বললেন, "বাবা, নেছারুদ্দীন- এ সকল শেকায়েতের পূর্ণ মোস্তাহেক। ঐ কথা শুনে আমার মন ক্ষেপে যায় কিনা, সেটি অবগত হওয়ার জন্যই আমি ঐ সব শেকায়েতগুলো জানতে চেয়েছি। তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলবে - সে আমর প্রকৃত বন্ধু, কারণ তিনি শেকায়েত করেছেন, আমি ছবর করেছি, মাফ করেছি। যার মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে ছওয়াব লাভ করলাম, তিনি কি আমার বন্ধু নন"? সুবহানাল াহ! নিন্দাকারীর উপর বিরক্ত হওয়া ত দূরের কথা, তিনি ঐ নিন্দাবাদকে নিজের ভিতর শুদ্ধি যাচাইয়ের একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রকৃত ওলী আল াহ্দের চিন্তাধারা কত ভিন্ন! এ প্রসঙ্গে মলফুজাতে নেছারিয়ায় উল্লেখিত ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যমান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর একটি ঘটনা উলে-খ করতে চাই। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বলেন- একদা আমি ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর ছাহেব কেবলার দরবারে হাজির ছিলাম। হুজুর কেবলা বললেন- বাবারা, আমার 'তাওহীদে আফয়ালী'র ফায়েজ হাছেল হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম, কেননা এই ছবক মোজাদ্দেদিয়া তরীকার প্রাথমিক ছবক। আমরা চিন্তা করিতেছিলাম- ইতিমধ্যে হুজুর নিজেই বললেন- 'আমার কথার অর্থ এই যে, আমি একটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি- আমার বাড়ির পাশে একটি গরীব প্রজা আছে। সে লোকমুখে আমার নানা কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া আমার বাড়িতে আসিয়া আমাকে নানা অকথা, কুকথা বলিতে লাগিল। আমি আমার সঙ্গীয় লোকদের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, তাহাদের সকলের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি নীরবে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তাহার গালি-গালাজ শুনিয়া যাইতেছিলাম। যখন দেখিলাম সে থামিতেছে না, তখন আমি বলিলাম- ভাই, তুমি যে গালিগালাজ করিতেছ, প্রকৃতপক্ষে আমি তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত কিন্তু আমার সময় খুব কম। অতএব, তোমার গালিগালাজ আরও বাকী থাকিলে তাহা তাড়াতাড়ি শেষ কর। এই কথা শুনিবামাত্র সেই ব্যক্তি আমার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, হুজুর, আমি অন্যায় করিয়াছি, আমাকে মাফ করুন। এই ঘটনা দ্বারা আমি বুঝিতে পরিয়াছি যে, আল াহ্র রহমতে আমার 'তাওহীদে আফয়ালী'র ফায়েজ হাছেল হইয়াছে'।

- একবার মরহুম হুজুর কেবলার কোন এক মাহফিলে একটি চোর চাউল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। সে আবার চুরি করে আবার ধরা পড়ে। তৃতীয়বার চুরি করার সময় তাকে ধরে হুজুরের সামনে বিচারের জন্য আনা হলো। তার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ শুনে অভিযোগকারীদের হুজুর বললেন- সে চুরি করে, তোমরা ধর কা (অর্থাৎ ধর কেন)? এই বলে সবাইকে বিদায় দিয়ে ঐ চোরকে কিছু চাউল দিয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

- পরম শত্রুকেও তিনি শত্রু বলে মনে করতেন না, বরং তাদেরকে অন্তরের সাথে মাফ করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে পূর্বে উলে-খিত একটি ঘটনা তুলে ধরছি। তিনি একবার মক্কা শরীফ যাওয়ার সময় তার ভগ্নিপতিকে বাড়িতে রেখে যান। তিনি চলে যাবার পর কতক পরশী লোক ভগ্নিপতির সাথে বিবাদ শুরু করে। এমনকি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার বাড়ি- ঘর দখল করে নেওয়ার জন্য নানা প্রকার জুলুম, অত্যাচার করে। মরহুম হুজুর কেবলা দেশে ফিরে এসে সবকিছু জানলেন। কিন্তু তাদের প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে যে অমায়িক ব্যবহার দেখিয়েছিলেন, সেটি সত্যিই বিরল। সকলে অবাক হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে হুজুর কেবলা হেসে জবাব দিলেন, 'দুনিয়ায় আমার কোন দুশমন নেই'। এ সকল পাড়া প্রতিবেশীদের সন্তানগণ পরবর্তীতে বিশেষ অভাবগ্রস্ত হয়ে পরে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা অন্যান্য গরীব লোকদের চাইতে তাদেরকে কিছুটা বেশি সাহায্য করতেন, যেন তারা মনে

করতে না পারে যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁর সাথে যে অসৎ ব্যবহার করেছিলেন তিনি তা ভুলেন নাই।

- মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ নিন্দাবাদ করলে তিনি মোটেই বিচলিত হতেননা- তবে ধর্মীয় কোন বিষয়, এতেকাদ বা মাসয়ালা বিষয়ক হলে তিনি প্রতিবাদ করতেন। প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞাপন, ইশ্তহার ও বই পুস্তকের মাধ্যমে সঠিক বিষয় সকলকে জানিয়ে দিতেন। সেগুলোতে কোন কটুবাক্য বা বিদ্রƒপাত্মক কোন কথা আদৌ লিখা হতনা। তাঁর পক্ষ হয়ে কেউ কখনও কোন তীক্ষè মন্তব্য করলে অথবা রূঢ়কথা লিখলে তিনি তা সংশোধন করে রুচিপূর্ণ স্বাভাবিক কথা লিখার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, "বাবা, হেদায়েত শিখ, কড়া কথায় হেদায়েত হয়না, উহাতে হেদায়েত নষ্ট হয়। তোমাদের কলমকে মাঝে মাঝে মধু খাওয়াও"।

- "মাওলানার উক্তি খণ্ডন" এবং "রদ্দে বদগুমান" নামক দুইখানা পুস্তক লিখা হয় বিদ্বেষ, নিন্দা ও কুৎসামূলক দু'টি পুস্তকের প্রতিবাদে। উহাতে কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের কথার অযৌক্তিকতা এবং আলোচ্য বিষয়ে কিতাবী প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কটুকে কটু দ্বারা প্রতিবাদ করেন নাই। কটু কথাকে মিষ্ট কথায় এবং নিন্দাবাদকে দোয়া দ্বারা জবাব দিতেন। বস্তুতঃ এগুলো নবীদের গুণাবলী। বাস্তবিকই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার এই গুণটি অত্যাচারী এবং বিদ্রƒপ ও কুৎসাকারীদের জন্য হযরত নবী করীম (দঃ)-এর ক্ষমা এবং মঙ্গল কামনার কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তাওয়াক্কুল ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা প্রথম জীবনে তদীয় মুর্শিদের কাছে চাকুরী করার এজাজত চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পীর ছাহেব মরহুম তাকে বলেছিলেনঃ চাকুরীর চাইতে হেদায়েত উত্তম। এর পর থেকে রিজিকের ভার আল্লাহর উপর সোপর্দ করে তিনি হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কুরআন পাকে রয়েছেঃ 'ভ‚পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিজিকের ভার আল্লাহর উপর নেই'। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এ আয়াতের উপর পুরাপুরি আমল করে কোনদিন খাওয়া-পড়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা করেননি। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি সকলের হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। যদিও টাকা-পয়সার দরকার ছিল তথাপি কারও মালের উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে তিনি হাত গুটিয়ে নিতেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন তাঁর রিজিকের মালিক আল াহ্, তাই হারাম মাল গ্রহণ করে আল াহ্র কোপে কেন তিনি পতিত হবেন? আল াহর উপর ভরসা করে হেদায়েতের নিয়তে হারাম মাল গ্রহণ না করার ফল এই হয়েছিল যে, যাদের টাকা তিনি ফেরত দিতেন তারা হেদায়েত পেয়ে যেত। এরূপ অনেকটা ঘটনা "তাবলীগ ছফর" অধ্যায়ে উলে-খ করা হয়েছে।

মাদরাসা, বোডিং ইত্যাদির খরচ ছিল প্রচুর। কিন্তু মরহুম পীর ছাহেব কেবলা টাকা কোত্থেকে আসবে সে জন্য মোটেই বিচলিত হতেন না। স¤পূর্ণরূপে আল াহর উপর ভরসা করে সব কাজে হাত দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেনঃ যা কিছু দেখছ এগুলো চালানোর ক্ষমতা নেছরুদ্দীনের নেই। যে মা'বুদের ইচ্ছায় এগুলো হয়েছে আমি সবই তাঁর হাতে ন্যস্ত করছি; সেই মা'বুদই এগুলো চালাবেন, তিনিই এর ছামান যোগাড় করবেন।

তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা এবং পুরস্কার দু'টাই আল্লাহর তরফ হতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার ভাগ্যে মিলেছিল। প্রথম জীবনে তিনি বহু সময় একেবারেই কপর্দকহীন হয়ে পড়তেন। ঘরে চাউল নেই, পকেটে বাজার খরচের পয়সা নেই। আছে শুধু আল াহর উপর তাঁর একনিষ্ট নির্ভরতা, প্রশান্ত উজ্জ্বল চেহারা, আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং সাময়িক অসুবিধায় পড়লে তিনি হাসি মুখে ছবর করেছেন এবং তার বিনিময়ে এসেছে খোদার রহমত, স¤পূর্ণ অজানা পথে অজস্র ধারায় সেই রহমত এসে তাঁকে প্রাচুর্যের প্লাবনে ভরে দিয়েছে। কিতাবে যেমন দেখা যায় পূর্বের ওলী দরবেশদের জীবনে মাঝে মাঝে

আলৌকিকভাবে খাদ্যের সংস্থান হত, তেমনই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনে বহুবার ঘটেছে। বাড়িতে হয়ত বহু মেহমান রয়েছে অথচ ঘরে কোন চাউল নেই। এরূপ অবস্থায় ঘরের লোকজন উৎকণ্ঠিত, ঠিক সেই সময়ই হয়ত দেখা গেল জনৈক লোক প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী লয়ে হাজির।

পরবর্তীতে হুজুর কেবলার জীবনে অর্থের প্রাচুর্য এসেছিল। তিনি হাজার হাজার টাকার দুর্মূল্য কিতাবসমূহ ক্রয় করে বিরাট এক কুতুবখানা তৈরী করেছিলেন। হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বিরাট বজরা ক্রয় করেছেন। বার্ষিক ইছালে ছওয়াব মাহফিলের জন্য হাজার হাজার টাকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু উৎপাদনমূলক কোন কাজে তিনি কখনও টাকা খাটান নাই অথবা ভবিষ্যতের ভয় করে জমি-জমা কিনে রাখেন নাই। সকল টাকা বিভিন্ন নেক কাজে ব্যয় করে তিনি একজন দীন-হীন ফকীর হিসেবেই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন, মালদার হিসেবে নয়।

এখানে একটি কথা উলে-খ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের জন্য টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা নাজায়েজ নয় এবং উহা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থীও নয়। তাওয়াক্কুল দুই প্রকার - তাওয়াক্কুল মায়াল আছবাব এবং তাওয়াক্কুল বেলা আছবাব। প্রথম প্রকার তাওয়াক্কুল হলো শরীয়ত সমর্থিত উপায় উপকরণ সংগ্রহ করে ফলাফলের জন্য আল াহ্র উপর ভরসা করা। এতটুকু তাওয়াক্কুল সকলের জন্য ফরজ। হুজুরে পাক (দঃ) এই প্রকার তাওয়াক্কুলের কথা আমভাবে প্রচার করেছেন। হাদীছে আছে, একদা এক সাহাবী হুজুর (দঃ)-এর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি উটটিকে কি অবস্থায় রেকে এসেছ? সাহাবী জওয়াব দিলেন- আল াহ্র উপর ভরসা করে ছেড়ে এসেছি। হুজুর (দঃ) বললেন- তুমি চলে যাও। প্রথমে উটের পা খুঁটির সাথে বাঁধ, তারপর আল াহ্র উপর ভরসা কর। দ্বিতীয় প্রকারের তাওয়াক্কুল হল কোন বস্তু পেতে হলে যে উপায় উপকরণ নির্ধারিত রয়েছে সেটি অবলম্বন না করে বস্তুটি পাওয়ার জন্য আল াহ্ পাকের উপর ভরসা করা। এই প্রকারের তাওয়াক্কুল কেবলমাত্র পয়গম্বর ও আওলিয়া কেরামদের জন্য জায়েজ। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জন্য জায়েজ নাই। নবী করীম (দঃ) এই প্রকারের তাওয়াক্কুলের বিষয় আমভাবে প্রচার করেন নাই। অনেকে সুন্নাত তরীকা বর্জন করে সর্ব সাধারণকে দ্বিতীয় প্রকারের তাওয়াক্কুল অবলম্বন করার জন্য পীড়াপীড়ি করে। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজে সারাটি জীবন প্রতিটি কাজে দ্বিতীয় প্রকারের তাওয়াক্কুলের অনুশীলন করেছেন, কিন্তু আমভাবে সকলকে প্রথম প্রকারের তাওয়াক্কুল অবলম্বন করার পরামর্শ দিতেন।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা শুধু মাদরাসা- বোর্ডিং চালানো এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেই আল াহর উপর নির্ভর করতেন তা নহে। প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কাজে, কথায় এবং চিন্তায় তার তাওয়াক্কুল ছিল অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উলে-খ করছিঃ

জনাব এ,কে,ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আমন্ত্রণে তদানীন্তন বাংলার ছোট লাট স্যার হার্বার্ট ছারছীনা মাদরাসা এবং চাখার কলেজ পরিদর্শনে রাজী হন। লাট সাহেবের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে জিলা ও মহকুমা হতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ ছারছীনায় উপস্থিত হন। তারা অভ্যর্থনা সংক্রান্ত বিরাট তালিকা তৈরী করে হুজুরের কাছে পেশ করেন। এক বিরাট তালিকা- তন্মধ্যে রয়েছে স্বরূপকাঠী থেকে ছারছীনায় লাট সাহেব পদব্রজে যাবেন বলে সমস্ত রাস্তা লাল কাপড় দিয়ে ঢাকতে হবে, মাঝে মাঝে কলা গাছ পুততে হবে, বিরাট বিরাট তোরণ তৈরী করতে হবে। সাজ সজ্জার বাহার দেখে হুজুর কেবলা মহকুমার হাকিমকে বললেনঃ জনাব আমি একজন ফকির মানুষ। আমার এখানে আলেম ওলামাগণ তাশরীফ আনেন। আমি তাদের তাজিমের জন্য যৎসামান্য আয়োজন করি, তার চাইতে বেশি করা আমার জন্য সম্ভব নয়। জেনে রাখুন, আমি আল াহকে চাই। লাট সাহেব যদি দয়া করে ফকিরের আস্তানায় আসেন সুখের বিষয়, কিন্তু আপনাদের নির্দেশমত কোন অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করতে আমি অপারগ। হুজুর কেবলার দৃঢ়তা দেখে এ ব্যাপারে তাঁকে আর কেউ পীড়াপীড়ি করতে সাহস পায় নাই। কিন্তু সবচাইতে বড় সমস্যা দেখা দিল লেডী

হার্ববার্টের আগমন নিয়ে। লাট সাহেবের সাথে তার বেগম আসবেন- এটা আসলে কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু ছারছীনার জন্য এটা কত বড় মারাত্মক, কত বেমানান তা সহজেই অনুমেয়। যে দরবারে জীবনে কেও একটি ছোট বালিকার উপস্থিতি দেখে নাই, সেখানে প্রকাশ্যে ইছালে ছওয়াব মাহফিলে শত শত আলেম ওলামা, পরহেজগার, মোত্তাকী লোকদের সভায় স্বাভাবিক বেশভ‚ষায় একজন ইংরেজী রমণী মঞ্চে উপবিষ্ট থাকবে, এতে হুজুর কেবলা কীভাবে রাজী হতে পারেন?

এ ব্যাপারে হুজুর যাকেই বললেন, সবাই অপারগতা প্রকাশ করল। লাট সাহেবকে তার স্ত্রী ছাড়া ছারছীনায় আসতে হবে একথা বলার মত সাহস কারও ছিল না। হুজুর কেবলার সামনে মনে হল এক বিরাট মুসিবত। অবশেষে তিনি আল াহ উপর ভরসা করে এর ফয়সালার ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দিলেন। আল াহ পাক তাঁর উপর এই নির্ভরতার পুরস্কার দিলেন। হঠাৎ করে অলৌকিকভাবে টেলিগ্রাম এলো- ছারছীনায় অনুষ্ঠিতব্য মাহফিলে লেডী হার্ববার্ট আসছেন না। এখানে অন্য কোন মহিলাই যেন যোগদান না করে। আল্লাহর উপর ভরসা করার দরুনই আল্লাহ পাক তাঁর ফরিয়াদ শুনেছিলেন। পরবর্তী জীবনে বহুবার এই ঘটনা উলে-খ করে হুজুর কেবলা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কেঁদে আকুল হয়ে যেতেন। যাই হোক, লাট সাহেব এলে তাকে যথারীতি অভ্যর্থনা জানানো হল। জনাব হক সাহেব মানপত্র পাঠ করলেন এবং হুজুর তাঁর স্বভাব সুলভ গম্ভীরভাব সহকারে মুনাজাত করলেন। লাট সাহেব খুব খুশী হয়েছিলেন। ঘটনাটি অনেকের কাছে অত্যন্ত মামুলী মনে হতে পারে। কিন্তু পরহেজগারীর যে উচ্চ স্তরে হুজুর কেবলা আসীন ছিলেন, সেটি বিবেচনা করলে ঘটনাটি যে তাঁর এবং দরবারের জন্য চরম সংকটময় ছিল এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে শত বিপদের মধ্যেও আল াহর উপর ভরসা করে ধীর স্থির থাকা আল্লাহর ওলীদের পক্ষেই সম্ভব। এই দুর্লভ গুণ মরহুম পীর ছাহেব কেবলা পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ব করেছিলেন। হুজুরের জীবনের নিম্নের ঘটনাটি তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করেঃ

কোন এক ছফর হতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বাড়ি ফিরছিলেন। বিখ্যাত বিষখালী নদীর উপর দিয়ে পান্সী নৌকাযোগে তিনি চলছিলেন। হঠাৎ প্রবল ঝরে হুজুর ও তাঁর সঙ্গীসহ নৌকাটি উল্টিয়ে গেল। হুজুর নৌকার পিছনের কামরায় বসেছিলেন। সেই বন্ধ কামরার ভিতর হতে তিনি কিভাবে বেরিয়ে এলেন কেউ জানেনা। যা হোক, উভয়েই উপুর হওয়া নৌকাটি কোন রকমে ধরে ঢেউয়ের সাথে উঠানামা করছিলেন। হুজুরের সঙ্গী স্বাভাবিক ভাবেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু হুজুর ছিলেন একেবারেই ধীর, স্থির এবং শান্ত। একটু উৎকণ্ঠা বা ভীতির কোন চিহ্নই তাঁর চেহারায় পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তিনি তার সঙ্গীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, “ঘাবড়াইও না, পানিতেও আল াহ আছেন”। সুবহানাল াহ! হযরত নবী করীম (দঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখন গুহার মধ্য থেকে কাফেরদেরকে দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন “আমরা মাত্র দু’জন”। এ কথা শুনে হুজুর (দঃ) বলেছিলেন, “না আমরা তিনজন- আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন”। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নদীর ভিতরে পড়ে গিয়ে সঙ্গীকে যে অভয়বাণী শুনিয়েছিলেন মনে হয় সেটি যেন গুহার ভিতর হযরত আবু বকর (রাঃ) কে অভয় দিয়ে নবী করীম (দঃ)-এর সেই কথারই প্রতিধ্বনি। আরও অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, সেই বিপদের দিনের কথা উলে-খ করে মরহুম পীর ছাহেব বলেছেন ঃ আল্লাহর ফজলে সেই বিপদের সময়ও আমার ‘পাছ আনফাছ’ জিকির কামাই যায় নাই। তরীকতপন্থীগণ ‘মাইয়াত’ অর্থাৎ, ‘আল্লাহ সাথে আছেন’- এর ছবক মশক্ করেন। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার অন্তরে ‘মাইয়াত’- এর প্রভাব কত গভীরভাবে পতিত হয়েছিল, আল্লাহর সান্নিধ্য সর্বক্ষণ কত নিবিড়ভাবে তিনি উপলব্ধি করতেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে অবিচল থাকতেন, এ ঘটনায় তা লক্ষ্য করার বিষয়।

ধৈর্য ও সহনশীলতা ঃ

নবী রাস,লগণ থেকে শুরু করে আওলিয়ায়ে কেরাম যখনই ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন থেকেই তাদেরকে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এতে তাঁরা কখনও নিরুৎসাহ হয়ে তাঁদের কর্তব্য কাজ থেকে বিরত থাকেননি, বরং সবকিছু নীরবে সহ্য করে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নিজ কাজ চালিয়ে গেছেন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁরা কখনও কখনও প্রতিবাদও করেছেন। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনেও এই আদর্শেরই পূর্ণ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। আজ যারা বিভিন্ন পন্থায় ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত তাদের মাঝে অনুরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা থাকলে সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা এড়ানো সম্ভব হত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন- ভয়-ক্ষুধা, জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি অবশ্যই বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং যারা এই বিপদাপদে ধৈর্য অবলম্বন করবে তাদের জন্য সুসংবাদ। সাহাবায়ে কেরাম এবং আওলিয়াদের জীবনকাহিনী পাঠ করলে দেখা যায় কুরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতের হক আদায় করতে গিয়ে একান্ত আপনজনদের ইন্তেকালেও তাদের বিয়োগ ব্যথা তারা কিভাবে সহ্য করেছেন। হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনেও তাকে অনুরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি সেইসব পরিস্থিতিতে আল াহর কাজে রাজী থাকতে গিয়ে যেরূপ ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন তা থেকে অতি সহজেই আঁচ করা যায় তাঁর ধৈর্যশক্তি কত উঁচু পর্যায়ের ছিল। নিম্নে দু- একটি ঘটনা বর্ণিত হলোঃ

- আবদুল মান্নান নামে হুজুরের প্রথম সন্তান অতি অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের দিন রাতে জনৈক নিকট আত্মীয় হুজুরকে সান্ত্বনা দিতে এবং খানা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে আসলেন। তিনি ভেবেছিলেন এত বড় বিপদের দিনে পুত্রশোকে মুহ্যমান ব্যক্তিকে সাধ্য সাধন ছাড়া কিছুতেই খাওয়ানো সম্ভব হবেনা। কিন্তু হুজুর এটা টের পেয়ে তাকে বললেন, "বলেন কি, আজ ত আমার নিত্যকার চেয়ে বেশি ভাত খাওয়া উচিত। তাহা না হইলে আল াহর কাজে রাজী থাকলাম কেমন করিয়া"। জানা যায় সেই সন্তান বিয়োগে হুজুরকে কেউ এক ফোটা অশ্র" বিসর্জন করতে দেখে নাই। এটি তাঁর প্রথম যৌবনের ঘটনা।

- এক সময় হুজুরের বাড়ির ৮/১০ মাইলের মধ্যে কড়াপুর নামক গ্রামে এক বিরাট ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মাহফিল শুরু হওয়ার প্রাক্কালে হঠাৎ হুজুরের একটি বিবাহিতা কন্যার মৃত্যু সংবাদ এলো। হুজুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তারপর ওজু করে জামায়াতে নামাজ আদায় করলেন এবং পরে যথারীতি ওয়াজ শুরু করলেন। কিছুক্ষণ ওয়াজ-নসীহত করার পর সভার সকলকে ঘটনাটি জানায়ে সেই কৈফিয়তে সকলের নিকট তিনি বিদায় চাইলেন। একটু পর সভা ভঙ্গ হলো। তিনি বাড়ি এলেন এবং দাফন-কাফনের কাজ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হল। ২/১ দিন পরই হুজুর আবার ছফরে বের হলেন, কিন্তু সন্তান বিয়োগজনিত কোন প্রকার বাহ্যিক চিহ্নাদি তাঁর মাঝে দেখা যায়নি।

- হুজুরের ছোট ছেলে হযরত শাহ মুহাম্মদ নূর ছাহেব তখন তরুণ যুবক। মাদরাসায় টাইটেল ক্লাসে অধ্যয়ন করেন। হুজুর স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে অত্যন্ত øেহ করতেন। হঠাৎ করে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন। হুজুর কেবলা তখন নিজেও অসুস্থ এবং অত্যধিক দুর্বল- নিজে নিজে হাঁটা চলা করার কোন ক্ষমতা ছিলনা। হযরত শাহ মুহাম্মদ নূর ছাহেব যখন মুমূর্ষু, তখন হুজুরকে একটি চেয়ারে বসিয়ে ধরাধরি করে রোগীর কামরায় নেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরই হুজুরের সামনে ছেলের ইন্তেকাল হল। হুজুর নীরব নিস্তব্ধ। কোনরূপ 'উহ্-আহ্' শব্দ কেউ শুনতে পায়নি। বরং ঐ দুর্বল অবস্থায়ও সকলকে মোটামুটি এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, "তোমরা সবাই ছবর কর, নূর আমাদের নিকট আল্লাহর আমানত ছিল; আল্লাহ আবার আমাদের নিকট হইতে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়াছেন। আমরা তাহার যে খেদমত করিয়াছি সেজন্য আমরা খোদার নিকট হইতে ছওয়াব পাইব"। জানাযার সময় হুজুরের জ্যেষ্ঠ ছেলে (পীরে মরহুম হযরত শাহ্ আবু জা'ফর মুহাম্মদ ছালেহ ছাহেব) মৃতের পক্ষ থেকে সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। সেই মুহূর্তে হুজুর বলেছিলেন, "মুহাম্মদ নূরের সঙ্গে যাহারা দুস্তি রাখে, কেয়ামতে তাহারা তাহার পুরস্কার পাইবে।

মুহাম্মদ নূর আল্লাহর ওলী ছিল"। এই কথাগুলো বলতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ জড়িয়ে গিয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রাণপ্রিয় ছেলের বিয়োগে তিনি একটু কেঁদে ফেলেছিলেন- কিন্তু তা ঐ একটিবার মাত্র। এই ঘটনার পর হুজুর কেবলাও আর বেশিদিন জীবিত ছিলেননা। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন হযরত মরহুম শাহ মুহাম্মদ নূর সম্পর্কে হুজুরের মুখে আর কোন আক্ষেপ ও আলোচনা কেউ কোনদিন শোনেনি।

- হুজুরের যে কোন জলছায় লোকজন তাঁর কাছে আসার জন্য, মোছাহাফার জন্য অথবা দু'একটি কথা বলার জন্য ভীড় করে দাঁড়াত। সকলের সাথে হাত মিলানো, তাদের সাথে কথা বলা কত কঠিন। কিন্তু হুজুর কেবলা ধৈর্য ধরে যথা সম্ভব সকলের কথাই শুনতেন এবং হাসিমুখে তাদের সাথে কথা বলে বিদায় দিতেন। যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে এরূপ উপচে পড়া লোকদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসি মুখে কথা বলায় কীরূপ ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। হুজুর কেবলার যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য খাদেমগণ কখনও কখনও আড়ালে লোকদেরকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেই তিনি বিরক্ত হতেন। কখনও কখনও বলতেন- তোমরা ধমক দিচ্ছ কেন? ওরা তো আমার সাথে কথা বলতে এসেছে।

তাক্ওয়া ঃ

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার তাকওয়া আলাদাভাবে বলার কোন প্রয়োজন পড়েনা। চরিত্রের সকল গুণাবলীই এই তাক্ওয়ার সাথে সম্পর্কিত। তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, লেবাস- পোশাক, তাবলীগ-তা'লীম, সবকিছুর মাঝেই তাকওয়া ফুটে উঠত। বলা চলে তাঁর জীবনটিই ছিল উচ্চ পর্যায়ের তাকওয়ার অনুশীলন। তবুও দু'একটি ছোট ছোট ঘটনা তুলে ধরছি।

- হাদিয়া গ্রহণে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতেন। সামান্য সন্দেহ হলেই তিনি হাদিয়া গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে- হুজুর কেবলা তাবলীগী ছফরে গিয়ে কোন কোন স্থানে টাকা পয়সা নেয়া ত দূরের কথা- খাওয়া-দাওয়া থেকেও বিরত থাকতেন। নিজের সঙ্গীদের দিয়ে পাক করে আলাদাভাবে খানা খেয়েছেন।

- মাদরাসার ব্যবস্থাপনা ছিল আলাদা। তাই মাদরাসা- বোর্ডিং এর টাকা যাতে কোন ক্রমেই তাঁর নিজের খরচের জন্য ব্যয় না হয় সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত। শুধু তাই নয়, এ বিষয়টিতে তিনি এতটুকু সজাগ ছিলেন যে, মাদরাসার দেয়ালেও তিনি কোনদিন তায়াম্মুম করেননি। দেয়ালে হাত দিয়ে তায়াম্মুম করলে দেয়াল থেকে যে ধূলো পড়ে যায় তাতে সামান্য হলেও দেয়ালের ক্ষতি হয়, আর সেই ক্ষতি করে তাঁর তায়াম্মুম জায়েজ হবে কিভাবে। এই ছিল তাঁর যুক্তি।

- একবার তার জনৈক খাদেম মুসাফির খানার থালাবাসন পরিষ্কার করার জন্য মাদরাসার পরিত্যাক্ত বালি হতে কিছু বালি এনে ব্যবহার করছিলেন। হুজুর সেটি দেখতে পেয়ে বালি কোথা থেকে আনা হয়েছে জানতে চাইলেন। খাদেম বললেন মাদরাসার মাঠ হতে আনা হয়েছে। মাদরাসার বালি তাঁর নিজের কাজে ব্যবহার হয়েছে জেনে তিনি যেন আঁতকে উঠলেন। এ জন্য খাদেমকে শুধু ভর্ৎসনাই করেননি, তাৎক্ষণিক ভাবে মাদরাসার হিসাব রক্ষক জনাব মাস্টার এমদাদ আলী ছাহেবকে ডেকে এনে ঐ বালির দাম একআনা ধার্য করে তখনই পরিশোধ করে দিলেন।

- হুজুর ছাত্রাবস্থায় একবার একজন লোকের নিকট হতে একটি সূঁই চেয়ে এনেছিলেন। নির্ধারিত সময়ে ফেরত দেয়ার কথা তিনি ভুলে গেলেন। পরে যখন স্মরণ হয়েছে তখনই লোকটিকে সূঁই ফেরত দিয়ে তিনি বললেন- আমি কথা রাখতে পারিনি, এজন্য আপনার মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে। আমায় মাফ করুন। লোকটি বলল- আমার মনে কোন কষ্ট হয়নি।

তথাপি হুজুর বার বার অনুরোধ করায় শেষ পর্যন্ত লোকটি বলতে বাধ্য হল- আচ্ছা, আপনাকে মাফ করে দিলাম। হুজুর কেবলা তখন আশ্বস্ত হলেন।

আত্মজিহাদ ঃ

রাসূলুল্লাহ (দঃ) একবার যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে এসে সাহাবীদের বললেন, "আমরা ক্ষুদ্র জিহাদ থেকে বিশাল জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। আর সেই বিশাল জিহাদটি হল নফসের সাথে জিহাদ"। মরহুম পীর ছাহেব কেবলার জীবনে শত শত ঘটনা রয়েছে সে গুলো বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় নিজের আত্মাকে নফসের প্ররোচনা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি কত সাধ্য সাধনা করেছেন। সকল ঘটনা উলে-খ করা এখানে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র নফ্সে আম্মারার সাথে তিনি কিরূপ মোজাহাদায় লিপ্ত থাকতেন সে সম্পর্কে দু'একটি ঘটনা পাঠকের সামনে তুলে ধরছিঃ

- কোন এক দাওয়াতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সামনে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আনা হল। তিনি ধীরে ধীরে খেতে শুরু করলেন। হঠাৎ তিনি জিহŸায় স্বাদ উপলব্ধি করে খাবার প্লেটে বেশি করে নুন দিয়ে পুনরায় খেতে লাগলেন। নফ্সকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বললেনঃ হে নফ্স, তুমি বড় স্বাদ পেয়েছ। খাও, এখন ভালো ভাবে খেয়ে নাও।

- কোন এক ছফরে জনৈক মুরীদ তার নিজ বাড়িতে দাওয়াত করে খাবার শেষে হুজুর কেবলার জন্য নিজ গাভীর দুধ সমস্ত সর সহ একটি গ্লাসে করে নিয়ে এসে তাঁকে দিল। হুজুর কেবলা গ্লাসটি হাতে নিয়ে শাহাদত অংগুলি দিয়ে দুধের সর সরিয়ে বাকী দুধটুকু খেয়ে নিলেন। এটি লক্ষ্য করে উক্ত মুরীদ প্রশ্ন করল, "হুজুর, দুধের সমস্ত সরটুকুই ত আপনার খাবার উদ্দেশ্যে এনেছি, আপনি তার সামান্যটুকুও খেলেন না, কারণ বুঝতে পারলাম না"। হুজুর কেবলা সকলকে উদ্দেশ্য করে তখন বললেন, "বাবারা, যে জিহŸা এমন সুখাদ্য পেয়ে সজীবতা লাভ করে, সে জিহŸা কখনও আল াহ্কে গভীরভাবে ডাকতে সক্ষম হয়না"।

- অনুরূপ আরও একটি ঘটনা হুজুরের নিজের জবানীতে ব্যক্ত করছি "একবার আমি এক বিরাট মাহফিলে ওয়াজ করিতে উঠিব এমন সময় বোটের খিড়কি দিয়া উপরে চাহিয়া দেখিলাম বহু লোক আমাকে উঠাইয়া নেওয়ার জন্য আসিয়াছেন। আমার নফছ খুব খুশীতে ভরিয়া গেল। নফস বলিয়া উঠিল, অদ্য খুব ওয়াজ জমিবে ও টাকা পয়সাও পাওয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ আমি মনে মনে বলিয়া উঠিলাম, হে নফস! তুই আমাকে বরবাদ করিতে বসিয়াছিস। আচ্ছা দেখা যাক। আমি উপস্থিত লোকদিগকে বলিলাম- আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি বোটের ভিতরে গিয়া দরজা বন্ধ করতঃ জিকিরে মশগুল হলাম এবং 'নিশ্চয়ই নামাজ খারাপ ও অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে'- এই আয়াতের মোরাকাবা করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। খোদার ফজলে দুই রাকাত শেষ করিতে না করিতেই নফস দমন হইয়া গেল। আমি খোদা তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতঃ সভায় চলিয়া গেলাম। এই ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য আত্মপ্রশংসা নহে; বরং আপনাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, নফস কি ভীষণ দুর্দমনীয় জিনিস। অথচ ইহাকে দমন করিতে না পারিলে সকল শ্রম পণ্ড ও যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব আমার প্রত্যেক মুরীদ মোতাকেদ সব সময় এদিকে খুব তী² দৃষ্টি রাখিবেন। কোন বুজুর্গ লোক বলিয়াছেন-

"অর্থাৎ তুমি যদি পরহেজগার, সংযমী ও মোত্তাকী হইতে চাও, তাহা হইলে বাদশাহ কি আমীর কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু লাভ করার জন্য লোভ করিও না"। অতএব আল াহ্ তায়ালাকে পাইতে হইলে 'তামা' (লোভ) বর্জন করা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় কোন লাভ হইবে না।

এই ভাবে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সারাক্ষণ নফ্সে আম্মারা বা কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে দুনিয়ায় থেকেও দুনিয়ার ক্লেদাক্ত পরিবেশের প্রভাব থেকে নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। তিনি নিজে যেমন সদা সতর্ক থেকে হাশরের ময়দানে পাক-সাফ হয়ে আল াহর

দরবারে উঠার জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, মুরীদ মুহিব্বীনদেরকেও তেমনটি নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি নসীহত তুলে ধরছিঃ

বর্তমান জামানায় পাপ-পঙ্কিলে জগত ডুবিয়া রহিয়াছে। পাপ হইতে এড়াইয়া থাকা বড়ই কঠিন ব্যাপার। বাইম মাছ যেমন কাদার মধ্যে থাকিয়াও তাহার শরীরে কোন প্রকার কাদা মাটি লাগিতে দেয়না, সেইরূপ মুসলমানদিগকেও বাইম মাছের মত এই পাপ-পঙ্কিলময় জগতে অবস্থান করিতে হইবে। (নফ্সে আম্মারার সাথে হামেশা জিহাদ করিয়া) পাপ-পঙ্কিল হইতে দেহ-মনকে পবিত্র রাখিয়া কবরে যাইতে হইবে। তবেই কেয়ামতে খোদা পাকের দরবারে পাক-সাফ হইয়া উঠিতে পারিবে।

অমায়িক ব্যবহার ঃ

হযরত নবী করীম (দঃ) বলেনঃ যে বড়কে সম্মান করেনা, ছোটকে øেহ করেনা সে আমার দলভুক্ত নয়। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা গুরুজন, উস্তাদ এবং পীর- বুজুর্গদের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। এ ব্যাপারে কারও বেয়াদবী তিনি বরদাস্ত করতেন না। জনৈক ব্যক্তি তার মাকে প্রহার করলে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা সেখানে গিয়ে তাকে যে জুতা পেটা করেছিলেন সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আলেম- ওলামাদেরকে তিনি বিশেষ সম্মান দেখাতেন। মজলিসে কোন আলেম নিচে বসে আছে জানতে পারলে সম্ভব হলে তিনি তাকে মঞ্চে আসার আহবান জানাতেন।

সমাজে গণ্যমান্য, মাতবর শ্রেণীর লোকদেরকেও তিনি যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানাতেন, চাদর বিছিয়ে দিয়ে বসতে দিতেন, আপ্যায়ন করাতেন, হাসিমুখে কথাবার্তা বলতেন এবং অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে ধর্মের কথা শুনিয়ে দিতেন। বস্তুতঃ তাঁর এই আদতটি হুজুর (দঃ)-এর সুন্নাত। আবু জাহেল, আবু লাহাব প্রমূখ কাফের ব্যক্তিবর্গও নবী করীম (দঃ)-এর দরবারে এলে তিনি তাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন।

ছোটদের সাথেও তাঁর ব্যবহার ছিল খুব অমায়িক। তালেবে ইলেমদেরকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাদের কেউ যদি তাঁর সামনে কুরআন শরীফের কোন আয়াত তেলাওয়াত করতে চাইত তিনি আগ্রহভাবে শুনতেন। তাদের সাথে তিনি কিরূপ আন্তরিকতা ছিলেন সে সম্পর্কে ছোট্ট একটি ঘটনা তুলে ধরছি। জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ নেছারী ছাহেব তখন ছারছীনা মাদরাসায় নিচের জামায়াতের একজন ছাত্র । মাদরাসা বন্ধের সময় হুজুরের কাছে বাড়ি যাওয়ার এজাজত চাইলে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, কবে আসবে? জনাব নেছারী ছাহেব উত্তর দিয়েছিলেন, 'হুজুর, দুই সপ্তাহের ছুটি'। তখন মরহুম হুজুর বলেছিলেন- ওরে বাবা! এতদিন তোমাদের না দেখে থাকব কি ভাবে?

ছোট বাচ্চা নিয়ে কেউ যদি হুজুরের সাথে দেখা করতে আসত তিনি সেই শিশুকে আদর করতেন, হাতের কাছে ফলমূল যা থাকত তাই তিনি তার হাতে তুলে দিতেন।

মুরীদ, মুহিব্বীনদের জন্য মরহুম হুজুরের ভালোবাসার অন্ত ছিলনা। তিনি বলতেন- তোমাদের সকলের জন্য আমি মক্কা শরীফে আল াহ্র ঘর ধরে দোয়া করে এসেছি। মুরীদের জন্য তার উৎকণ্ঠা কেমন ছিল ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে তা আঁচ করা যায়ঃ ছারছীনা দরবারের মুফতি মরহুম মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেব বলেন, 'একবার আমি এবং সোনাহারের মৌঃ গিয়াসউদ্দীন ছাহেব নিজ বাড়ি যাওয়ার জন্য হুজুরের কাছে বিদায় চাহিলাম। হুজুর আমাদেরকে বিদায় দিলেন বটে কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আমাদেরকে বলিলেন- শয়তান মুরীদগণকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে নাকি, এই ভয়ে তাহাদেরকে বিদায় করিতে আমার দেল চায়না'।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলার খাদেম এবং সাথের লোকদের সাথে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল সে সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে হুজুরের আন্তরিক মধুর ব্যবহারের কথা স্মরণ করে তাদেরকে শুধু অশ্র" বিসর্জন করতেই দেখা যায়। কোন কাজের হেরফেরের জন্য কোন কটু কথা তো দূরের কথা সামান্য বিরক্তির ভাবও কোনদিন দেখাননি। তবে শিক্ষণীয় কোন বিষয়ের প্রশ্ন উঠলে সংশোধনের খাতিরে প্রয়োজনবোধে তিনি কঠিন হতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

- স›দ্বীপের ওলিউর রহমান নামে হুজুরের এক খাদেম ছিলেন। তিনি হুজুরের নৌকা চালাতেন আবার মাঝে মাঝে বাড়ি পাহাড়া দিতেন। তিনি বলেছিলেন- খাদেমদের প্রতি হুজুরের বিশেষ খেয়াল ছিল। আমার বাড়ি যাওয়ার সময় হলে রাতের বেলায় আমায় ডাকতেন। বলতেন- ওলিউর রহমান, বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই? আমি বলতাম- হুজুরের হুকুম। হুজুর বলতেন- বাড়ি যাও। এই নাও, এই বলে পথ খরচ এবং সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস বাবদ টাকা পয়সা সহ সকলের জন্য কাপড় চোপড় আমার হাতে তুলে দিতেন।

- "সীরতে নেছারিয়া"র লেখক মরহুম কবি নূরুদ্দীন ছাহেব উলে-খ করেন- মরহুম পীর ছাহেব কেবলার চরিত্রে বৈষম্যহীন আচরণ, সমদৃষ্টি এবং ক্ষুদ্রজনের প্রতি সম ব্যবহারের যে প্রমাণ মিলে তা সচরাচর দৃষ্ট হয়না। তিনি আরও বলেন- বড় বিষয় তো দূরের কথা, তাঁকে প্রদত্ত হাদিয়া বণ্টনের মত ক্ষুদ্র ব্যাপারেও তাঁর যে অযাচিত øেহ-মমতা, সমদৃষ্টি এবং বাৎসল্য লক্ষ করা যেতো তা অতুলনীয়। সকলের কথা তিনি কিভাবে খেয়াল রাখতেন তা একমাত্র আল াহ্ই জানেন। কেহ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর জন্য তার ভাগ রেখে দিতেন। পরে সাক্ষাত হলে চুপে চুপে তাকে বলতেন, "তোমার জন্য অমুক জিনিসটি অমুক স্থানে রাখা আছে ; যাও, নাও গিয়া"।

মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তাবলীগে ছফরে গেলে দর্শন প্রার্থীদের ভীড় জমে যেত। অনেক সময় তিনি ধনী -বড়লোকদের চাইতে পিছনে দাঁড়ানো জীর্ণ শীর্ণ, দুঃস্থ গরীবকে কাছে ডেকে নিতেন। তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের দেয়া সামান্য হাদিয়াও তিনি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতেন এবং মাঝে মাঝে সকলের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এতে তাদের চোখে মুখে যে আনন্দের আভা ফুটে উঠত তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। সমাজে অসহায়, অবহেলিত মানুষের মনে সামান্য আনন্দ দেওয়াই ছিল হুজুর কেবলার এরূপ ব্যবহারের মূল লক্ষ্য।

অনেকের কাছেই হয়ত এই সব ছোট্ট ঘটনা একেবারেই তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলোর মধ্য দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে যাঁর মহান জীবনাদর্শ ঝল-মল করে উঠে, যাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আমাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে সজীব করে তুলে; ক্ষণিকের তরে হলেও সমাজের ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে নিয়ে যায় দূরে, বহুদূরে; একটুখানি ভাবার অবকাশ দেয় নিজের সম্পর্কে, স্রষ্টার সম্পর্কে- তিনি আর কেউ নন, সৃষ্টির সেরা, বিশ্বের রহমত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)।

বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবেঃ

এটি একটি চারিত্রিক গুণ। সত্যিকার জ্ঞানীজন কখনও অহংকারী হয়না। তাঁরা জানেন জ্ঞান সমুদ্রের তুলনায় তাঁদের আহরণ খুবই কিঞ্চিত। যারা ওলী আল াহ্, তাঁরাই আল াহ্কে অধিক ভয় পান; এর কারণ হল তাঁরা আল াহ্র মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা, দয়া-সবকিছু অধিক অনুধাবন করতে পারেন, ফলে মহান স্রষ্টার সামনে নিজেকে অস্তিত্বহীন মনে করেন। নিজেকে অন্যের সামনে বড় বলে জাহির করা ত দূরের কথা, অন্য কেউ তাঁদেরকে বড় বললেও তাঁরা লজ্জিত হন। এটিও একটি বিরাট আত্মজিহাদ। এটি ওলী আল াহ্দের পক্ষেই সম্ভব। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা নিজে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পীর হয়েও কখনও পরিচিতি চাননি বরং সাধারণ লোকের কাতারে নিজেকে নামিয়ে এনে নিজের অহংকারকে বিলীন

করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। পাঠকদের উৎসাহ নিরসনে মাত্র ২/১ টি ঘটনা তুলে ধরা হলোঃ

- একবার বরিশাল জিলার রায়েন্দায় হুজুর কেবলার মাহফিল ছিল। একই মাহফিলে জৌনপুরের পীর ছাহেব কেবলাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তখনও পীর ছাহেব কেবলাদ্বয়ের কেউ মাহফিলে আসেননি। সেই সুবিশাল মাহফিলে তাঁদের ভক্তবৃন্দের মাঝে হঠাৎ করে উভয় পীরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এক বির্তকের সৃষ্টি হল। জৌনপুরী হযরত পীর ছাহেব কেবলার ভক্ত-মুরীদগণ দাবী করলেন যে, তাঁদের পীর ছাহেব ছারছীনা পীর ছাহেব কেবলার চাইতে অধিক কামিল ও বুজুর্গ। পক্ষান্তরে ছারছীনা হুজুরের মুরীদগণ দাবী করলেন- তাদের পীর ছাহেব অধিক পরহেজগার- তিনি জৌনপুরী হুজুরের ন্যায় ফাসেকের দাওয়াত কবুল অথবা হাদিয়া গ্রহণ করেন না। এই নিয়ে ধীরে ধীরে তুমুল কলরবের সৃষ্টি হল। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা তখন তাঁর বোটে অবস্থান করছিলেন। জনৈক খাদেম তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন। সকলেই ধীর ও শান্ত হলেন। এবার পীর ছাহেব কেবলা বললেন- এই মজলিসে কোন আলেম ব্যক্তি হাজির হয়েছেন কি? একাধিক আলেম সাড়া দিলেন। এবার তিনি বললেন- আমি শুনেছি, আপনারা জৌনপুরী পীর ছাহেব কেবলা ও আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে কলহ করছেন। আচ্ছা, আপনারা একটা মাসয়ালা বলুন ত? মনে করুন, একটি কুয়ার মধ্যে একটি বিড়াল পড়ে মরে যায় এবং তার দেহ উক্ত পানিতে পঁচে গলে যায়; ঐ অবস্থায় পানি উত্তোলন করে তা দিয়ে অজু করা জায়েজ হবে কি? উপস্থিত ওলামাবৃন্দ নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিলেন। তৎপর পীর ছাহেব কেবলা বললেন - আচ্ছা, যদি ঐ বিড়ালটি একটি নদী বা সাগরে পতিত হয়ে উক্তাবস্থা ধারণ করে, তবে কি নদী বা সাগরের পানি নষ্ট হবে? সকলেই জবাব দিলেন, "না"। এবার মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলা বললেন, "বাবারা, আমি নেছারুদ্দীন হলাম 'কুয়া'। তাই আমি ফাসেকের দাওয়াত বা হাদিয়া গ্রহণ করতে ভয় করি। পক্ষান্তরে জৌনপুরী হযরত পীর ছাহেব কেবলা হলেন 'সাগর'। তাদের কথাই আলাদা। সুবহানাল াহ, আত্মম্ভরিতা লীন করে নিজেকে ছোট মনে করার কী বিরল দৃষ্টান্ত!

- একবার বোটে করে হুজুর তাবলীগী ছফরে যাচ্ছেন। বোটে নিজ কামরায় তিনি অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে শুনতে পেলেন- তীরে লোকজন কথা বলছে। একজন বলল- এটি কার নৌকা? অপর একজন উত্তর দিল-এটি ছারছীনার পীর ছাহেব কেবলার নৌকা। এই কথা শুনেই তিনি বেরিয়ে এলেন এবং যে নৌকা বাইছিল তাকে সরিয়ে নিজেই গলুই এর উপর বসে নৌকা চালাতে শুরু করলেন। ঘটনাটি ছোট বটে, কিন্তু, নিজেকে সাধারণ লোকের কাতারে নামায়ে আনার এই যে মন মানসিকতা সেটি কত দুর্লভ-

মরহুম হযরত মাওলানা ইউনুস ছাহেব ছিলেন ছারছীনা মাদরাসার মুদাররিছ। একবার তাঁর বাড়িতে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা জলছার জন্য তাশরীফ এনেছিলেন। হুজুর কেবলা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে মাওলানা ছাহেব উপস্থিত জনতার সামনে ওয়াজ করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বললেন- আপনারা কি জানেন, আল াহর কত বড় এক ওলী আজ এখানে এসেছেন? এ কথা শোনার সাথে সাথে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বেরিয়ে এলেন। মাওলানা ছাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন- মাওলানা ইউনুস, ওয়াজ থামাও। তোমার কথা পরিবর্তন করে এ কথা বল- নেছারুদ্দীন নামে এক গোনাহ্গার আপনাদের দোওয়ার জন্য এখানে এসেছে। মাওলানা ছাহেব চুপ করে গেলে হুজুর কেবলা বললেন- তুমি একথা না বললে আমি আর আজ এখানে কোন ওয়াজ করবনা। বার বার পীড়াপীড়িতে অগত্যা মাওলানা ছাহেব কেঁদে কেঁদে হুজুরের কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জনতার সামনে বলতে বাধ্য হলেন।

সমাজে একজন কামেল পীর হিসেবে হুজুর কেবলা যখন পরিচিত হয়েছেন সে সময়ও তিনি ফুরফুরা শরীফ গেলে সাধারণ লোকের সাথে মাঠে বিছানা করতেন। কখনও নিজ পীরের কাছে কাছে থেকে উচ্চাসন পাওয়ার ইচছা পোষণ করেননি। সকলের সাথে বসে ওয়াজ

শোনতেন, জিকির মোরাকাবা করতেন এবং মাহফিল শেষে বিছানা চাদরের ধূলাবালি ঝেড়ে সাধারণ মুরীদের মতই চলে আসতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে- হুজুর কেবলা যখন কোন মাহফিলে যেতেন আর লোকজন কোন মানপত্র পাঠ করত, তখন তিনি বলতেন- আপনারা আমার যে সমস্ত গুণের উলে-খ করেছেন আমার মাঝে সেগুলো নেই। তবে এ সব কথা আমার জন্য আপনাদের দোয়া হিসেবে আমি গুণেছি।

মরহুম হুজুর কেবলার এই সব কথা এবং ঘটনা শুনলে সত্যিই মনে হয়- আত্মজিহাদের মাধ্যমে যে নিজেকে বিলীন করে হৃদয় সিংহাসনে মহিমান্বিত সর্বশক্তিমান আল াহ্কে সমাসীন করেছেন, বস্তুতঃ মানুষের মাঝে সেই প্রকৃত বড় এবং যথার্থই বলা হয়- বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।

আমিই তালিবুল ইলমঃ

আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞানী এবং যে জ্ঞানী নয়, উভয়ই কি সমান? কখনও হতে পারেনা। জ্ঞানান্বেষণ মানুষের সবচাইতে বড় গুণ। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

রাসূলে পাক (দঃ) বলেন- সুদূর চীনে গিয়েও যদি তোমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা হলেও তোমরা তা করবে। মরহুম পীর ছাহেব কেবলা মায়ের কোল ছেড়ে বের হয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। তিনি প্রথমে ফরিদপুর পরে হুগলীতে গিয়ে পড়াশুনা করেন। কোন বাধা বিপত্তিই তাঁকে জ্ঞান পিপাসা থেকে নিবৃত্তি করতে পারতনা। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যেদিন বৃষ্টির দরুন কেউ ক্লাসে আসেনি, সেদিনও বুক সমান পানি ভেঙ্গে তিনি মাদরাসায় যথা সময়ে হাজির হয়েছেন- এ দৃষ্টান্ত আগেই দেয়া হয়েছে।

বৃদ্ধ বয়সেও লাঠি ভর করে তিনি মাদরাসার ক্লাস কক্ষে উপস্থিত হতেন। তিনি বলতেন- বাবারা, আমি এখানে কেন আসি জান? আমি চিরদিন তালিবুল ইল্মের খাতায় আমার নাম রাখতে চাই। কারণ যারা তালিবুল ইল্ম, কিয়ামতে তাদের সাথে নবীদের মাত্র এক ধাপ তফাৎ থাকবে।

পূর্বেই উলে-খ করেছি তিনি মাঝে মাঝে বলতেন- 'জীবনভর চেষ্টা করেছি নামাজের মাছলা শিক্ষা করতে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বলতে হচ্ছে যে, সেটি পূর্ণ শিখতে সক্ষম হলামনা। তাই, আপনারা যারা টাইটেল পাশ করেছেন তারা হয়ত অনেকেই ভাবতে পারেন যে বহুত কিছু শিখেছি। হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত হযরত খিজির (আঃ)-এর সাক্ষাতের ঘটনা ইয়াদ করলেই হয়ত বুঝে আসবে যে আপনি কতটুকু শিখেছেন।'

নিছক বিনয় প্রদর্শন নয়, মরহুম পীর ছাহেব কেবলা যে সত্যি সত্যিই নিজেকে 'তালিবুল ইল্ম' বলে বিশ্বাস করতেন, সে প্রসঙ্গে নিম্নে একটি ঘটনা উলে-খ করছি। ঘটনাটি পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকায় প্রকাশিত হাফেজ মুহাঃ আব্দুল করীম ছাহেবের লেখা থেকে নেয়া হয়েছেঃ

জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিছানায় ছিলেন। তিনি মনে মনে নিয়ত করলেন, আল াহ্ রাব্বুল আলামীন তার এই দুরারোগ্য ব্যাধি হতে আরোগ্য দান করেন তো একখানা নতুন লুঙ্গি খরিদ করে যে কোন একজন পরহেজগার তালিবুল ইল্মকে দান করবেন। আল াহ্ পাকের রহমত, উক্ত মান্নতের পর পরই সেই দুরারোগ্য ব্যাধি হতে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেন। এক্ষণে মান্নত পুরা করতে প্রস্তুত হলে মনে মনে ভাবলেন, আমি তো একজন পরহেজগার তালিবুল ইল্মকে লুঙ্গিখানা দিবার সংকল্প করেছি; কে পরহেজগার, এবং কে পরহেজগার নয়, সে সম্বন্ধে আমার তো ভাল জানা নাই। এমনি চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে তুলল। হঠাৎ তার মনে এক সময় সমস্ত চিন্তার অবসান

ঘটিয়ে যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা হল লুঙ্গিখানা সঙ্গে নিয়ে ছারছীনা শরীফের পীর জনাব হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবের কাছে অর্পণ করে তিনি সঠিক পাত্রে দান করার দায়িত্ব তাকেই ন্যাস্ত করবেন। যথা সময় লুঙ্গিখানা নিয়ে ছারছীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতান্তে আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনাই খুলে বললেন এবং লুঙ্গিখানা হুজুর কিবলার হাতে তুলে দিয়ে যথাস্থানে দান করার দায়িত্বও তাকেই অর্পণ করলেন। হযরত পীর ছাহেব কেবলা লুঙ্গিখানা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে কাছেই রাখলেন। পরক্ষণই মসজিদে আজান হল, এবার হুজুর কেবলা মসজিদে রওয়ানা হবার প্রস্তুতির পূর্বে উক্ত আগন্তকের দেয়া লুঙ্গি কাপড়খানা নিজেই পরিধান করতে আরম্ভ করলেন। আগন্তক ভাবলেন, হুজুর কেবলা হয়ত ভুল বুঝেছেন যে, লুঙ্গিখানা তাঁকেই দেয়া হয়েছে। প্রতিবাদ করতেও সাহস করছিলেন না। আবার চিন্তা করলেন, মান্নত করেছি একজন তালিবুল ইলমকে দান করব আর হুজুর কেবলা ইহা ভুলক্রমে পরিধান করলে তো আমার মান্নত আদায় হবেনা। লোকটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মৃদু স্বরে বললেন, "হুজুর, লুঙ্গিখানা আপনাকে নয়, একজন পরহেজগার তালিবুল ইলমকে দেয়ার জন্য আপনাকে দিয়েছি"। এবার হুজুর কেবলা একটু গম্ভীর স্বরেই বললেন, "বাবা! আমিই তালিবুল ইল্ম"। লোকটি হুজুর কেবলার কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরে নিজে নিজে লজ্জিত হলেন এবং তাঁর মান্নতের হক যথাযথ আদায় হওয়ার জন্য খুশী মনে দেশে ফিরে গেলেন। উপরের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মরহুম হযরত পীর ছাহেব কেবলার জীবদ্দশায় তাঁর ইল্মি-ক্ষুধা নিবৃত করতে না পারার জন্যই জীবনভর নিজেকে "তালিবুল ইল্ম" মনে করতেন।

পরপারের আহবান

বাংলা ১৩৫৬ সাল। ফাল্গুনের মাহফিলের পর যথানিয়মে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বের হলেন তাবলীগী ছফরে। কতিপয় মাহফিল শেষ করে তদানিন্তন বরিশাল জিলার গলাচিপা থানায় কালীকাপুর মাদরাসা প্রাঙ্গণে এক বিশাল মাহফিলে তিনি যোগদান করেন। মাহফিল চলাকালীন সময়েই হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বড় ছাহেবজাদা পীরে মরহুম হযরত মাওলানা শাহ আবু জা'ফর মুহাম্মদ ছালেহ (রঃ) তখন বরিশাল শহরে অন্য একটি মাহফিলে ছিলেন। হুজুর কেবলা এই বলে তার বড় ছাহেবজাদাকে খবর দিতে বললেন যে, তাকে আসতে বলুন, সে আসলে আমি হাসপাতালে যাব। সংবাদ পেয়ে তিনি দ্রুত কালিকাপুরে চলে এলেন এবং মরহুম হুজুরকে চিকিৎসার জন্য বরিশাল নিয়ে গেলেন। চিকিৎসার পর রোগ কিছুটা প্রশমিত হল। বস্তুতঃ এটিই হল মরহুম হুজুরের আখেরী বিমারের প্রথম সূত্রপাত।

এই রোগের প্রথম ভাগে একদিন পীরে মরহুম হযরত মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (রঃ) স্বপ্ন দেখেন- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁকে বলছেন- 'হে শাহ ছাহেব, তুমি পীর ছাহেবের নিকট হতে যা জানার তা জেনে রাখ।' এ স্বপ্ন দেখে তিনি বুঝলেন তাঁর ওয়ালেদ ছাহেব কেবলা আর বেশিদিন ইহজগতে নেই। কিন্তু কিছুদিন পরই আবার স্বপ্ন দেখেন মসজিদের মিম্বরের উপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এবং গলায় গলায় মিশে দু'জনে মিলে মরহুম হুজুরের আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করছেন। পীরে মরহুম বলেন- 'উক্ত স্বপ্ন দেখার পর হুজুরের অবস্থার কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।'

মরহুম হুজুর পূর্বের ইচ্ছানুযায়ী ১৪০১ জন সঙ্গী নিয়ে জীবনের শেষভাগে অতি জাক-জমকের সাথে তৃতীয়বার হজ্জ করে আসেন। মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসার পরই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশেষ কাজ না হওয়ায় ঢাকা হতে হাকিম মাওলানা আহমদ হোসেন ছাহেবকে আনান হয়। তার চিকিৎসায় তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেন, কিন্তু দুর্বলতার তেমন উপশম হ'লনা।

এমনি সময় হুজুরের ছোট ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা নূর (রঃ) বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এই সময় মরহুম পীর ছাহেব কেবলা এতই দুর্বল ছিলেন যে, পায়ে হেটে ছোট ছাহেবজাদাকে দেখতে যাওয়ার মত শক্তি তার ছিলনা। তাঁকে চেয়ারে বসায়ে নিয়ে আসা হত। বাংলা ১৩৫৭

সালের ৫ই ফাল্গুন ছাহেবজাদা ইন্তেকাল করেন। অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে, হুজুর বোধ হয় ছেলের মৃত্যুর এই নিদারুণ শোক বরদাস্ত করতে পারবেননা। কিন্তু পীর ছাহেব কেবলাকে যথেষ্ট শান্ত থাকতে দেখা গেল। বরং তিনি সবাইকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন- আল াহ্র কাজে রাজী থাকাই বান্দার কর্তব্য; 'যে ব্যক্তি আল াহর কাজে নাখোশ হয়, সে কি আল াহ্র বান্দা? তবে স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনা তাঁর মনের মাঝে এক বিরাট আঘাত হানে।

এর পর হুজুরের রোগ কিছুটা হ্রাস পেলেও রক্তচাপ, শ্বাস কষ্ট, বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগ-ইত্যাদির কারণে তাঁর সুস্থতা আর তেমন স্থায়ী হতে পারেনি। এবার মাহফিলের কাজ তাঁর বড় ছাহেবজাদা শাহ্ সূফী আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) এর পরিচালনাধীনে সম্পন্ন হয়। মাহফিলের পর অসুস্থ শরীরেই তিনি আবার তাবলীগী ছফরে বের হন। এই ছফরে প্রায় প্রতিটি মাহফিলেই লোকজনের কাছে এই বলে তিনি বিদায় আরজ করতেন- আপনাদের সাথে আমার আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। হুজুরের এই কথায় লোকজনের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যেতো।

বাংলা ১৩৫৮ সনে ভাদ্র মাসে কোরবানীর ঈদের পূর্বে মরহুম পীর ছাহেব কেবলা বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিভিন্ন চিকিৎসায় অবস্থার সামান্য উন্নতি হয় বটে, কিন্তু হঠাৎ করে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং তিনদিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটান। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন চিকিৎসার পর নিউমোনিয়ার সামান্য উপশম হলেও দুর্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে হাসপাতাল হতে একজন ডাক্তারসহ তাঁকে ছারছীনায় নিয়ে আসা হয়।

বাংলা ১৩৫৭ সাল হতে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত পীর ছাহেব কেবলা চিকিৎসার জন্য বেশ কয়েকবার ঢাকা আসেন। প্রতি বারই হাজার হাজার লোক তাঁর হাতে বয়াত হন এবং তা'লীম গ্রহণ করেন। হুজুরের শরীর ছিল খুব দুর্বল, কথা বলারও শক্তি ছিলনা- তথাপি সুন্নতের খেলাপকারী কাউকে দেখলেই কাছে ডেকে আধ আধোস্বরে তাকে নসীহত করতেন। এই সময় তিনি প্রায়ই মুনাজাত করতেনঃ আমার দ্বারা যদি কিছু লোক হেদায়েত হয় তবেই আমাকে দুনিয়াতে রাখ, অন্যথায় আমি থাকিতে চাইনা। শরীয়তের খেলাপ কোন কিছু দেখলেই তিনি অনুতাপ করতেন- এখন দুনিয়ায় থাকার চেয়ে কবরে যাওয়াই ভাল।

সেই সময় হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা কুতুবখানায় অবস্থান করতেন। সময় সময় তাঁকে দু'হাত ধরে কুতুবখানার বারান্দায় আনা হত। অগ্রহায়ণের মাহফিলের কাজ পীরে মরহুম পরিচালনা করেন। অসুস্থ অবস্থায় দুর্বলতা সত্তে¡ও মরহুম হুজুর মাহফিলের আয়োজন সম্পর্কে মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁর কথা বলার শক্তি ছিলনা। তাই তার তরফ হতে নসীহতমূলক খোতবা পাঠ করে সকলকে শোনানো হয়।

২১শে অগ্রহায়ণ জুমার নামাজের পর মরহুম হুজুর আধো-আধো স্বরে সবাইকে নসীহত করেনঃ "তোমরা একে অন্যকে মাফ করিয়া দিও। হাজার মোখালেফও যদি হয়, মাফ করিয়া দিবে। দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে মাফ চাওয়ার পূর্বে মাফ করিয়া দেয়।"

"যতলোক আমাকে মহব্বত করে, তোমরাও তাহাদিগকে মহব্বত করিও। বর্তমান জামানা বড় দাগাবাজীর জামানা, এই জামানায় একে অন্যকে ভালবাসিতে চায়না। এই ব্যাপারে তোমরা খুব সাবধান থাকিও।"

"একে অপরের প্রতি কোন দাবী রাখিওনা। দেশী-বিদেশী কোন লোক যদি কোন কারণবশতঃ আমার প্রতি দাবী রাখে, যে ভাবেই হোক তোমরা সেই দাবী মিটাইবার ব্যবস্থা করিও।"

চিকিৎসা যথাযথ চালিয়ে গেলেও হুজুরের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হলনা। মাঝে মাঝে এমন হত যে দুনিয়ার কোন খেয়ালই যেন তাঁর থাকতনা। ৪ঠা মাঘ জুমার রাতে ১১ টার সময় হঠাৎ করে তাঁর জজবার হালত হয়- মনে হচ্ছিল তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। উপস্থিত সকলে

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। জনাব সূফী ফজলুর রহমান ছাহেব তখন মুরাকাবার হালতে দেখতে পান আল াহ তায়ালার নূর প্রকাশ হচ্ছে এবং তাকে বলা হচ্ছে- তুমি যা দেখছ, তোমার পীর তা হতে অধিক পরিমাণ নূর ও তাজালী দর্শন করছেন- আল াহ্র পেয়ারা হাবীব হযরত নবী করীম (দঃ) এখানে আসা যাওয়া করছেন- এজন্যই তাঁর এই অবস্থা- এটি রোগের কারণে নয়।

১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে হুজুরের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। শ্বাসের মাত্রা প্রবল হয়ে যায় এবং হাত পা শীতল হয়ে পড়ে। শুক্রবার দিন ও রাত্রি এই ভাবে কাটে। পরদিন অবস্থার উন্নতি হতে থাকে, এমনকি ১৪ই মাঘ রবিবার হুজুর কেবলা এতদূর সুস্থবোধ করেন যে, তায়াম্মুম করে বসে বসে তিনি আছরের নামাজ আদায় করেন। অবস্থার এই উন্নতিতে সকলের মাঝেই কিছুটা স্বস্তি এবং উৎফুল-তার ভাব দেখা দিল। সেদিন উপস্থিত সবাই মিলে এক শোকরানা দোয়ার ব্যবস্থা করলেন।

উক্ত দিনে হুজুর কেবলা পরিবারের সকলকে ডেকে তওবা পড়ায়ে দোয়া করেন এবং তাদেরকে অন্তিম উপদেশ দেন। মেঝ ছাহেবজাদা বলেন- এই সময় আমার বড় আম্মা ছাহেবা ওয়ালেদ ছাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, 'আমরা আপনার খেদমত করার সুযোগ পাইনা। যারা এখন আপনার খেদমত করে তাদের জন্য মেহেরবানী করে দোয়া করুন'। আল াহ্র ওলীর সার্থক সহধর্মিনী বটে। হুজুর তখন হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করলেন। বড় ছাহেবজাদা (পীরে মরহুম) ছাত্র, মোদাররেছীন, মুরীদানসহ সকল মুসলমানদের জন্য দোয়ার আরজ করলে হুজুর কেবলা দোয়া করলেন। সেই সময় তিনি কুতুবখানার বারান্দায় আসার আগ্রহ প্রকাশ করলে সকলে মিলে তাঁকে বারান্দায় আনা হল। তাঁর ইশারা অনুযায়ী মাদরাসার সকল ছাত্র, মোদাররেছীন ও মোহাদ্দেছীনগণকে ডেকে এনে বড় শাহ ছাহেব কেবলা জানান যে, হুজুরের ইচ্ছা অনুযায়ী মাদরাসার ছাত্র মোদাররেছীন অনেকেই তকবীরে উলা শামিল হয়ে নামাজ পড়েন। এতে হুজুর কেবলা খুব খুশী হলেন। পরে তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং সকলকে তওবা পড়ালেন। বস্তুতঃ এটিই মরহুম পীর ছাহেব কেবলার সর্বশেষ সুস্থাবস্থা।

এরপর থেকে হুজুরের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। সামান্য পথ্যাদিও বহু চেষ্টা করে খাওয়ানো হত। বিশেষ করে ফজর ও মাগরিবের পর তাঁকে কিছুতেই খাওয়ানো যেতনা, কারণ সুস্থাবস্থায় এ দুটো সময় তাঁর মোরাকাবার সময় ছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি জজবার হালে কাটাতেন। মাঝে মাঝে মনে হত উপরের দিকে হাত উঠায়ে কাদেরকে যেন ইশারায় ডাকছেন। কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন- হুজুর, আপনি কাকে ডাকেন? আমরা ত কাউকে দেখিনা। তখন তিনি চুপ হয়ে যেতেন। কে জানে- ওলীর অন্তিম সময়ে ফেরেশতা অথবা আম্বিয়া-আওলিয়াদের রূহ মোবারক আসা যাওয়া করত কিনা।

ইন্তেকালের ঘটনা ঃ

বাংলা ১৩৫৮ সন ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পীর ছাহেব কেবলার অবস্থার দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করা গেল। সকলেই শংকিত হয়ে পড়ল। সবার মুখেই এক আতংকের ছাপ, সবাই বেদনাহত, চোখ অশ্র"সিক্ত, মুখে কোন কথা নেই, অসহায়ভাবে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে- যেন ভবিষ্যতের ভয়ংকর কোন এক অবধারিত অন্তিম মুহূর্তের জন্য ভয় বিহবল চিত্তে তারা অপেক্ষা করছে।

রাত ৯ টার পর খাদেমগণকে কুতুবখানার বাইরে যেতে বলা হল। অন্দরমহলের সকলে হুজুরকে দেখতে আসেন। মেঝ ছাহেবজাদা একপাশে হুজুরের হাতের শিরা ধরে বসে থাকেন। অন্য পাশে হুজুর কেবলার বড় বিবিছাহেবা এক হাতে বাতি নিয়ে অন্য হাতে হুজুরকে ধরে তাঁর অবস্থা দেখতে ছিলেন। হয়ত বিগত দিনের কত কথা তাঁর মনের কোণে ভেসে আসছিল, সংসার জীবনের কত শত স্মৃতি তাঁর মনের ডগায় ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। এই মহিয়সী নারীর

কথা মনে হলেই সাথে সাথে নবী পরিবারের পবিত্র স্মৃতি ভেসে উঠে। এমন বহুদিন কেটেছে- ছারছীনায় মুসাফির এসেছে, মুসাফিরখানা বন্ধ হুজুর অন্দরমহলে গিয়েছেন, তাঁর বিবিছাহেবা অভুক্ত থেকে স্বামীর হাতে মুসাফিরের জন্য খাবার তুলে দিয়েছেন। মরহুম হুজুরের বিশাল কর্মক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্য পালনে এই মহিয়সী নারী অন্তরালে থেকে ধৈর্য সহকারে নানাভাবে যে সহায়তা প্রদান করেছেন, সেটি অস্বীকার করার জো নেই। স্বামীর কীর্তির মাঝে পরোক্ষভাবে তাঁরও বিরাট অবদান লুক্কায়িত। আজ স্বামী তাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছেন পরপারে- চরম অন্তিম মুহূর্তে তাঁর কম্পমান হাতখানি বিছানো রয়েছে স্বামীর পবিত্র দেহের উপর। হৃদয়স্পর্শী এ দৃশ্যটি আমাদেরকে নিয়ে চলে ১৪০০ বছর আগে। রাসূলে পাক (দঃ)-এর ইন্তেকালের সময় কোন সাহাবী পাশে ছিলেন না। বিবি আয়শা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর হাতের উপর তিনি ইন্তেকাল ফরমান। মরহুম পীর ছাহেব কেবলাকে সারাক্ষণ খাদেমগণই দেখাশুনা করতেন। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে তিনি ছিলেন বিবি ছাহেবার হাতে ধরা। কোথায় বুঝি এক সূ² মিল রয়েছে। মনে হয় আশেকে রাসূল হযরত পীর ছাহেব কেবলা (রঃ) তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজে যেহেতু রাসূলুল াহ (দঃ)-এর পুরোপুরি এত্তেবা করার চেষ্টা করেছেন, তাই মহান আল াহতায়ালা ইচ্ছা করেই বুঝি তাঁর এই ওলীর ইন্তেকালের দৃশ্যটি তাঁর হাবীবের সেই অন্তিম মুহূর্তের সাথে মিল করে দিয়েছেন। যাই হোক, সময় গড়িয়ে চলল ধীর গতিতে, অতি ধীর। সবাই চুপ, কারও মুখে কথা নেই। বাইরেও কোন কোলাহল নেই- সবই যেন স্থবির। মাদরাসা, মসজিদ, কুতুবখানা সবকিছুর উপর বিষাদের এক ভারী বোঝা কে যেন চাপিয়ে দিয়েছে। যারা ভিতরে ছিলেন সবাই তাকিয়ে আছেন হুজুর কেবলার মুখের দিকে। উৎকণ্ঠা ভরা এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি বছর। হঠাৎ করে হুজুর কেবলা বুঝি একটু কেঁপে উঠলেন, তারপর তিনবার হাঁচি দিলেন। শেষবারের সময় "আল াহ", "আল াহ" শব্দ বের হল এবং সাথে সাথেই শ্বাস ও শিরা বন্ধ হয়ে গেল। এক বিরাট যবনিকাপাত। সকল বিশ্ববাসীকে নিদারুণ শোক সাগরে ভাসিয়ে মাহবুবের ডাকে সাড়া দিতে চিরতরে রওয়ানা হলেন বিশ্বের আওলিয়াকুল শিরোমণি, আশেকে রাসূল, মানব দরদী যুগস্রষ্টা হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেব (রঃ) (ইন্না লিল াহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। হে বিশ্ববাসী কাঁদো, অঝোরে কাঁদো। ১৯৫২ সালের ১লা ফেব্র"য়ারী, বাংলা ১৩৫৮ সনের ১৮ই মাঘ, হিজরী ১৩৭১ সনের ৪ঠা জমাদিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯টা ৪৫ মিনিট সময় দিগন্তে একটি বিভীষিকাময় মুহূর্ত। অকস্মাৎ এই মুহূর্তে চিরতরে বন্ধ হলো ইতিহাসের চলমান একটি চাকা, আকাশপথে কোথায় হারিয়ে গেল হেদায়েতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র- অবসান হল একটি যুগের।

মেঝ ছাহেবজাদা সজোরে কেঁদে উঠেন এবং মেয়েলোকগণ অন্দর মহলে চলে গেলেন। দরবারের সবাই সেখানে উপস্থিত হলেন। সকলের মাঝেই বিষাদের এক তরঙ্গ উত্থিত হল। এর মাঝে সব চাইতে ধীর এবং স্থির দেখা গেলো বড় ছাহেবজাদা পীরে মরহুম হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (রঃ)-কে। সকল দুঃখ চাপিয়ে রেখে সবাইকে তিনি সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কুতুবখানায় লোকের এত ভীড় হতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত লোক নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন হল। একজন মোদাররেছ ছাহেব বললেনঃ আপনারা যদি হুজুরকে মহব্বত করেন, তবে শান্ত হউন, হুজুরের জন্য কুরআন শরীফ পড়–ন।

শোরগোল কিছুটা প্রশমিত হলে কালবিলম্ব না করেই বড় ছাহেবজাদা উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ রাতেই হুজুর কেবলার লাশ মোবারক গোসল করার হুকুম দেয়া হল।

হাজী মুহাম্মাদ ওসমান আলী হাওলাদার, হাজী মুহাম্মাদ আবদুল আজিজ ছাহেব, হাজী মুহাম্মাদ হাফেজ উদ্দীন মুন্সী, মুহাম্মাদ নাজেম ছাহেব, সূফী মৌলভী মতিউর রহমান, সূফী মৌলভী মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ হাফেজ, মুহাম্মাদ আবদুল হক, মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ছাহেব রাত ১২ টার সময় গোসলকার্য সমাধা করেন। প্রাতে ৮টায় কাফন পরিধান করানো হয়। কাফনের জন্য মক্কাশরীফ হতে আনীত এহরামের কাপড় ব্যবহার করা হয়।

হুজুর কেবলার ইন্তেকালের সংবাদ প্রায় ৬০টি টেলিগ্রাম দ্বারা দেশে-বিদেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা হয়। জানাযার জন্য প্রথমে শনিবার দিন আছরের বাদ সময় নির্ধারণ হলেও স্থানীয় আলেম ও মুহাদ্দিছগণের সুপারিশক্রমে শুক্রবারদিন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠদিন হিসাবে ঐ দিনই লাশ মোবারক দাফন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হুজুরের ইন্তেকালের সংবাদ বায়ুবেগে ছড়িয়ে পড়ে। ভোর হতেই দলে দলে লোক সমাগত হতে থাকে। চতুর্দিক হতে যেন লোকের ঢল নামতে শুরু করে। হুজুর কেবলার লাশ মোবারক শেষ বারের মত দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জুমার নামাজের পর লাশ অন্দর মহলে নিয়ে যাওয়া হয়।

শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) এর গদ্দীনশীন হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ ও খুৎবা প্রদান

জুমার বাদে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সকল লোক এই সভায় যোগদান করেন। হুজুর কেবলার কায়েম মাকাম নির্বাচন করাই ছিল এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবনের শেষভাগে পীর ছাহেব কেবলা তাবলীগ, হেদায়েত এবং যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ কর্ম তার বড় ছাহেবজাদা পীরে মরহুম শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ)-এর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তার বিভিন্ন সময়ের উক্তি থেকে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, হুজুর কেবলার অবর্তমানে তিনিই গদ্দীনশীন হবেন। তাই সমবেত লোকমণ্ডলীর কাছে হুজুরের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে পীরে মরহুমের নাম প্রস্তাব করলে মেঝ ছাহেবজাদা সহ সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা সমর্থন করেন। উপস্থিত লোকগণ তখন পীরে মরহুম হযরত মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ ছাহেবের নিকট তাজদীদে বয়াত হন। গদ্দীনশীন পীর ছাহেব কেবলা তখন অশ্র"পূর্ণ নয়নে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ এবং সকলের কাছ হতে সর্ব বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করে যে নাতিদীর্ঘ খুৎবা প্রদান করেন তার কিয়দংশ নিæে উলে-খ করা হলঃ

যতক্ষণ আমি শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী আমল করি, ততক্ষণ আপনারা আমার হুকুম পালন করবেন, অন্যথায় নয়। আমার অন্যায় দেখলে আপনারা আমাকে বলে দিবেন। যিনি আমার দোষ দেখেও চুপ থাকবেন, তিনি আমার দোস্ত নন। আপনারা আমার মাথায় যে গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া আমার একার পক্ষে এটি বহন করা অসম্ভব। আর যদি আপনাদের সহযোগিতা থাকে আল াহ্র রহমতে আমার চেয়ে নগণ্যের পক্ষেও উহা সম্ভব।

জানাযা ও দাফন কাফনঃ

আছরের নামাজের পূর্বে জানাযার নামাজ পড়া হয়। গদ্দীনশীন পীর শাহ্ আবু জা'ফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) এই নামাজে ইমামতি করেন। হাজার হাজার লোক এই জানাযায় অংশগ্রহণ করে। নামাজের পর গদ্দীনশীন পীর ছাহেব কেবলা (রহঃ) ঘোষণা করেন- "জানামতে পীর ছাহেব কোন ঋণ রেখে যান নাই, যদি কেহ দাবীদার থাকেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট হতে বুঝে নিন, আর যদি কারও অন্তরে কোনও কথা বা ব্যবহারের দাবী থেকে থাকে তা ক্ষমা করে দিন"। তার এই কথায় সকলের চোখ অশ্র"সিক্ত হয়ে পড়ে।

অতঃপর দেহ মোবারক কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় লোকের এত ভীড় হয় যে জানাযার মিছিল নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। গদ্দীনশীন পীর ছাহেব কেবলা, মেঝ ছাহেবজাদা এবং অন্য কয়েকজন লোক মিলে হুজুরের দেহ মোবারক কবরে নামান। উপস্থিত সকলকেই পরে মুঠি মুঠি মাটি কবরে দেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

এই ভাবে আল ◌াহর এক মহান ওলী, কোটি মানুষের প্রাণের বন্ধু চিরতরে মাটির আবরণে মুখ লুকালেন। পশ্চিম গগনে অস্তায়মান সূর্য সকলকে বিষাদের সালাম জানিয়ে গেল। শোকার্ত জনতা একরাশ ব্যথা বুকে লয়ে কবরস্থান হতে ধীরে ধীরে বিদায় নিল। কুতুবখানা, মসজিদ, মাদরাসা বিল্ডিং, মুসাফিরখানা আর খানকা শরীফ যে মহান পরিচালকের উপস্থিতিতে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে থাকত, তাঁকে হারিয়ে আজ তারা স্তব্ধ, নিথর, বেদনাহত; বহু বছরের সঞ্চিত সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত বহু ঘটনার সাক্ষী হয়ে সর্বহারা এতিমের মত তারা শুধু একদৃষ্টে কবরস্থানের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইন্তেকালের পর ◌ঃ

চারিদিকে শুধু নেই- নেই ধ্বনি। হাহাকার আর মাতম। এ মাতম শুধু ছারছীনার বুকে নয়, এ মাতম ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে, বিশ্বের আনাচে কানাচে-

পান্থশালায় এসেছিলে হায়
কে তুমি রাহগীর,
বিদায় বেলায় ঝরালে ধরায়
লক্ষ নয়ন নীর ?

হাদীয়ে মিল্লাত, বাংলার শ্রেষ্ঠ পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহঃ) আর নেই। দুনিয়ার কাজ তাঁর ফুরিয়েছে। ফিরে গেছেন তিনি তাঁর চির বাসস্থানে- আল্লহর সন্নিধানে। তাঁর তিরোধানে সমগ্র পৃথিবী আজ বেদনাবিধূর। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, লতা-পাতায়, পশু-পাখী আর মানুষের মাঝে ব্যথা বেদনার একই কান্নাভেজা করুণ সুর, একই কাতর ধ্বনি। গাছের পাতার মর্মরে, পাখীর কূজনে, গাভীর হাম্বা রবে বিরামহীন এক বিয়োগ ব্যথা যেন উথলে উঠ্ছে। জোয়ারের পানি সাগরের বিলাপ নিয়ে ছুটে আসছে- নদীর কুল্কুল্ ধ্বনি আর্তনাদ করে দু-ধারে আছড়ে পড়ছে। সমীরণ কেঁদে কেঁদে ঘোষণা করছেঃ বিশ্ববাসী- শোন, বাংলাদেশ, বার্মা, আসাম, ভারত-পাকিস্তান, মক্কা মদীনা, ইরান-ইরাকের লোকেরা শোন- সে নেই, সে চলে গেছে। সূর্য উঠেছে- তাঁরই মহা প্রস্থানের বার্তা লয়ে- দিগন্ত ছাপানো সেই রক্তিম আভা আজ নেই- শোকার্ত বিশ্বের পানে বিষণœ দৃষ্টি মেলে ম্লান মুখে ধীরে ধীরে তাঁর গমন পথে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি মানুষেন মন আজ স্বজন হারানোর ব্যথায় ভারাক্রান্ত। পাড়া-পড়শী, দেশবাসী- সবাই আজ শোকে মুহ্যমান। বিপদে-আপদে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে যে মহান দরদী সর্বাগ্রে সান্ত্বনা আর অভয়বাণী লয়ে এগিয়ে আসতেন- যাঁর দর্শন, যাঁর পবিত্র হাসি মনের সকল যাতনা আর মর্মবেদনা নিমিষে নিঃশেষ করে দিত, সেই মহামানবটি আজ কোথায়? আল ◌াহ-রাসূলের গান গেয়ে গেয়ে ঘুমন্ত জাতিকে যিনি সচকিত করে দিলেন- লক্ষকোটি মুর্দা দিলে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে দিলেন- শিরক, বিদয়াত আর কুফরীর ছয়লাবকে দূরীভ,ত করে সমাজের বুকে যিনি তৌহীদ আর সুন্নতে নববীর এক নতুন জোয়ার বয়ে নিয়ে এলেন- সেই মুজাদ্দিদ আজ কোথায়?

কোটি কোটি ভক্ত-মুরীদান মনে এক সাগর ব্যথা নিয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরাফিরা করছে। তারা আজ বারুদ্ধ, চোখের পানি তাদের বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। প্রাণ প্রিয় মুর্শিদ- আধ্যাত্মিক গুরুর তিরোধানে তারা আজ দিশেহারা হয়ে পড়েছে- বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে তারা এখন কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? যে বটগাছের ছায়ায় তাদের ক্লান্তি বিদূরিত হত, যে ক,য়োর পানিতে তারা তৃষ্ণা মিটাতো, যে ফুলের সুবাসে তারা মাতোয়ারা থাকত, যে আকাশের নীলিমায় তাদের চোখ জুড়াতো, যে পাখীর কূজনে তাদের প্রাণের গভীরে দোলা দিয়ে যেতো- এক নিমিষে বুঝি সবকিছু তাদের কোথা হারিয়ে গেল। তাদের যাতনা, বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তাই চারিদিক হতে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে কেবলই ভেসে আসছে একটি হাহাকার ধ্বনিঃ

আজকে যাহার বিয়োগ ব্যথায়
বইছে সকল চক্ষে নীর,

কৈ গেল সেই দ্বীনের নেছার,
কৈ গেল সেই জিন্দা পীর ?